

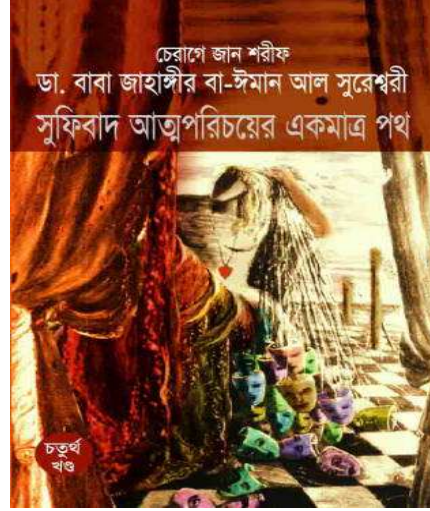


চেরাণে জ্ঞান শরীফ
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুরেশ্বরী
শ্রাম: চুনকুটিয়া, পো: শুভাচ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুরেশ্বরী রচিত গ্রন্থাবলি



প্রকাশক : নাহিদ শামসেত্তার্বিজ ড় বেদম ওয়ারসী
(সুফিবাদ প্রকাশনালয়-এর পক্ষে)
গ্রাম : চুনকুটিয়া, ডাক : শুভাঢ্যা,
থানা : কেরানীগঞ্জ, জেলা : ঢাকা
ফোন : ০১৭১১১২৮১৬৯
প্রকাশকাল : ১৯ মার্চ ২০০৭



সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ (চতুর্থ খণ্ড)

উৎসর্গ

আম্মার এ ছোট বইটি আম্মার বংশের প্রথম পুরুষটির আগমন হতে এ পর্যন্ত যারা আছেন তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আম্মার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে তাদের সকলের নামে উৎসর্গ করে গেলাম। যদিও বিস্তারিত বংশতালিকাটি আম্মার দাদার কাছ থেকে পেয়েছি, কিন্তু সবার নাম লিখা সম্ভবপর নয়। শুনেছি আম্মাদের আদি বাসস্থানটি হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।

প্রথম পুরুষটির নাম হলো শ্রী হরে কৃষ্ণ চৌহান। তাঁর ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নামধারণ করেন মিয়াজান। তিনি তাঁর পুত্র সেকজানকে সঙ্গে করে এদেশে আসেন। সেকজানের পুত্র বালাজান, এবং বালাজানই কেরানীগঞ্জ উপজিলার শুভাঢ্যা ইউনিয়নের চুনকুটিয়া গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেন এবং তিনি দুইটি বিবাহ করেন। প্রথম ঘরে দুই ছেলে : আরজান এবং নবাবজান। অপর ঘরে এক ছেলে, নাম সাহেবজান। আরজানের তিন ছেলে এক মেয়ে : হাজি মনিরউদ্দিন, মোহাম্মদ পাঁচু, মোহাম্মদ সাধু এবং কন্যা বিজান।

মোহাম্মদ পাঁচুর দুই ছেলে এক মেয়ে : কাজিমুদ্দিন, আজিমুদ্দিন এবং কন্যা রহিম্ন। কাজিমুদ্দিনের পাঁচ ছেলে এক মেয়ে : হেলাল উদ্দিন, শামসুন নেহার, আরিফ উদ্দিন, সদর উদ্দিন, কামাল উদ্দিন এবং শরফুদ্দিন। হেলাল উদ্দিনের এক ছেলে সাত মেয়ে : জাহাঙ্গীর (অধম লিখক), লিলি, চিলি, টুলু, লুলু, ভায়োলেট, জলি এবং পলি। জাহাঙ্গীরের তথা অধম লিখকের দুই ছেলে পাঁচ মেয়ে : নাহিদ শামসেত্তাব্বীজ, মিমি নাজ, বেদম ওয়ারসী, সিদ্দুলমুনা, নাইস, ইরম এবং নিটশে।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোন দ্বায়ে বিক্রি অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবেও না। কারণ, এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোন দেশের মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তাছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোন সাময়িকীতে এই বই-এর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোন কারো নামে ধারাবাহিকভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোন দিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবী তোলেন, তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবী সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আরো উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারিবেন।

একটি আবেদন

আমরা মোরাকাবা-মোশাহেদার তথা ধ্যান-সাধনার একটি স্কুল খুলেছি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামে। সম্ভবত বাংলাদেশের কোন পীর-ফকির এ রকম একটি স্কুল খোলেননি। আপনাদের, বিশেষ করে সুফিবাদে বিশ্বাসীদের নিকট আর্থিক সাহায্য কামনা করি।

সূচিপত্র

১. আমি যা বলতে চাই/১৭
২. মেরাজি শয়তান ও হাকিকি শয়তানের গবেষণামূলক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ/২৫
৩. গবেষণার মাধ্যমে আসল নকলের ধারণা দেওয়া যায়/৪১
৪. সুফিবাদের মূলকথা/৫১
৫. কোরানভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও অমরত্ব /৫৫
৬. কয়েকজন অলীর পরিচিতি/৬১
৭. আমানু ও মুমিনুগণের মধ্যে পার্থক্য/৬৪
৮. তকদির সম্পর্কে সূক্ষ্মতত্ত্ব/৬৬
৯. জেহাদে আসগর ও জেহাদে আকবরের মাঝে প্রভেদ/৬৯
১০. আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে আলোচনা/৭২
১১. জ্ঞান ও বিদ্যার বিষয়ে আলোচনা/৭৪
১২. কবর ও মাজারের মাঝে প্রভেদ/৭৬
১৩. মেরাজের আলোচনা/৮৫
১৪. মিলাদের আলোচনা/৯০
১৫. আত্মা ও প্রাণের মাঝে প্রভেদ/৯৪
১৬. সেজদায়ে তাজিমি সম্পর্কে আলোচনা/১১৭
১৭. কোরানভিত্তিক গবেষণার প্রতি উৎসাহ প্রদান/১২৫
১৮. কোরানের সার্বজনীন আশ্রয়/১৪০
১৯. আমার খলিফাদের নামের তালিকা/১৫০

আগ্নি যা বলতে চাই

গবেষণা সত্যকে নেংটা করে দিতে পারে। আবার গবেষণা সত্যকে পিছিয়ে দেবার পোশাক পরিয়ে দিতে পারে কিনা জানি না। তবে গবেষণার কাজটিকে মহানবী এতই উৎসাহিত করেছেন যে, ডেবে অবাক হই। গবেষণার আর এক নাম যদি জ্ঞান অর্জন করা বুঝায়, গবেষণার আর এক নাম যদি ঠুলি-পরা চোখ দু'টো খুলে দিতে পারা বুঝায়, গবেষণা যদি একটি চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যার খোলস খুলে দিতে পারা বুঝায়, তাহলে সেই গবেষণার আর এক নাম জ্ঞান। নারীর অধিকার চাইবার গবেষণায় যদি প্রাচীর দাঁড় করাতে চায় ধর্মের নামে, তাহলে কি ধর্মটি মিথ্যা বলছে, না যে ধর্মের নামে ফতোয়া মারছে সে মিথ্যা বলছে? মোল্লা দিয়ে মোহাম্মদকে যাচাই যারা করতে চায় তাদের গবেষণার মাল-মসলার ভিত্তিগুলো কি নড়বড়ে না শক্ত তারও গবেষণা হওয়া উচিত মনে করি। কীভাবে মহানবীর নামে মিথ্যা কথার বুড়ি বানানো হয়েছে, গবেষণার মাধ্যমেই সুন্দর ধরা পড়ে এবং পড়তে শুরু করেছে। তাই মহানবী জ্ঞান অর্জনের জন্য সেই দিনের দুর্গম বলে পরিচিত চীন দেশে যাবারও উপদেশ দিয়েছেন। সেই জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে কোনটা মিথ্যা আর কোনটা সত্য সেটারই সামান্য বিষয় তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে এই ছোট বইটিতে। এই গবেষণার কাজটিকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে গতানুগতিকতায় চলার নির্দেশ দিতে গেলেই বিবেকের গায়ে পড়ে জমিদারীর নির্মম চাবুকের আঘাত। আর তখন? তখন নকলের সাথে আসলটাও বন্যার জলের মত ভেসে যায়। উপসংহার টানে অস্বীকার। একটা চাপা বিদ্রোহ এবং ঘৃণা আর অবজ্ঞায় সমস্ত বিষয়টাকে একটা আবর্জনা মনে করে পোর কর্পোরেশনের

আবজ্ঞনা ফেলার গাড়িতে তুলে দিয়ে নিস্তার পেতে চায়। এটাই মানব মনের একদম হালকা দর্শন। তখন আর ডেকে এনে নাস্তিক বানাতে হয় না। বরং নাস্তিক আপনিই হয়ে যায়। সব কিছুই মনে হয় তখন একটি সুপরিকল্পিত ভগ্নামির নীল নকশা।

এই ছোট বইটিতে দেখাতে চেয়েছি আমার সীমিত গবেষণার ফসল। হয়তো কেউ ছুড়ে ফেলে দেবে, আবার কেউ হয়তো আদরে হাতে তুলে নেবে। এই স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার যে জাতি দিতে চায় না, সেই জাতিকেই মনের অজান্তে সভ্য জাতির দুয়ারে জ্ঞান-ভিক্ষার বাসন হাতে দাঁড়াতে হয়।

উম্মাইয়াদের আমলে হাদিস সংগ্রহ শুরু হয়। মহানবীর জাত শত্রুদের শাসনামলে মহানবীর মহাবাণীগুলো পেয়েছি। এই জাত শত্রুরা মহানবীর বংশধরদের উপর প্রতিটি মসজিদে জুম্মার নামাজের খোৎবা দেবার সময় অভিশাপ আর জঘন্য ভাষার গালাগালি দেওয়া ছিল নিত্যদিনের একটি সাধারণ ব্যাপার, যা শুনলে আজকের মুসলমানেরা অবাকের উপর অবাক হয়ে ভাবে, আপন মা সালাম পায় না, ডাকের মা পা বাড়ায়। সুতরাং প্রতিটি হাদিসকে কোরানের মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। যদি না মেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিতে হবে, তা সেই হাদিস যতই নির্ভরযোগ্য বলে দাবি করা হোক না কেন। কারণ কোরানকে অনুসরণ করবে হাদিস, কিন্তু হাদিসকে কোরান কখনোই অনুসরণ করতে পারে না। সূর্য আলো দেবে চাঁদকে, কিন্তু চাঁদ কখনোই সূর্যকে আলো দেবে না।

আমার প্রথম লিখা বইটি ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব খাঁ-র সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। কিছু বই বাজারে ছাড়া হয়েছিল। বাকিগুলো পুলিশের ভয়ে আমার স্বী বস্তা বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে

দিয়েছিল। ভাগ্য খারাপ, সেই বইটির একটি কপিও আমার কাছে নেই। কেবল বইটির একটি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন আকারে ছাপা হয়েছিল এবং সেই পৃষ্ঠাটুকু বুকে ধরে রেখেছি। সেই পৃষ্ঠাটুকু এ বইতে ছাপিয়ে দিতে চাই এজন্য যে, যদি কারো কাছে ঐ বইয়ের কোন কপি থেকে থাকে, তাহলে উহা পাব এবং পুনরায় ছাপাবো বলে আশা করি।

আমার দ্বিতীয় বইটির জন্য বর্তমান ফেনী জিলাতে আমাকে রাজবন্দী করে নোয়াখালীর মাইজদি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিচারে এক বছর কারাদণ্ড হয় এবং প্রায় ছয় মাস জেল খাটার পর মুক্তি লাভ করি।

আমার তৃতীয় বইটি (মারেফতের গোপন কথা) প্রথম ছাপা হয় ১৯৭৭ সালে এবং দশ বছর চালু থাকার পর এরশাদ সরকার ১৯৮৭ সালের ২৫ অক্টোবর বাজেয়াপ্ত করে এবং বিচার করার পর বেকসুর খালাস রায় প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের ভেতর বেশ কিছু পীর-ফকিরদের আস্তানায় যাওয়া আসা করেছি। সবাইকে এক পাল্লায় মাপতে চাইবার ইচ্ছায় নয়। তবে আধুনিক যুগের কিছু কিছু পীর-ফকিরের ‘হামসে হাম’ ভাবখানায় ডুবো ডুবো ভাবখানা দেখতে পেয়েছি। যার দরুন সুফিবাদের প্রচার যতটুকু হওয়া উচিত ছিল, তার কিছুই হয়নি বলে মনে হয়। আগের দিনের রাজা-জমিদারদের চমৎকার একখানি আদর্শ ছিল—‘খানা লাগাও, বাইজি নাচাও, গানা-বাজনা শোন, মণ্ডতের আগে মন্দির বানাও, বুড়ো বয়সে তপজপ করো এবং হাসতে হাসতে বেহেশ্তে চলে যাও।’ জ্ঞান-গবেষণা করতে নেই। ওটা ইউরোপ আর আমেরিকানরা করবে, আর নূতন নূতন মাল আবিষ্কার করবে। আমরা ওদের থেকে কিনে নেব, আর মউজ করবো। সাবাস, সাবাস বলে চাটুকারের দল সায় দিয়ে গেছে, আর হজুরদের দর্শনবাণী শুনিয়েছে, ‘হজুর, ওরা গাধা, খাটুনি করে মরছে ইউরোপ আর আমেরিকা।’

কিন্তু যে সকল পীর-ফকিরেরা সুফিবাদের ধারক ও বাহক, তাদের আশ্রয় গিয়ে দেখতে পেয়েছি একদম সাধারণ অবস্থা। ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। তাও মরে-পিটে কিছু ছাপাতে গেলে বইগুলোর চেহারা-সুরত এতই নিম্নমানের হয় যে, পাঠক হাতে নিতে চায় না। যুগটাই চমকের। চমকের কিছুটা আলো বইটির চেহারায় বিউটি পারলারের উগ্র ফ্যাশনের বাঁধাই না থাক কিন্তু কিছুটা মোমপলিশ যে দিতেই হয়। যে যুগরে বাবা! বৈঠকখানায় সাজানো ফুলদানিতে থোকায় থোকায় রংবেরং-এর ফুলপাতা, একদম তরতাজা, মানে ফ্রেশ কিন্তু প্লাস্টিকের ফুল পাতা বলে যখন ধরা পড়ে তখন মনটায় একটা কামড় মারে। হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) সাহেব তো এরকম ধোঁকাবাজি দেখতে পেলে একটিও হাদিস বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতেন না। খালি ধামা দেখিয়ে গাধা ধরার কৌশল দেখে হযরত ইমাম বুখারী (রাঃ) একটিও হাদিস গ্রহণ করেন নি। বিসমিল্লাতেই ধোঁকাবাজির ম্যাজিক শো দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন। অথচ এ যুগে ধামার ভেতর কিছু থাক চাই না থাক, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, ধামাটার ডিজাইন, নকশা-নমুনা এবং চেহারা-সুরতে জেল্লা মারে কিনা। নিউজ প্রিন্টের কাগজের বই, কিন্তু উপরের মলাট নামক ধামাটায় একটু জেল্লা বসাবার খায়েস থাকলেই কাজ সেরেছে। ফেল আগে মাল পানি তারপর লগ বইয়ের জেল্লা। যে-না বউ তার উপর এক ডজন দাই! যুগের চাহিদা যদিও নিছক আপেক্ষিক সত্য, কিন্তু এই আপেক্ষিকতাকে কোন যুগেই ফেলে দিতে পারিনি। তাই আমরা অনেক সময় আপেক্ষিকতার উপর ভিত্তি করে সার্বিক সত্যটির উপর কসাইয়ের কুড়াল চালাই। ভাবি, মস্ত বড় একটা কাজ করলাম।

আবার ভাষার ব্যাপারে কোলকাতার কথ্য ভাষাটাই হল হাই সোসাইটির ভাষা। প্রতিটি যুগের এলাজির খান্দানি ধারাটি কোন না কোন কৌশলে টিকে আছেই। সংস্কৃত ভাষা কোন এক যুগে ছিল হাই সোসাইটির ভাষা। তখন কোলকাতার কথ্য ভাষা ছিল সাহিত্যের প্রশ্নে অখাদ্য। তারপর মাইকেল আর বঙ্কিম বাবুদের কাছে হাতির হাই সোসিয়াল ভাষাটি হল ঐরাবত এবং আরো কত কী যুগাক্ষরের ঠেলা। একদিন ফরাসিরা বিলেতের লোকদেরকে চর অঞ্চলের লোক বলে গাল দিত এবং এদের ভাষা মুখে উচ্চারণ করাটাকে পাপ মনে করতো। শুনলে অবাক হবেন, এ যুগের কিছু কিছু ফরাসি আছে যারা ইংরেজি ইচ্ছা করে শেখে না। জানেন কি? ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়া মিতেরা কি ইংরেজি ভাষা জানেন? আমার মুখে না শুনে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন না।

শুনেছি ব্যাকরণ লেখককে অনুসরণ করবে। তাই আমার মত ফইচকা লেখকও ইচ্ছে করেই সাধু এবং চলতির মশ্রিণ ঘটিয়েছি। এতে পাঠক যদি ভুল ধরতে চান, ধরবেন। প্রতিবাদ ভুলেও করবো না। কারণ লিখতে চেয়েছিলাম উপন্যাস আর ছোটগল্প। কিন্তু ঐ যে কিসমতের লিখন। বানাবো শিব, হয়ে গেল অন্য একটা। ধর্ম লিখতে ভাষা লাগে না। লাগে দলিল, প্রচুর দলিল। একদম মাপা পথে গাড়ি চালাতে হবে। ট্রেন যেমন মাপা পথে চলে। স্বাধীনতার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমনকি দলিলের ব্যাখ্যাটুকু লিখতে গেলেও ব্যাখ্যার দলিল থাকতে হবে। কী যে কষ্ট করতে হয়।

বদরের যুদ্ধটি ইসলামের বাঁচা-মরার যুদ্ধ ছিল। তাহলে বদরের যুদ্ধের দাম কতটুকু হতে পারে? অথচ এই পবিত্র বদরের যুদ্ধটির একটি আত্ম (ডামি) দাঁড়

করিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে কারা? গরুর বাচ্চা অকালে মারা গেলে গরুর দুধ পাবার আশায় মরা বাচ্চার ছাল দিয়ে তৈরি করা হয় একটি ডামি। যাকে চলতি ভাষায় ‘আমা’ বলা হয়। সেই আমাটির নাম ছিল ‘আল বদর’ বাহিনী। কী চমৎকার নাম! সেই আমাটি ব্যবহার করে স্বাধীনতার দুধ সংগ্রহ করতে চেয়েছিল যারা, তারা মুসলমান নামের জঘন্য কলঙ্ক। তারা গাধা আর ঘোড়ার মিলনের খচ্চর নামের শঙ্কর ছিল। সেই খচ্চরদের আকাম-কুকামের কথা সবারই জানা আছে। আজও তারা বহাল তবিয়েতে বেঁচে আছে। সমাজে মাথা উঁচু করে, ধর্মের নামে ভণ্ডামির ডুগডুগি বাজিয়ে, সরল মুসলমানদের যাদুর ভেঙ্কি দেখিয়ে দলে টানার কত রকম কৌশল তৈরি করে চলছে একের পর একটি করে। এই পুরাতন খচ্চরেরা ইসলাম নামে কয়টি মাসিক পত্রিকা বাহির করছে। তাও আবার ‘আল বদরের’ মত পবিত্র স্থানগুলোর নামে। ইসলামের নামে মিঠা মিঠা লিখা দেখলে আপনার মনে হবে এরা কত বড় গণতন্ত্রের পূজারী! এদের পত্রিকায় কারো নামে অভিযোগ করা হলে সাংবাদিকতার নীতি অনুসারে প্রতিবাদ করার যে অধিকারটি সর্বজন স্বীকৃত সেটার কোন সামান্যতম প্রয়োজন আছে বলেও এরা মনে করে না। বিবেক পাথর হয়ে যায়। শূকর বনের এক শ্রেণীর পশু, কিন্তু এদের আকাম-কুকাম দেখলে শূকরও শরমে পালিয়ে যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের এক নেতার মাথার উপর দুইটি শিং গজানো রান্স-মার্কা ছবির পোস্টার ছাপিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে দেবার জন্য কোন এক দূতাবাস হতে শত শত রিঙ্গ দামি কাগজ আর মোটা মালপানি পেয়ে কিছু পোস্টার দেয়ালে লাগিয়ে বাকি কাগজ ও মালপানির খেলাটি হজম। কিন্তু ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গুঁতাগুঁতিতে এসব গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। যেমন শুনি যে, ডাকাতেরা সোনাদানা ডাকাতি করার পর সেই

সোনাদানার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ডাকাতে ডাকাতে মারামারি করে। চিন্তা করুন, এরা কীরকম বৈজ্ঞানিক ইসলামের ব্যাপ্তা হাতে খাসা চিহ্ন! এদের চিড়িয়াখানায় রাখা হলে কীরকম মানাবে? অথচ এরাই যাদেরকে ইয়েলো জার্নালিজমের গালি দিয়ে নাস্তিক নাস্তিক বলে চিৎকার শুরু করে দেয়, তাদের সাপ্তাহিক কাগজগুলোতে অনেক বেশি গণতন্ত্রের কথা পাওয়া যায় পরিষ্কার পানির মত। এমনকি সেই সব সাপ্তাহিক কাগজগুলোর বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষার গালাগালিগুলো পর্যন্ত হবহ ছাপিয়ে দেয়। যদিও রাজনীতির কিছুই বুঝি না এবং বুঝবার আগ্রহটিও নেই, তবু বড় ছেলের কিনে আনা পত্রিকাগুলো, যেমন-পূর্বাভাস, খবরের কাগজ, আগামী, এই সময় ইত্যাদি অলস সময়ে হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করি এবং অবাক হয়ে অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য হই। সম্ভবত আমার মেয়ের বয়সের এক মায়ের লিখা কয়টি লাইন বুকে দাগ কেটে আছে। এত সুন্দর আর এতই ভাল লেগেছে যে আমি অধম তাকে প্রায়ই দোয়া করি। খাজা বাবার মাজারে দাঁড়িয়ে চোখের জলে কিছু চাইতেছিলাম। এমন সময় সেই মেয়েটির লিখা মনে ভেসে আসতেই তার জন্য খাজা বাবার কাছে কিছু চাইলাম। অথচ আমি তো সেই মহান মাকে আজও দেখিনি। সেই মায়ের লিখা কয়টি লাইন হবহ তুলে ধরলাম : ‘ধর্মের দালান-কোঠা যদি মানুষে মানুষে ভালবাসা নষ্ট করে, তবে এই পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যাক মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও প্যাগোডার সকল অস্তিত্ব। ইট-সুড়কির চেয়ে মানুষ বড়। ইট-সুড়কির চেয়ে ভালবাসা বড়।’ মায়ের এ কথাগুলো যদি অধর্ম হয়ে থাকে তাহলে আমার মত ক্ষুদ্র ইসলাম গবেষকের জানা নেই ধর্মের ভাষা কোনটি।

ধর্মের পুকুরটি বড় বড় টাংগই (কচুরিপানা) দিয়ে এমনভাবে ঢেকে আছে যে, ওটাকে দূর হতে পুকুর মনে না করে সবজির ক্ষেত মনে হতে পারে। দু'চারটা টাংগই উঠালেই দেখতে পাবেন পানি। আজ ধর্মের নামে এত টাংগই জম্মে গেছে যে, পানি আছে বলে মনে যায় দেয় না। আসুন, যদি মনে করেন টাংগই কিছুটা নিজ হাতে তুলে ফেলে পানি আছে বলে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে সুরল মনুষ্যগুলো কিছুটা ঠাहर করে নিতে পারবে, পারবে নিজেদের ভুলগুলো শুধরিয়ে নিতে। যদি মনে করেন অধম লিখকের বইটির বহুল প্রচার হওয়া উচিত, তাহলে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করুন। আপনাদের ছোট ছোট সাহায্যই একত্র করে যদি একলক্ষ বই বিনামূল্যে বিতরণ করে দিতে পারি, তবে আশা করি কিছুটা কম্পন শুরু হয়ে যাবে। অথবা আপনি নিজেও ছাপিয়ে বিক্রি অথবা প্রচার করতে পারেন। কারণ আমাদের লিখিত যে কয়টি বই আছে ও থাকবে তার সব রকম স্বত্ব (কপিরাইট) সবাইকে দিয়ে দেবার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে।

তাছাড়া অলী আল্লাহদের যারা প্রেমিক কেবলমাত্র তাদের কাছেই আমার অনুরোধ রইলো যে, পোকায় খাওয়া দাত যেমন সাড়াশি দিয়ে তুলে ফেলা হয় সেরকমভাবে বাতুল ফেরকাগুলো সমাজে যে পোকা খাওয়া দাতের মত যন্ত্রণা তেরা করছে সেই দাতগুলো তোলার জন্য আমাকে আর্থিক সাহায্য করুন। আওলাদে রসুল শহিদে কারবালা মাওলা ইমাম হোসায়েন তো আসল কারা আর নুকল কারা এই ভাগ করে দেখিয়ে দিতে গিয়ে সবকিছু লুটিয়ে (কোরবানি) দিলেন, আর আমরা তাদেরই ভক্ত হয়ে কিছু সামান্য আর্থিক সাহায্যের জন্য দরাজ দিলে এগিয়ে আসবো না? আপনাদের ছোট ছোট দান একত্র করে লক্ষ লক্ষ বই প্রয়োজনে সমাজের জ্ঞানী-গুণী হতে শুরু করে সবার মাঝে বিনামূল্যে নতুন নামমাত্র মূল্যে এমনভাবে ঢালাও প্রচার ঢালাবো যেন বাংলাদেশের প্রায় ঘরে বইগুলো পাঠাতে পারি। আশা করি এতে বাতুল ফেরকাগুলোর বুকে একটা কম্পন শুরু হয়ে যাবে। যদি সাহায্য করাটা আপনাদের বিবেক ফরজ বলে যায় দেয় তাহলে প্রকাশনালয়ের তিকানায় আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা এবং অন্যান্য পরামর্শ দেবেন বলে আবেদন জানিয়ে একটি কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

ম্নেজাজি শয়তান এবং হাকিকি শয়তানের

গবেষণামূলক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

শয়তান দুই প্রকার : শরিয়তি শয়তান ও মারফতি শয়তান। শরিয়তি শয়তান অকর্তা, নিষ্ক্রিয় এবং অথর্ব। মারফতি শয়তান কর্তা, সক্রিয় এবং বিচরণশীল। শরিয়তি শয়তান আসলে কোন শয়তানই নয়। শরিয়তি শয়তান একটি মোটামুটি ধারণা দিতে পারে। এর বেশি কিছু করার কোন প্রকার ক্ষমতা শরিয়তি শয়তানের নাই এবং বিধান রাখা হয়নি। এক কথায়, শরিয়তি শয়তান মারফতি শয়তানের কাজ-কাম কেমন হতে পারে তার একটি ধারণা দিতে পারে।

শরিয়তি শয়তান তিন প্রকার। মারফতি শয়তান চার প্রকার। শরিয়তি শয়তান একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। মারফতি শয়তান চার প্রকার এবং এই চারটি শয়তানও মাত্র দুইটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। শরিয়তি শয়তান নামেমাত্র শয়তান, তবে মূল্যহীন নয়। মারফতি শয়তান ভয়ংকর এবং যত প্রকার অপকর্ম আছে তা তৈরি করে। মারফতি শয়তানটাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই শরিয়তি শয়তানটি রাখা হয়েছে। সত্যকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য অনেক সময় রূপকের প্রয়োজন হয়। রূপকের আরেক নাম মেজাজি। এই মেজাজি শয়তানকেই শরিয়তি শয়তান নামে বলা হল। মারফতি শয়তানটি হল আসল শয়তান। আসলকে বলা হয় হাকিকি। তাই নাম দিলাম মারফতি শয়তান। তাহলে কী দাঁড়াল? একটি রূপক হাকিকি শয়তান। রূপক তথা মেজাজি শয়তান তিন প্রকার এবং তিনটি স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং নড়াচড়া করার কোন ক্ষমতা বা অধিকার দেওয়া হয়নি এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মাত্র একটি দেশে পাওয়া

যায়, সেই দেশটির নাম সৌদি আরব। আবার বিশাল সৌদি আরবের মাত্র একটি নগরীতে পাওয়া যায়, নাম হল মক্কা নগরী এবং এই নগরীর পশ্চিম কোরবানির মিনা নামক স্থানে তিনটি শয়তান পাওয়া যায় : বড় শয়তান, মেঝো শয়তান এবং ছোট শয়তান। প্রত্যেক হাজিকে হজ্জ করার সময় এই তিনটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারতে হয়। হজ্জ পালনের যে কয়টি অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, এই তিনটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারাটিও তার একটি অনুষ্ঠান। অনুপরিমাণ সত্য অনুষ্ঠানের মাঝে লুকিয়ে আছে। অনুষ্ঠানগুলোকে যথাযথভাবে পালন করার নামই শরিয়ত। শরিয়ত বাহির দেখে যথার্থতা প্রমাণ করবে। কারণ ভেতরের অংশটুকু দেখা শরিয়তের অংশে আসে না। সুতরাং বড়, মেঝো এবং ছোট তিনটি শয়তানকে শয়তান বলে মানতে হবে, যদিও হাকিকতে তিনটির একটিও শয়তান নয়। এই তিনটি শরিয়তি শয়তান এজন্যই রাখা হয়েছে যেন আসল শয়তান তথা হাকিকি শয়তানগুলোকে চিনতে পারে, জানতে পারে এবং পরিষ্কার বুঝতে পারে। আসল শয়তান তথা হাকিকি শয়তান হল চারটি : ইবলিশ, শয়তান, মরদুদ এবং খান্নাস। এই চারটি শয়তানও আবার আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিজগতে মাত্র দুইটি স্থানে থাকে এবং আর কোথাও থাকে না এবং থাকার কোন আইন আল্লাহ পাক রাখেন নাই। সেই দুইটি স্থানের নাম হল, এক জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। দুর্বল ঈমানের দরুণ অনেকে জিনের বিষয়টি সম্যকভাবে এড়িয়ে যায়। এই দুইটি অন্তর ছাড়া আসল তথা হাকিকি শয়তানের থাকার আর অনুপরিমাণ স্থানটিও রাখা হয়নি। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তৌহিদে বাস করে এবং তজবি পাঠ করে। তৌহিদের ঘরে শয়তান থাকতে পারে না এবং থাকবার আইন নাই। যে আকাশ হতে শয়তান আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে, উহা

জিন ও মানুষের মনের আকাশ। পৃথিবীর উপরের আকাশ নয়। কারণ পৃথিবীর উপরের আকাশটি তৌহিদে বাস করে। নবী-রসুলের কাছে যে ওহি আসে সেটা এক বিষয় আর মোমাছির কাছে যে ওহি আসে সেটা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। এই পার্থক্যটুকু ধরতে না পারলেই সব বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে যায় এবং গোঁজামিলের

জন্ম এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়। আসল তথা হাকিকি শয়তান মক্কার মিনাতে থাকে না, থাকে হাজিদের অন্তরে। ইবলিস মাটিতে থাকে না বরং থাকে জিন এবং মানুষের অন্তরে। মরদুদ ধরনীতে থাকে না, থাকে জিন এবং মানুষের অন্তরে। খাল্লাস আকাশ আর মাটিতে থাকে না, থাকে কেবল মাত্র জিন এবং মানুষের অন্তরে। বারবার মনে রাখতে হবে যে, এই চারটি শয়তান কেবলমাত্র জিন এবং মানুষের অন্তরে থাকে এবং আর কোথাও থাকতে পারে না এবং থাকার সামান্য আইনও রাখা হয়নি। এই প্রাথমিক সূত্রটি জানা না থাকলে ইসলামের মূল রহস্যটি বোঝা বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়ে। মানুষ সবসময় মনে করে যে, শয়তান বাহিরে থাকে এবং এই বাহিরে থাকার ধারণাটাই ইসলামকে বুঝবার সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ভাবতেই চায় না যে, শয়তানটি তার অন্তরেই লুকিয়ে আছে। এরও কারণ আছে। কারণটি হল, জাগতিক মানবসভ্যতাটি তো মানুষ অন্তরের ভিতর শয়তানকে রেখেই গড়ে তুলেছে। হযরত দাউদ আর হযরত সোলায়মানের অনেক কাজকাম জিনেরাই করেছে কিন্তু কোরান জিন শব্দটি ব্যবহার না করে শয়তান শব্দটি ব্যবহার করেছে। শয়তান মানবসভ্যতার জাগতিক পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বাধা হয়ে দাঁড়ায় যখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ধ্যান-সাধনায় মশগুল হতে চায়। আল্লাহর রহস্য জানবার পথে সাধকের প্রতিটি ধাপে চলে শয়তানের উনিশ প্রকার ধোঁকার উনিশ প্রকার অশ্ব। শয়তান কিছুতেই সাধককে শেষ লক্ষ্যে যেতে দিতে চায় না। বারবার বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক রকম অশ্ব হাতে নিয়ে। তাই সাধককে সব সময় শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এই যুদ্ধরত অবস্থাটির নাম হল নফসে লাউয়ান্না। যখন সব রকম বাধা সাধক একটি

একটি করে পার হয়ে যায় এবং আর কোন ধোঁকাই কাজে আসে না, তখনই সাধক শান্ত হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয়ে যায়। পরিতৃপ্ত অবস্থাটির নাম হল নফসে মোতমায়েন্না। এখানে আর শয়তানের কোন কাজকাম চলে না। শয়তান একদম বেকার। সাধক এই অবস্থানে যখন আসতে পারে তখনই জান্নাতের তথা মুক্তির বারতাটির সার্থকতা দেখতে পায় এবং পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং জেহাদ দুই প্রকার, একটি শরিয়তি তথা মৈজাজি জেহাদ এবং অপরটি আসল তথা অপরটি আপনার ভিতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসরুপী শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ। দুইটি জেহাদেরই একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। শর্তটির নাম হল, ফিছাবেলিল্লাহ্ তথা আল্লাহর পথে। তবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মহানবী সাহাবাদের বলেছিলেন, ‘এবার তোমরা আসল জেহাদের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা কর।’

শয়তান যেমন দুই প্রকার, একটি বাহিরের অপরটি ভিতরের, দুইটির একটিকেও অস্বীকার করা চলবে না। অস্বীকার করলে সমাজ জীবনের ভারসাম্য দুর্বল হতে পারে। তবে যারা মাজ্জুব, যারা গালবাতে মাবুে ডুবে থাকেন, তাদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। এজন্যই মহানবী আবদুহদের কোন প্রকার এবাদত-বন্দেগির ছকে ফেলতে মানা করেছেন (মেশকাত শরীফ-ছয় হাজার সতের নম্বর হাদিস)। সুতরাং আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে, ইসলামের প্রায় বিষয়গুলোর দুইটি দিক আছে : একটি বাহিরের দিক এবং অপরটি ভিতরের দিক। বাহিরের দিকটির উপর গবেষণামূলক ধ্যান-ধারণা থাকলেই ভিতরের বিষয়টা কম-বেশি ধরা পরতে বাধ্য। যাকে যতটুকু বুঝবার এবং ব্যাখ্যা করবার রহম আল্লাহ কর্তৃক

দেওয়া হয়ে থাকে, সে ততটুকুই বুঝতে পারে। তাই এই বুঝবার শক্তির আদান-প্রদান হলে জ্ঞান ও রহস্যলোকের বিষয়গুলো সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারলেও অস্বীকার করবে না।

কারণ, বস্তুবিজ্ঞানের বিষয়গুলো যত অবাক করা বিজ্ঞান হউক না কেন, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা একদম গম্ভীরও মনে নিতে বাধ্য হয়। কারণ, বিজ্ঞান নাকে-মুখে ঘুষি আর চড়-থাপ্পড় মেরে মেরে বুঝাতে থাকে, যেমন স্কুল-ছাত্রটিকে শিক্ষক কড়া শাসন করে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তেতো ষষ্ঠের মত। খেতেই যখন হবে তো নাক-কান বন্ধ করে গিলতে থাকে। রহস্যলোকের ডেড রহস্য তো আপন দেহে অবস্থান করে। তাই এই রহস্য দেখানো যায় না। পাইকারিভাবে এই রহস্যটি দেখানোর বিধানটি থাকলে আল্লাহর পরীক্ষা করার বিধানটি আর থাকে না। যদিও কখনো কখনো দেখানো হয়ে থাকে, তাকেও স্পষ্ট যাদু বলে অস্বীকার করে বসে। ভূরি ভূরি উদাহরণ তুলে ধরা যায়। এই মারেফতি জ্ঞান গোপন। গোপনটিকে আল্লাহপাক সবার কাছে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরেন না। কারণ তাহলে পরীক্ষা বলে আর কিছু থাকে না। আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিজগতের মাঝে কোথাও সামান্য ভুল নাই এবং থাকতে পারে না। আমরা বুঝতে পারি না, তাই মনে মনে অনেক ভুল-ত্রুটি দেখতে পাই এবং অনেকে এই ভুল-ত্রুটি (?) তুলে ধরতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। পৃথিবীর পানি এবং গাছ যদি কালি-কলম হয়, তবু কোরানের ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। অথচ আমরা ব্যাখ্যা লিখাটাকে শেষ মনে করি। অনেকে তো কোরান বুঝাবার সহজ ফর্মুলা পর্যন্ত আবিষ্কার করে বাজারে বই আকারে ছেড়েছেন। যারা কোরান বুঝাটা সহজ

মনে করেন তাদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নাই। কারণ, সহজ বলাটাই তার তকদির। কে মানল আর কে মানল না সেটা সে-ই দেখতে যাবে না, যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, জ্ঞান অসীম এবং আল্লাহও অসীম। তাই আমার মনে হয় যে, দুনিয়াতে সবচাইতে বড় পাপের কথাটি হল, ‘আমি সবকিছু বুঝে গেছি।’ যে বা যারা সবকিছু বুঝে যান তাদেরকে আর বুঝানো যায় না। শতশত যাদুকর মহানবীর মোজ্জেজা দেখামাত্র কলেমা পড়ে মুসলমান হল, অথচ আবু জাহেল ধমক দিয়ে বলতে লাগল, ‘তোমাদের যাদু জমিনে চলে আর তাঁর (মহানবী) যাদু (?) আসমানেও চলে।’ এদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়া আর না দেওয়া সমান। কারণ এরা জলজ্যান্ত সত্যটি দেখতে পায়, কিন্তু গ্রহণ করতে পারে না। ওকবা যে জারজ সন্তান, তার মায়ের কাছে সেটা জ্ঞানবার পরও তো মহানবীর ভক্ত তথা মুসলমান হতে পারেনি। ইসলামকে গ্রহণ করে নিতে পারেনি।

মানুষ সবচেয়ে বড় ভুলটি করে এই বলে যে, শয়তান বাহিরে থাকে। মানুষ মনেই করতে পারে না যে, শয়তানের থাকবার স্থানটি হল একমাত্র জিন এবং মানুষের অন্তর। এই দুইটি অন্তর ছাড়া আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও শয়তানকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই কোরান সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছে শয়তান বিষয়ে। অথচ মানুষ শয়তানটিকে খোঁজে তার দেহের বাহিরে। মনেই করতে চায় না যে, শয়তানটি তারই সঙ্গে খান্নাস আর মরদুদরূপ ধারণ করে বহাল তবীয়তে বিরাজ করছে। শয়তানের বিষয়টির আলোচনা করতে গেলেই বাহিরে খোঁজার তোর-জোর শুরু হয়ে যায়। কতবার বলব যে শয়তান মানুষের অন্তরের বাহিরে থাকে না এবং থাকার অধিকার দেওয়া হয়নি। তবু মানুষ জেনে-

শুনে শয়তানকে বাহিরে খোঁজার চিন্তা করে। মক্কার মিনাতে যে তিনটি শয়তান দাঁড়িয়ে আছে ইহা রূপক শয়তান, প্রতীকি শয়তান, ম্লেজাজি শয়তান, শরিয়তি শয়তান। আসলেই ইহা আসল শয়তান চিনিযে দেবার জন্য বানানো হয়েছে। আসল শয়তান মানুষ বানাতেই পারে না এবং বানাবার বিধান নাই। রূপক তথা ম্লেজাজি শয়তানটি না থাকলে আসল তথা বিমূর্ত, যাহার আকার নাই, যাহা চোখে দেখা যায় না, সেই শয়তানটির ধারণা করা কষ্টকর হত।

মক্কার কাবা ঘরটি তেমনি রূপক কাবা, প্রতীকি কাবা, ম্লেজাজি কাবা, শরিয়তি কাবা। আসলে এই রূপক তথা ম্লেজাজি কাবাঘরটিকে বানানো হয়েছে আসল কাবাটিকে চিনিযে দেবার উদ্দেশ্যে। আসল কাবা মানুষ বানাতে পারে না এবং বানাবার বিধান নাই। রূপক কাবাটি না থাকলে আসল তথা বিমূর্ত কাবাটির ধারণা করা কষ্টকর হত। আসল তথা হাকিকি কাবাটি হল মোম্বিনের দিল। তাই বলা হয়, মোম্বিনের দিলকাবাটি হল আসল কাবা। শরিয়তি কাবার অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে তোয়াফ করতে হয়, তেমনি মোম্বিনের দিল-কাবাটিকে হাকিকি তোয়াফ করতে হয়। মোম্বিনের দিল-কাবার তোয়াফ করাটাই আসল হজ্জ। এজন্যই কোরান বলছে যে, আল্লাহ মোম্বিনের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু হাজ্জিদের সঙ্গে আল্লাহ থাকে এই রকম একটি মাত্র কোরানের আয়াতও নাই এবং থাকতে পারে না। কারণ ম্লেজাজি কাবার ম্লেজাজি তোয়াফ ম্লেজাজি হাজ্জিদের করতে হয় বলে, ‘ইল্লাল্লাহু সাত্মাল হজ্জাজ্জ’ তথা ‘হাজ্জিদের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন’ এই রকম একটি আয়াতও কোরানে নাই। ম্লেজাজি শয়তানকে ম্লেজাজি পাথর মারলেই হাকিকি শয়তান হতে মুক্তি পাওয়া যায় না। যতবারই ‘আউজুবিল্লাহে মিনাশ শাইতোয়ানোর রাজিম’ পড়ি না কেন, শয়তান হতে মুক্তি পাওয়া যায় না, অথবা

শয়তান ছেড়ে দেবে না, কারণ রূপক সত্য নয়, বরং সত্যকে চেনার পথে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

রূপক আর আসল এক নয়। তবে রূপক আসলের পরিচয়ের সুন্দর বাহন। অনেক সময় আসলকে বাদ দিয়ে রূপকটিকেই একমাত্র বিষয় মনে করে নিলেই বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তখন আসলটি অনুষ্ঠানের চাপে হারিয়ে যায়। কেউ আসলটি তুলে ধরতে চাইলে রূপকের বিশ্বাসই গালি দেবার নানা রকম ফতোয়া দিতে থাকে। এই ফতোয়ার আবজ্ঞনায় সত্য ঢেকে যায়। তবে চিরুতরে ঢাকা যায় না। কিছু গবেষক বারবার আসল বিষয়টি তুলে ধরে এবং জ্ঞানীরা বুঝতে পারে এবং গ্রহণ-বর্জনের ফেরকাবাজি, বাগড়া এমনকি মারামারিতে গিয়ে ঠেকে। গবেষকেরা কিন্তু রূপকটিকে কোন দিনই অস্বীকার করে না। শুদ্ধার সঙ্গে বলে যে, রূপকের প্রয়োজন আছে। তবে রূপকটি মোটেই আসল নয় বরং আসলকে চিনিয়ে দেবার বাহন মাত্র। আপনি বুকে হাত রেখে বলেন তো, মন্টার মিনাতে অবস্থিত তিনটি বড়, মেঝো এবং ছোট শয়তান কি আসল শয়তান? না, মোটেই না। বলবেন, এগুলো রূপক শয়তান। এগুলোর প্রয়োজন আছে আসল শয়তানের পরিচয় পাবার জন্য। কিন্তু যারা এই তিনটি রূপক শয়তানকেই আসল শয়তান বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকেই বা বলার কী থাকতে পারে? যারা চোখে আসল দিয়ে বুঝতে চাইলেও বুঝতে চাইবে না, তাদেরকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু এই রূপক ওয়ালারাই যখন তেড়ে মারতে আসে, নানা রকম গালাগালি দেয় এবং জোর করে মুখ বন্ধ করে দিতে চায়, তখন কী করা উচিত? আপনিই বলে দিন। এভাবেই ধর্ম নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। যদি কোন গবেষক বলেন যে, রূপক তিনটি শয়তানের মত কারা ঘরাটুও রূপক। ইহা আসল কাবা নয়। আসল কাবা মোমিনের দিল। আর মোমিনের দিল যদি কাবা হয় তো সেই কাবা জ্যাস্ত কাবা। যদি কোন গবেষক বলেন যে, রূপক তিনটি শয়তান আসল শয়তান নয়, আসল শয়তান জ্যাস্ত শয়তান এবং শয়তানের কাজ-কামগুলো ভয়ংকর এবং প্রকাশ্য শত্রু। রূপক শয়তান মৃত। সুতরাং মৃত শয়তানের কোন কাজ-কাম থাকে না। কেবল আসল এবং জ্যাস্ত শয়তানের পরিচয়টি মনে করিয়ে দেওয়া। কেউ মনে করতে পারে, আবার কেউ পারে না। তাই অনুষ্ঠান এবং আসল বিষয়টি পাশাপাশি চলে। কেউ ধরতে পারে, কেউ পারে না। অনুষ্ঠানটি নিয়ে এত বেশি মাতামাতি করা হয় যে, মনেই হয় না এর মাঝে আসল বিষয়টি প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকিয়ে আছে। এই ভুলগুলো আমাদেরকেই গুধিয়ে নিতে হবে, নতুবা ভুলের গর্তে বারবার পড়ে যাবার সম্ভব বিপদ থাকতে পারে। রূপক কাবার ত্রয়োফটি কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখা ঠিক নয়। কারণ, রূপকের মাঝেই আসলটিকে ধরতে হয়। ধরে নেবার জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই জ্ঞান অর্জনটি

যারা করতে পারে না তারা অনেকটাই পিঠে চিনি বহনকারী গাধার মত। চিনি গাধার পিঠেই, কিন্তু চিনির মজা পাবার তকদির নাই। সুতরাং গাধাকে গালি দিতে নাই। আসল কাবার পরিচয়টি না জেনে না বুঝে সামান্য বিবেকটাকে খাটাতে পারছে না, বরং রূপক কাবা বলতে গেলে যা-তা বলে বেড়ায়। তাদেরকে দোষ দেওয়া ঠিক নয় বরং আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। মানুষের প্রবৃত্তির একটি অংশ এক লাফে আল্লাহতে গিয়ে মিশতে চায়। মাধ্যমটিকে জঞ্জাল মনে করে। কারণ খান্নাসরূপী শয়তান এই বুদ্ধিটি অস্তরের ভিতরে জাগিয়ে তোলে। মানুষ প্রায়ই স্বেচ্ছাচারী, কারো মাধ্যম নিতে চায় না। তাই গুরুর গোলামি করার কথাটি বললে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। খান্নাসই নিজের ভেতর এই আক্রমণাত্মক ভুলিকাটি পালন করায়। অথচ মানুষ খান্নাস দেখতে পায় না। মানুষ মনে করে সেই মানুষটির কথাটি কত চমৎকার। এটাই চিকন ধোকা আর প্রতারণা। তাই জীবন্ত শয়তানের পরিচয় সর্বপ্রথম জেনে নিতে হয়। তা না হলে ইসলামের কিছুই বুঝবার উপায় থাকে না। আর সুফিবাদ বুঝবার তো প্রশ্নই আসে না। মানুষের ধারণা, মানুষের বিশ্বাস যে শয়তান নিজের দেহের বাহিরে থাকে। এই ধারণা আর বিশ্বাস মানুষকে পতনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অথচ মনে করে সঠিক পথেই তো আছি। শিশুকে যেমন প্রথমে অঙ্কুর পরিচয় করিয়ে দিতে হয়, তেমনই ইসলাম গবেষকদের প্রথমে শয়তানের রহস্য জেনে নিতে হয়। এই মহামূল্যবান বিষয়টি জানা না থাকলে সে কেমন করে ইসলাম গবেষক হয়? কেমন করে গুরু সাজে? এরকম ইসলাম গবেষক আর গুরুরা সোজা বিষয়টিকে এমন জটিল করে তোলে যে, মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। আমি অবাক হই, যখন প্রশ্ন করি শয়তান বিষয়টি আর তখন আবোল-তাবোল কিছু একটা বলে ফেলে। বার বার বলছি, বার বার বলছি শয়তান একমাত্র জিন এবং মানুষের অস্তরে থাকে। এর বাহিরে শয়তানের থাকার একটি স্থানও সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে নাই। তাহলে কেমন করে মনে করতে চায় যে, শয়তান নিজের দেহের বাহিরে থাকে? সেটার সঙ্গে এটাও জানতে হবে যে, সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও আল্লাহ জাতরূপে থাকেন না। এবং থাকবার আইনটি সমগ্র কোরানের মাত্র একটি আয়াতেও পাবেন না। সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে আল্লাহ অবশ্যই থাকেন, কিন্তু সিফাতরূপে। জাতরূপে একমাত্র মানুষের অস্তরেই থাকেন। দুধ আর মাখনের মত। মাখন দুধের মাঝে দেখা যায় না, কিন্তু জিকির আর ধ্যান-সাধনা দ্বারা মাখনরূপী রূহ যখন ভেসে উঠে তখন নিজের নফসটি আর দুধ থাকে না, বরং ঘোল তথা মাঠায় পরিণত হয়। মাঠা বা ঘোল দেখতে একদম দুধের মত। চোখের চাহনিতে ধরা পড়ে না। তখনই ধরা পড়ে যখন পান করে। পান করার সময় বুঝতে পারে যে, আমি তো দুধ পান করছি। সাধারণ মানুষ আর গুলিকে দেখতে এক রকম মনে হয়। আসলে ঘোল

দেখতে দুধের মত। এগিয়ে না গেলে, স্বাদ নেবার মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করতে না পারলে এই বিরাট পার্থক্যটি বুঝবার আর উপায় থাকে না।

অধিকাংশ মুসলমান ম্লেচ্ছাজি কাবা, প্রতীকি কাবা, রূপক কাবা বা শরিয়তি কাবাটিকেই আসল এবং একমাত্র কাবা মনে করেন। ওহাবি আর শিয়ারা তো শরিয়তি কাবা আর হাকিকি কাবা বললে হাসে এবং চুটকি ম্লেচে উড়িয়ে দিয়ে জ্ঞান প্রদর্শন করার ঢেকুর তোলে। অবশ্য এটাও তাদের তকদির। আল্লাহ বুঝতে দেয় নি, তাই বুঝবে কেমন করে? বোড়া (টোড়া) সাপের সামনে শত বীন বাজালেও ফণা তুলতে পারে না। কারণ বোড়া সাপের তকদিরে ফণা দেওয়া হয়নি, তাই ফণা তুলবে কেমন করে? যদি ধমক দিয়ে বলেন যে, জাতি সাপ এক বীনের সুবেই ফণা তোলে আর তোরা দশটা বীন বাজানোর পরও কেন ফণা তুলছিস না? ঐ বোড়া সাপগুলো হয়তো বোবা ভাষায় বলবে, তুমি কি জ্ঞান না যে, আমাদের জন্মের আগেই তকদিরে ফণা নাই লিখে দেওয়া হয়েছে, তাই কেমন করে ফণা তুলব? ফণাই তো দেওয়া হয়নি, তাই ফণা তুলার জন্য এত হেদায়েত করা তো বেকার। ওকবা মায়ের কাছে জারজ সন্তান জানার পরও ঈমান আনতে পারল না। আবু জাহেল এত মোজেজা দেখার পরও তো ঈমান আনতে পারল না বরং যাদু বলে অপবাদ দিল। জন্মের আগেই ওহাবি আকিদা তকদিরে লিখে দেওয়া হয়েছে, তাহলে সুন্নি আকিদায় বিশ্বাস করবে কী করে? জোর করে সুফিবাদে আনলে বরং হিতে বিপরীত হয়। অবশেষে সুফিবাদের মাহফিলে পায়খানা-পেশাব করে যা-তা করে ফেলে। তবলিগের গাট্টি যার কপালে লিখা হয়ে আছে তাকে কেমন করে সুফিবাদে আনবেন? আনতে যাওয়াটাও বোকামি। তাই আল্লাহর হাতে ছেড়ে

দিতে বলেছেন বড় বড় ওলিরা। তা ছাড়া কিছু পাতা না থাকলে গোলাপ ফুলটি উলঙ্গ লাগে। পাতাগুলো গোলাপের রূপটি ফুটিয়ে তোলে, যদিও পাতা কখনোই ফুল নয়। সুতরাং আমি তাদের জন্যই লিখছি, যারা আসল বিষয়টা বুঝতে পারবেন, আসল মত ও পথের সন্ধানটা পাবেন।

আপনার-আমার কাছে যেটা আসল মত ও পথ, অপরের কাছে তা নকল মত ও পথ মনে হতে পারে, যদি তার তকদিরে তা-ই লিখা থাকে। কারণ, তকদির খণ্ডানো যায় না। যে তকদির খণ্ডানো যায় সেই তকদিরটি হল দুনিয়ার বৈষয়িক উন্নতি। তাই দেখতে পাই যে, ইউরোপ, আমেরিকা আর জাপান দুনিয়ার বৈষয়িক তকদির এতখানি বদলাতে পেরেছে এবং আরো কতো যে বদলাতে পারবে তা আগামীতে অনেক দেখা যাবেই। কারণ, এরা পরিশ্রমী জাতি, এরা গবেষকের জাতি তাই দুনিয়ার বৈষয়িক উন্নতির শিখরে উঠবেই। কারণ, যারা যা চায় আল্লাহ তাদেরকে তা-ই দেয়। আমরা না হতে পারলাম সুফি আর না হতে পারলাম বৈষয়িক বিষয়ের গবেষক। সুতরাং শরিয়তি তিনটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারার মত শরিয়তি কাবার শরিয়তি তোয়াফের শরিয়তি হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো পালন করতেই হবে। তা না হলে শরিয়তি হজ্জ করা যায় না। হাকিকি কাবার হজ্জ করতে হলে হাকিকি তোয়াফ করতে হবে। হাকিকি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারতে হলে হাকিকি পাথর খুঁজতে হবে। হাকিকি শয়তান তথা আসল শয়তান থাকে প্রতিটি মানুষের অন্তরে। অন্তরের বাহিরে শয়তান থাকে না। থাকতে পারে না। কারণ বাহিরটা তৌহিদে বাস করে। তৌহিদের ধারে কাছেও শয়তান থাকতে পারে না এবং থাকার আইন নাই।

মোম্বিনের দিলই যে আসল কাবা, মক্কার কাবাটি রূপক, বারবার বুঝিয়ে দেবার পরও অনেকেই বুঝতে চায় না। বরং নানা রকম কথা দিয়ে যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করে বিষয়টিকে ঘোলাটে করে তোলে। মনে করে ঐ মেক্কাজি কাবাটাই আসল কাবা। রূপকই মানতে চায় না। আসল তো অনেক দূরের কথা। এই সামান্য বিষয়টি জানা নাই অথচ ইসলাম গবেষক, পীর সাহেব ইত্যাদি। আবার অনেকে আসল বিষয়টি জানবার পর রূপক শয়তান এবং রূপক কাবাটিরও যে প্রয়োজন আছে, সেটা মনেই করতে চায় না। তাই সাধারণ মুসলমান পড়ে যায় মহাফাঁপরে। এটুকু বুঝতে চায় না যে, ইসলামের যে যে বিষয়গুলোতে রূপক আছে, সেখানে আসলটি থাকতে বাধ্য। রূপক এবং আসল থাকলেই আল্লাহর প্রত্যক্ষভাবে থাকার একটি কোরানের আয়াতও পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন মিনাতে পশু কোরবানি করতে হয়। এই পশু কোরবানি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, অন্তরের ভেতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসরূপ শয়তান নামক পশুটিকে কোরবানি করতে শিখ। যেহেতু রূপক এবং আসলটি আছে তাই কোরান একবারও বলেনি যে ‘ইন্নালাহা মাআন নুসুকিনা’ অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কোরবানিকারীর সঙ্গে আছেন।’ যেমন ওয়াক্ফিয়া নামাজ এবং দায়েমি নামাজ কায়েম করতে হয়। তাই কোরান একটি বারও বলেনি যে, ‘আমি নামাজীদের সাথে আছি’ তথা ‘ইন্নালাহা মাআল মুসল্লিনা’। তাই বলে রূপকটিকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ নামাজ বেহেশ্বের চাবি। কিন্তু কোন নামাজটি বেহেশ্বের চাবি এটা না বলাই ভাল। জানা থাকলেও চুপ করে থাকতে হয়, কারণ তাহলে নামাজ পড়ার উৎসাহটি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। আবার রূপক এবং আসল বিষয়টি বাদ দিলেও আমরা গবেষণা করে দেখতে পাই, যে সকল এবাদত বন্দেশি দেখা যায় এবং সবাই বুঝতে পারে

সেই সব বিষয়ের একটিতেও আল্লাহ্ আছেন এই কথাটি কোরানের কোথাও পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন রোজার কথাটি তুলে ধরছি। সমগ্র কোরানের মধ্যে একটি আয়াতেও আপনি পাবেন না যেখানে লিখা আছে ‘ইন্নালাহা মাআস সায়েমিনা’ অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রোজাদারদের সঙ্গে থাকেন’। অথচ রোজার ফজিলত সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা আছে। এমনকি রোজাদারদের জন্য স্পেশিয়াল (বিশেষ) জ্ঞান রাখা হয়েছে। অথচ অবাক কাণ্ড, ‘ইন্নালাহা মাআস সায়েমিনা’ কথাটি সমগ্র কোরানের একটি আয়াতেও নাই। কেন নাই? কারণ রোজাটি দেখা যায়। দৃশ্যমান বন্ধেগির সঙ্গে আল্লাহ্ থাকেন না। (যদি কেহ পেয়ে থাকেন তাহলে জানিয়ে দিলে আমার ভুল শুধরিয়ে নেব এবং চির কৃতজ্ঞ থাকব)।

সালাতের সঙ্গে যাকাত দেবার কথাটি প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একই সঙ্গে দেখতে পাই। যাকাত আদায় করা একটি মহাপুণ্যের কাজ। যাকাত দিবার উৎসাহ কোরান-হাদিসে অনেকবার আছে। অথচ অবাক হই তখনই, যখন দেখতে পাই আল্লাহ্ যাকাত আদায়কারীর সঙ্গে থাকেন না। সমগ্র কোরানের একটি আয়াতেও আপনি পাবেন না যে, “ইন্নালাহা মাআল মুজাক্কিনা” অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকাত প্রদানকারীর সাথে আছেন’। এই অপ্রিয় কথাগুলো শুনে চমকাবারই কথা এবং অবাক হবারই বিষয়। শুনতে ভাল না লাগারই কথা। বিষম্বতার ছায়া নেমে আসতে চায় মনে-প্রাণে। কিছু করার কিছুই নাই। কারণ কথাগুলো কোরানপাকের কথা। কোন ইসলাম গবেষক অথবা কোন পীর সাহেবের কথা নয়।

গরীব-দুঃখীদের দান করা একটি মহৎ কাজ। কোরান এমন কথাটিও বলেছে, যারা এতিম হতে (এতিম অর্থ সর্বহারা, কিন্তু সর্বহারা শব্দটির সঙ্গে উগ্রবাদ এবং স্বল্পাসবাদ জড়িয়ে আছে বলে এতিমের অর্থ সর্বহারা করতে চাই না, কিন্তু আসলেই এতিম অর্থটি হল সর্বহারা। যেমন পবিত্র বদর, রাজাকার, আর মস্তান শব্দগুলো শুনলে মানুষ লজ্জা পায়) মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা প্রথমেই ইসলাম হতে বাদ। দান-খয়রাত করা, এতিম-মিসকিনদের প্রতি দয়াপ্রদর্শনের কথাটি কোরান-হাদিসে ভরপুর। অথচ অবাক হই তখনই যখন দেখতে পাই যে, এদের সঙ্গেও আল্লাহ থাকেন না, কারণ বিষয়টি দেখা যায়। ‘ইন্নালাহা মাআস্ সিদ্দিকিনা’ অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সদকাকারীদের সঙ্গে আছে।’ এই কথাও কোরানে পাওয়া যায় না।

যেহেতু আল্লাহপাক এই সকল গুণের অধিকারীদের সঙ্গে থাকেন না সেই হেতু উদাসীন থাকার প্রশ্ন উঠে না। আমি কেবল যে চারজনের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন সেই কথাগুলো কোরান হতে তুলে ধরছি মাত্র। যে সমস্ত বিষয়গুলো দেখা যায়, সেখানে কপটতা থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে, লোক দেখানোর মন-মানসিকতা থাকতে পারে, নিজেকে সম্মানীরূপে তুলে ধরার প্রবণতাটি থাকতে পারে। পবিত্র নিয়তে করলে অবশ্যই রহমত পাওয়া যাবে, আর অপবিত্র নিয়ত করলে কী হতে পারে তা সবাই কম-বেশি বুঝতে পারেন। যে সমস্ত বিষয়গুলোতে ভাল এবং মন্দের প্রশ্নটিকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সব বিষয়ে আল্লাহ যে থাকেন না কেবল মাত্র সেটাই তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন ধরুন, আল্লাহর জিকির করাটা একটি পবিত্র বিষয়। জলি ও খফি তথা শব্দ করে এবং মনে মনে জিকির আমরা কম-বেশি

করি। জিকির করার নিয়তের মধ্যে নিশ্চয়ই ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে বলেই আল্লাহ কোরানে একবারও বলেন নি যে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ জিকিরকারীদের সঙ্গে আছেন’ তথা ‘ইন্না ল্লাহা মাআস জাকেরিনা’। আবার যারা শাহাদাত বরণ করেন তাদের মর্তবা অনেক বেশি কোরান দিয়েছে। শহিদের মর্যাদার বয়ানটি না দিলেও কম-বেশি সবাই বুঝতে পারেন। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, আমরা যাকে শহিদ বলছি তার শহিদ হবার শর্তটিতে ফিসাবেলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হবার শর্তটি মানা হয়নি। তাই শহিদ হবার প্রশ্নে সংশয় থাকার সম্ভাবনাটি থাকতে পারে। তাই অবাক হতে হয় যখন দেখতে পাই আল্লাহ শহিদের সঙ্গে থাকেন না। যেমন ‘ইন্না ল্লাহা মাআস শুহাদানা’ তথা ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ শাহাদাত বরণকারীদের সঙ্গে আছেন’ কথাটি সমগ্র কোরানের একটি স্থানেও নাই।

এমনকি যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান তাদের সাথেও আল্লাহ আছেন বা থাকেন এমন একটি আয়াতও কোরানে নাই। যেমন ‘ইন্না ল্লাহা মাআস শাকেরীনা’ তথা ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের সাথে থাকেন’ কোরানে এরকম কথা বলা হয়নি।

এতগুলো বিষয়ের একটির সঙ্গেও আল্লাহ থাকেন না কেন, এটা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে কেন থাকেন না তার গবেষণা করতে তো মানা করা হয়নি। কেন এবং কী কারণে থাকেন না এগুলোর গবেষণা করতে তো দোষ নাই। তবে আমার মনে হয় যে, যে বিষয়গুলোতে আন্তরিকতার মাঝে কপটতা থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে সে সব বিষয়ে আল্লাহর থাকার কথাটি পাওয়া যায় না। অথচ যে চারটি বিষয়ের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বা থাকেন, সেগুলো একদম ভিতরের বিষয়।

বাহির হতে বুঝবার উপায় থাকে না। যেমন ধরুন, সবরের বিষয়টি। একশত গজ দূরে দাঁড়িয়ে কেউ নামাজ পড়লে বুঝা যায় যে, সে নামাজ পড়ছে। নামাজির রুকু সেজদা দেখেই বুঝি। কিন্তু যিনি সবরকারী তিনি যদি আপনার বগলতলায়ও বসা থাকেন, তাকে চেনবার কোন উপায় নাই। কারণ, সবর দেখানো যায় না। সবর ভিতরের জিনিস। একটু ভাল করে লক্ষ করুন, সূরা বাকারার একশত তিহ্মান নম্বর আয়াতটির দিকে। সংক্ষেপে বলছি, যারা ঈমানদার (মোমিন নয়, কারণ মোমিনকে ঈমান আনার কথাটি কোরানের একটি আয়াতেও পাবেন না। অথচ অনেকেই ঈমানদার আর মোমিনের লাবড়া পাকিয়ে এক করে ফেলে এবং পাঠকের এটা বুঝে উঠতে কষ্ট হয় এবং মনের অজান্তে ভুল করে ফেলে। কারণ ঈমানদারকে আবার ঈমান আনবার কথাটি আছে, কিন্তু মোমিনের বেলায় এরকম কথার প্রশ্নই উঠে না।) তাদেরকে মস্তানের সাহায্য চাইবার নিয়মটি ছোট করে বলা হয়েছে যে, তোমরা সবর এবং সালাতের (নামাজ) মাধ্যমে সাহায্য চাও। লক্ষ করুন, দুইটি বিষয় নিয়ে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। যেমন, ‘বে সোয়াবরে ওয়াস সালাতে’ তথা সবরের সহিত এবং নামাজের সহিত। লক্ষ করুন, মাত্র দুইটি শব্দ। একটি সবর এবং অপরটি সালাত। দুটোই পাশাপাশি, তবে সবর আগে, সালাত (নামাজ) পরে। এবার ভাল করে লক্ষ করুন, আয়াতের শেষে কী বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন বা থাকেন। সবরের পরেই তো সালাত (নামাজ)। কিন্তু নামাজিদের সঙ্গে থাকার কথাটি কেন বলা হল না? “ইল্লাল্লাহা মাআস মুসল্লিন” তথা “নিশ্চয়ই আমি নামাজিদের সঙ্গে থাকি”। এত বেশি নামাজের তাগাদা দেওয়া হল, এমন কি একবার দুইবার নয় বরং বিরামিবার নামাজের কথাটি বলা হল, কিন্তু একবারও কোরানের একটি

আয়াতেও নামাজীদের সাথে আল্লাহ আছেন বা থাকেন বলা হল না। এর কারণগুলো অনেক তুলে ধরা যায় এবং পৃথিবীর বিখ্যাত মণ্ডলানা, আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারী, সৈয়দ মোহাম্মদ হাশমী সাহেব ক্যাসেট, সিডি এবং ভিসিডিতে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ওহাবিদের যম্ম, দেওবন্দীর যম্মের মত ভয় করে বলেই ওহাবিরা হজ্জ করার অনুমতি দেননি। সৈয়দ মোহাম্মদ হাশমী সাহেবের মাত্র কয়টি ক্যাসেট শুনলেই অনেক ভুল ভেঙে যাবে এবং ওহাবিদের ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠানের কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে।

এই কথাটি সূরা বাকারার পর সূরা আনফালের ছেষটি নম্বরের আয়াতেও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ‘ওয়াল্লাহু মাআস সাবেরীন’ তথা ‘এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’

সবরকারীদের সঙ্গে থাকার কথাটি পাবার পর আমরা পাই মুঠাকীদের সঙ্গে থাকার কথাটি। মুঠাকী বলতে বুঝায়, যারা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতায় তদগত হয়ে তথা ধ্যান-সাধনায় মগ্ন হলে থাকেন। সূরা তওবা বা বারাতের ছত্রিশ নম্বরের আয়াতে এবং একশত তেইশ নম্বরের আয়াতে এভাবে দেখতে পাই, ‘ওয়াআলামু আন্নালাহা মাআল মুঠাকীনা’ তথা ‘এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুঠাকীদের সাথে আছেন।’

তারপর আমরা দেখতে পাই যে, সূরা আনকাবুতের ঊনসত্তর নম্বরের আয়াতে, মুহসিনিনদের সাথে থাকেন। মুহসিনিন শব্দের বাংলা অর্থটি হল সংকল্পশীল। যারা সংকল্প করেন তাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন। আমাদের দৃষ্টিতে সংকল্পের ব্যাখ্যাটি ব্যাপক হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে যারা সংকল্পশীল আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন বা আছেন। যেমন কোরান বলেছে, ‘ওয়াল লাজিনা জাহাদু ফিনালানাহু দিয়ান নাহম সুবুলনা ওয়া ইন্নালাহা লা মাআল মুহসিনিনা।’ অর্থাৎ, এবং যাহারা তোমরা জেহাদ করো আমাদের রাস্তার মধ্যে, অবশ্যই আমরা তাদেরকে

আমাদের হেদায়েত দান করব এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনিনদের সাথে থাকেন।' এখানেও লক্ষ্য করার বিষয় যে, বাক্যটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগটিতে, 'আমাদের (আল্লাহ) রক্ষায় হেদায়েত দান করবো'—কথাটি আছে এবং অপর ভাগে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ মুহসিনিনদের সাথে আছেন। প্রথম ভাগটিতে হেদায়েত দানের কথাটি পাই এবং পরের ভাগে মুহসিনিনদের সঙ্গে থাকার কথাটি পাই।

তারপর আল্লাহ মোমিনদের সঙ্গে আছেন বলা হয়েছে। আমানু তথা ঈমানদারদের সঙ্গে থাকার কথাটি নাই। কারণ কোরান ঈমানদারদেরকে পুনরায় ঈমান আনতে বলছে। প্রশ্ন আসতে পারে যে, একবার তো ঈমান আনা হয়েছে, তাহলে আবার কেন ঈমানদারকে পুনরায় ঈমান আনবার উপদেশ দিচ্ছে? তাহলে কি প্রথম ঈমানটি দুর্বল ঈমান? যে ঈমান দৃঢ়, শক্ত এবং দর্শনীয় সেই ঈমান আনার কথাটি কি বলা হয়েছে? একজন্য বড় বড় ওলিরা বলে থাকেন যে, ঈমান আনার পর ঈমান চলে যাবার প্রশ্নই উঠে না, কারণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের পর যে ঈমান হৃদয়ে স্থান লাভ করে উহা চিরন্তন ঈমান। (সিররে হক জাম্মে নূর নামক বইটিতে বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী ঈমানের সুন্দর সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন)। আপেক্ষিক ঈমান চলে যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু চিরন্তন ঈমান চলে যাবার প্রশ্নই উঠে না। যাহা না দেখে ঈমান আনা হয় এবং যাহা চোখে এবং জ্ঞানচোখে দেখে ঈমান আনা হয় দুটো কি এক? না কখনোই নয়। এটা যে কেউ মেনে নিবেন। সুতরাং মোমিনের ওজন অনেক বেশি, তাই আল্লাহ মোমিনদের সঙ্গে আছেন বা থাকেন। সূরা আনফালের উনিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া আল্লাল্লাহা মাআল মুমিনিনা' অর্থাৎ 'এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ মোমিনদের সাথে থাকেন'। (তবে আমাদের জ্ঞান মতে সমগ্র কোরানে এই আয়াতটি মাত্র একবারই বলা হয়েছে।) মোমিনদেরকে কোরানের দুই তিনটি স্থানে কেবল হাল্কাভাবে

উপদেশ এই বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের লজ্জাস্থানের উপর সতর্ক থেকে, ঝগড়া বা মতের মিল না হলে সম্মাধান দিতে চেষ্টা করো এবং এর বেশি কিছু তো পেলাম না (অবশ্য আমার জানা মতে)।

কোরান-হাদিসের গবেষণা করার প্রথম যে বিষয়টি অবশ্যই জানতে হবে তা হল শয়তান বিষয়টি। তাই আমার মনে হয় কোরানে যতবার শয়তান বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে আর কোন বিষয়ে এত বেশি বলা হয়নি। তাই শরিয়তি শয়তান তিনটি মক্কার মিনাতে রাখা হয়েছে। যাতে হাজিদের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার মুসলমানরা বুঝতে পারে যে, কেন এই তিনটি শয়তানকে পাথর মারতে হয়। বিতারিত শয়তান বলে বিকৃত অর্থ করার কোনই অবকাশ থাকে না, যদি হাজিদের পাথর ঝুড়ে মরার রহস্যটি কিছুটা হলেও বুঝতে পারতো। কোরান দর্শন নামক তফসিরে এবং কেবলা ও সালাত নামক বইটিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি পাবেন। লিখেছেন সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশ্তী। আসল শয়তান তো মানুষের অন্তরে থাকে, তাই অন্তরের শয়তানকে আবার কেমন করে পাথর ঝুড়ে মারতে হবে এর রহস্য বুঝতে না পেরেই রজিম শব্দটির অর্থ পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তানটির বিকৃত অর্থ করা হয় বিতাড়িত শয়তান। শয়তান যে দুধ আর পানির মত আমার সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে, এটা মনে করতেই চায় না। সুতরাং প্রতিটি মানুষের সঙ্গে শয়তান জ্যোত্স্নরূপে বিরাজ করেছে। প্রতিদিন সংসার জীবনে কত প্রকার যে ঘাত-প্রতিঘাতের পাথরের আঘাত খেতে হচ্ছে এবং এই আঘাত হতে মুক্তি পাবার জন্যই মহানবী বারবার বলেছেন যে, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে একটি শয়তান দেওয়া হয়েছে এবং উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, তোমার অন্তরের ভেতর

যে শয়তানটি আছে এটাকে সর্বপ্রথম মুসলমান বানাতে চেষ্টারত থাক, তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে মুসলমান বানাও। এখানে এই কথাটি পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, শয়তানটিকেও ধ্যানসাধনার মাধ্যমে মুসলমান বানানো যায়। তাই সূরা নজ্জে দেখতে পাই যে, মহানবী একটি কথাও হাওয়া হতে তথা শয়তান মিশ্রিত আন্নি হতে বলেননি। সুতরাং মহানবীকে যদি ভালবাসতে চাও তাহলে তোমার সর্বপ্রথম এবং প্রধান কাজটি হল, তোমার অন্তরের ভেতর লুকিয়ে থাকা শয়তানটিকে মুসলমান বানাও। মহানবীর এই সুন্নতটি সর্বপ্রথম পালন করতে বলা হচ্ছে, অথচ আমরা উদাসীন। সুফি কবি আল্লামা ইকবালের খুদির উপর রচিত কালামটি অপূর্ব এবং বিস্ময়কর, অথচ কালামটি কাওয়ালির সুরে নুসরত ফতেহ আলী খানের মত বিশ্বগুস্তাদের কণ্ঠে শোনার পরও হাঁশ হয় না। এটাই হয়তো মুসলিম জাতির জন্য একটি বিরাট কলঙ্ক বলে মনে হয়। খুদির ভেতর খান্নাসটিকে তাড়াবার তরে কী অপূর্ব ভাষায় সুফি কবি ইকবাল বলে গেছেন, যা শুনলে এবং পড়লে চমকে যেতে হয়। অথচ আমরা এই প্রথম এবং মূল বিষয়টিকে বাদ দিয়ে বিরাট ইসলাম গবেষক সাজি, পীর সাহেব হয়ে যাই, বড় মণ্ডলানা নামধারণ করে অনেক রকম কথার মারপ্যাচ দিয়ে সরল-সহজ মুসলমানদেরকে আসল বিষয়টি বুঝতে দিচ্ছি না। কোন এক অলী বলেছেন যে, বিচারকের বিচার আল্লাহ দুইবার করবেন : একবার বান্দা হিসাবে, আর একবার বিচারক হিসাবে। কারণ আল্লাহই বিচারের মালিক। মুখোমুখি কাল কেয়ামতে হতে হবে না?

সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও শয়তান থাকে না। থাকার অধিকার দেওয়া হয়নি। তা সে কাল গন্তরই হউক আর আলোকবর্ষ উর্ধ্বেই অবস্থান করুন, শয়তানকে থাকার

অধিকার দেওয়া হয়নি। শয়তান কেবলমাত্র মানুষ এবং জিনের অন্তর ছাড়া আর কোথাও থাকে না। অথচ আমাদের কপাল খারাপ এজন্য যে, আমরা শয়তানকে দেহ ছেড়ে, আপনাকে ফেলে দিয়ে বাহিরে খুঁজি এবং এই খোঁজার মধ্যে একটা সাময়িক তৃপ্তি পাওয়া যায়। শয়তান এমনই চিকন, সূক্ষ্ম যে হাবল টেলিস্কোপেও দেখার উপায় নাই। সুতরাং যাকে দেখাই যায় না তাকে নিজের ভেতরে অবস্থান করাটার মাঝে আস্থার দুর্বলতা দেখা দেবেই। তাই আল্লাহ বলছেন, তুমি যতই চালাকি কর না কেন, কিছু ভুলে যেও না যে, আল্লাহ সবচেয়ে বড় চালাক (ডাবার্থে)। আরো একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, শয়তানের কোন জাত আর সেফাত বলে কিছু নাই। কারণ শয়তান সর্বভূতে বিরাজ করে না, বরং মানুষের অন্তরে বাস করে। তাই মানুষের মাঝে কত রকম ডিজাইনের প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, ধাপ্লাবাজি, বাটপাড়ি, কথার সাগর আলী নাগর আলী, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী নীরেন লাহিড়ী মার্কা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছে, অথচ শয়তান যে ভাষণদাতার অন্তরে বহাল তব্বিয়তে বসে আছে সেটা জনতা প্রথমে টের পায় না। ছেঁড়া পাঞ্জাবী পরে, গরীবের বন্ধু সেজে, গরীবের কথা বলে যাচ্ছে, কিছু কিছুদিন পর দেখা যায়, হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক শিল্পপতি হয়ে মুচকি হাসি দিচ্ছেন। জনতা তখন বুঝতে পারবে, এটা তো শিয়াল, কেবলমাত্র ধোপার নীল-মেশানো জলের গামলায় পড়ে শরীরের রঙটুকু বদলিয়েছিল। বেহাগ সুরের সঙ্গে যেমন অন্য সুর মিশিয়ে ককটেল মার্কা মেরুবেহাগ সুর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়, এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মিশিয়ে ককটেল মার্কা রঙ বানানো হয় সে রকম মানুষের অন্তরে যতদিন শয়তান থাকবে ততদিন ককটেল মার্কা প্রতারণার রূপটি সরল-সহজ মানুষগুলো দেখে যাবে। কারণ এটাই একটি চিরন্তন খেলা। এই

খেলার অভ্যন্তরেই স্রষ্টার স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতির প্রশ্ন ও উত্তর ঘুমিয়ে থাকে। এই প্রশ্নের অভ্যন্তরেই তকদিরের খেলা কখনো আসল কখনো ডেলকীবাজি মনে হয়। সাধক সিদ্ধি লাভ করার পর এই সব রঙ-চঙ দেখে চুপ করে থাকেন। কারণ চরম পর্যায়ে যে গালি নাই, ভুল নাই, ভুল খুঁজতে গেলে আপন চোখের বিস্ময় আপনার কাছেই ফেরত আসে। তাই খাজা গরীবে নেওয়াজ বলেছেন, ‘আরাম উস দিলকো মিলে, জিস দিলকো কাভি আরাম নাহি মিলে।’ অর্থাৎ ‘সেই মানুষটি সবচেয়ে বেশি আরামে আছে, যে মানুষটি জীবনেও আরাম পায়নি’। কেউ কথাটি মেনে নেবে, কেউ অস্বীকার করবে। কেউ আত্মবিরোধ খুঁজবে, কেউ খুঁজবে না। মেনে নেওয়া এবং অস্বীকার করা দুটোই তকদির।

রূপক শয়তান, মেজাজি শয়তান, শরিয়তি শয়তান যেমন একটি স্থানেই থাকে তিনটি চেহারা নিয়ে, তেমনি আসল শয়তান, হাকিকি শয়তান চারটি মাত্র দুইটি স্থানে অবস্থান করে। এবং দুইটি স্থানে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই শয়তান যে দুইটি স্থানে থাকে সেখানে তৌহিদ থাকতে পারে না। এবং থাকার আইন বা বিধান রাখা হয়নি। মুখে মুখে শয়তান হতে মুক্তি পাবার যত বারই আশ্রয় চাওয়া হউক না কেন, শয়তান ছেড়ে চলে যায় না। এটা বাস্তব সত্য। রূপক সত্য নয়। রূপকে সত্যটি ধরে নিতে হয়, উহা আসল সত্য নয়। আমি ধরে নিলাম আমার পকেটে এক লক্ষ টাকা আছে এবং বার বার বলতে লাগলাম যে, এক লক্ষ টাকা আছে, কিন্তু আসলে পকেটে এক লক্ষ টাকা নাই। ধরে নিলেই কি আসলে এক লক্ষ টাকা আছে? না, নাই। সুতরাং ধরে নেওয়া এবং বাস্তবে থাকাটা এক বিষয় নয়। তবে ধরে নেবার মানসিক অবস্থায় শান্তি পাওয়া যায়। কিছুটা

সাময়িক তৃপ্তি পাওয়া যায়। এবং এটারই নাম রূপক। এটারই নাম মেজাজি। মীর জাফরের কোরানে হাত রেখে বেঈমানি না করার ওয়াদাটি ছিল দৃশ্যমান, রূপক তথা মেজাজি। তাই সিরাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। হাকিকি স্পর্শ তথা আসল স্পর্শে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নই উঠে না। এবং আসল স্পর্শ দৃশ্যমান নয়। তাই কোরানকে পবিত্র না হয়ে কেউ স্পর্শ করতে পারে না। কথাটি আল্লাহপাক কোরানে জানিয়ে দিয়েছেন। আসল স্পর্শ দেখানো যায় না। কারণ, হৃদয়ঘটিত বিষয়টি গোপন এবং গোপন বিষয়টির সঙ্গে আল্লাহ আছেন বা থাকেন বলেই মুহসিনিনদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বলে সূরা আনকাবুতে ঘোষণা করা হয়েছে।

গবেষণার মাধ্যমে আসল নকলের ধারণা দেওয়া যায়

খারিজিদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী নাহওয়ানের যুদ্ধটি হয়েছিল, এবং এই যুদ্ধের পরই খারিজিদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়, কিন্তু সম্মূলে ধ্বংস হয়নি। আমার মনে হয় কোন মতবাদই সম্মূলে শেষ হয়ে যায় না, কিছু না কিছু ছিটেফোঁটা থেকে যায়। তবে খারিজিদের দর্শনটি এতই সাধারণ এবং মোটা (স্থূল) যে, যে কেউ এর ফাঁদে পা ফেলতে পারে। নাহওয়ানের যুদ্ধের আগে শান্তিচুক্তিতে উপনীত হবার জন্য তাঁর নিজস্ব লোক পাঠানোর আগে মণ্ডলা আলী বার বার একটি উপদেশ দিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। উপদেশটির ভাবধারাটি হল, তোমরা কোরানের আয়াত দিয়ে

কোন কিছু ভুলেও বুঝতে চেয়ে না। কারণ, কোরানের একটি আয়াতের অনেক রকম অর্থ করা যায়, তাই তোমাদের আয়াতের অর্থটি গ্রহণ না করে তারা তাদের দেওয়া অর্থটি গ্রহণ করতে বলবে। তাই তোমরা যুক্তি দিয়ে বুঝাবে। অবশেষে খারিজিরা মণ্ডলা আলীর পক্ষের কোন যুক্তিকেই গ্রহণ করে নিল না বরং ভয়ংকর যুদ্ধটি হয়ে গেল। কোরানের একটি আয়াতের যে অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যায়, এই দলিলটি আমরা মণ্ডলা আলী হতে পেলাম। (নাহজুল বালাগা)। সুতরাং এখন আমি যে দর্শনটি বলব তা অনেকেই গ্রহণ করে নেবে না, বরং পার্লটা আরেকটি দর্শন দাঁড় করাতে চাইবে, এবং এটাই স্বাভাবিক। পজিটিভ আর নেগিটিভ পাশাপাশি চলে। কিন্তু আমি যেভাবে বিষয়টি তুলে ধরি, তাতে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কেউ মেনে নেয়, কেউ মেনে নেয় না। যারা মেনে নিতে পারে না, তারাই জোর করে মানাতে চাইবে। মানাবার প্রশ্নে মনের উপর জোর চলে না। তাই বলা হয়, দ্বীনের (ধর্ম) দ্বায়ে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নাই। এভাবেই সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এভাবেই নগ্ন সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসের পাড়ায় এর অনেক দলিল পাওয়া যায়। উম্মাইয়া খলিফা মালেকের খাস চামচা, ইসলামের হিটলার, হাজ্জাজ এই রকম কুৎসিত কথা বলে কত মুসলমানকে যে হত্যা করেছে, তা ইতিহাসে লিখা আছে। আবার এই হিটলার হাজ্জাজকে সাধু বানাবার কত রকম ধানাই-পানাই করা হয়েছে, যা পড়ে অনেকেই অবাক হয়ে যান। এরকম অনেক নজির পাবেন যে, কেউ সাধুকে চোর বানাচ্ছে, আবার কেউ চোরকে সাধু বানাচ্ছে। সরল পাঠকেরা তখন গোলক-ধাঁধায় পড়ে যান এবং কোনটা সঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। আর তখনই গৌজামিলের দর্শনটি দাঁড়িয়ে যায়। এই গৌজামিলের বস্তার চাপে সত্য দর্শনটিকে

উঠিয়ে আনা বড়ই কষ্টকর। আমি এখন সেই রকম একটি নাজুক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। গ্রহণ-বর্জন পাঠকের নিজস্ব রুচি। এখানে বলপ্রয়োগ অবান্তর।

আমরা যে আড়াই ইঞ্চি চৌট দিয়ে আল্লাহ শব্দটি উচ্চারণ করি, সেই আল্লাহর বিশালত্ব কত বড়? সেই আল্লাহ থাকেন কোথায়? সেই আল্লাহর রূপ কয়টি? কী কী রূপধারণ করে কী কী অবস্থায় অবস্থান করেছেন? আল্লাহ এক তথা ওয়াহেদ, আবার আল্লাহ একক তথা আহাদ। যেমন বলা হচ্ছে, ‘পূর্ব এবং পশ্চিমের যে দিকেই তুমি তাকাও না কেন, আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই’। প্রশ্ন আসতে পারে, সব কিছুই তো দেখছি, কিন্তু তোমাকে তো দেখছি না। উত্তরটি এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, বান্দা এরকম প্রশ্নটি করবে। তাই আল্লাহ বলছেন যে, আমি ছাড়া যে কিছুই নাই এটা বুঝতে হলে তোমাকে উকিল ধরতেই হবে। এই উকিল বলতে কী বুঝানো হয়েছে? এই উকিল পাব কোথায়? হাকিমের কাছে যেতে হলে যেমন উকিলের প্রয়োজন হয়, সেরকম আল্লাহর পরিচয় জানতে হলেও দেখতে পাই, আল্লাহ উকিল ধরতে বলছেন। সেই উকিলের পরিচয়টি আমরা সূরা কাহাফে পাই। হযরত মুসার মত জাঁদরেল নবীও খিজিরের (আবদুহ) জ্ঞান অর্জন করা তো দূরে থাক বরং ধৈর্যধারণ করার মত সামান্য চুক্তিটিও তিন তিন বার ভঙ্গ করে ফেললেন। তাহলে হযরত মুসা আর খিজিরের পরিষ্কার পার্থক্যটি বুঝা যায়। খিজির আল্লাহর উকিল। এই উকিলের সাথে থাকতে হলে বিরাট বিশাল ধৈর্যধারণ করতেই হবে। যুক্তি-তর্ক ও দর্শনের বস্তুটি নদীতে ফেলে দিয়ে অন্ধের মত বিনা বাক্যে অনুসরণ করতে হবে। কারণ আল্লাহর উকিল খিজিরের কাণ্ডকারখানা দেখে ধৈর্যধারণ করাটা খুবই কষ্টকর

ব্যাপার। আল্লাহর উকিল খিজিরের কর্মকাণ্ড দেখে উল্টা-পাল্টা মনে হবে। মনে হবে এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম। এরকম উল্টা-পাল্টা কর্ম করে যাবে আর চুপ করে থাকতে হবে এটা অসম্ভব। লাগবে না এমন উকিলের সাথী হওয়া। এর চেয়ে উকিল ছাড়াই আল্লাহকে ডাকব। উকিল ছাড়া আল্লাহকে ডাকলেও দোষ নাই, কিন্তু পূর্ব এবং পশ্চিমে এক আল্লাহ ছাড়া যে কিছুই নাই-এই জ্ঞানটি আর অর্জন করতে পারবেন না।

হযরত বাকীবিল্লাহ সপ্তাহের একটি দিনে পড়া-পানি দিতেন। বাকীবিল্লাহর কোমরে একটি বেদনা লেগেই থাকত, তাই প্রধান খাদেম কোমরে তেল মালিশ করে দিতেন। একদিন পড়া-পানি দিচ্ছেন। সঙ্গে খাদেম। হযরত বাকীবিল্লাহ একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কিসের জন্য পড়াপানি নিবে?’ সে বলল, ‘হজুর, কোমরে অনেকদিন ধরে বেদনা, তেল মালিশ করতে হয় প্রতিদিন, তাই।’ হজুর পানিতে ফুঁ দিয়ে বললেন, ‘যাও আর কোমরে তেল মালিশ করতে হবে না। রোগ ভাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আম্মাকে জানাবো।’ ছয় দিন পর আম্ম জনতাকে পড়াপানি দেবার সময় সেই লোকটি বলল, ‘হজুর, আপনার পড়াপানি খাবার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের বেদনা যে চলে গেছে, আর এই ছয় দিনের মধ্যে একবারও তেল মালিশ করতে হয়নি।’ বাকীবিল্লাহর সঙ্গেই খাদেম। খাদেম অবাক হয়ে মনের অজান্তে একটি কথাই বললেন, ‘বুঝলাম না ফকিরি কী!’ খাদেমের এরকম কথা শুনে বাবা বাকীবিল্লাহ বললেন, ‘তুমি কি ফকিরি শিখতে চাও, না দেখতে চাও?’ খাদেম দেখতে চাইলেন। বাবা বাকীবিল্লাহ মুখে নেকাব লাগিয়ে নিজের জানাজা নিজেই পড়ে গেলেন। জানাজা শেষে ঐ লোকটির পিছু নেবার কথা ছিল। তাই

খাদেম সস্বে সস্বে গেলেন এবং নির্জন স্থানে আসার পর মুখের নেকাব খুলে ফেললেন। খাদেম অবাক বিস্ময়ে একটি কথাই বলেছিলেন, ‘হজুর, এটা আমি কী দেখছি!’ হজুর বললেন, ‘ফকিরি দেখতে চেয়েছ, শিখতে চাওনি।’ হযরত বাকীবিল্লাহর প্রধান খলিফা হযরত মুজাদ্দের আল ফেসানী তাঁর মুরীদদেরকে এই বলে উপদেশ দিতেন যে, ‘পীরে তাস্ত আউয়াল মাবুদ তাস্ত’, ‘তোমার পীরই হল প্রথম মাবুদ’। (মাতলাউল উলুম কিতাবের ছিয়াশি পৃষ্ঠা)। একটু লক্ষ করলেই পরিষ্কার বুঝা যায়, এখানে কিছু আখের মাবুদ তথা শেষ মাবুদ বলা হয়নি, কারণ শেষ মাবুদ হল আল্লাহ। আপন পীরকে কতটুকু মর্যাদার আসনে স্থান দিতে হয় সেটাই বলা হয়েছে। তাই তাড়াহুড়া করে অথবা অন্যের দেখাদেখিতে মুরিদ না হওয়াই ভাল। আল্লাহর এই জাতীয় উকিলদের কথাবার্তা চাল-চলনে কিছুই বুঝবার উপায় থাকে না। কেবলই উল্টাপাল্টা মনে হয়। তাই বিরাট ধৈর্যধারণ করে চুপ করে থাকতে হয়। আরো একটি মারাত্মক কথা থেকে যায়, আর সেটা হল তকদির। তকদিরে না থাকলে শত চেষ্টা করেও পাওয়া যাবে না। তকদির বিষয়টি এখানে না বলাই ভাল, কারণ মূল বিষয় হতে ছিটকে অনেক দূরে গিয়েছি, তাই আর নয়।

সুতরাং আল্লাহ যে পূর্ব-পশ্চিমের সবখানেই আছেন এবং আর কিছুই নাই— এই আয়াতটির মর্ম বই পড়ে, ভাষণ শুনে, বুঝবার কোন উপায় নাই। কেবলমাত্র উকিল ধরলেই বিষয়টি বুঝতে পারবে। সুতরাং সেই উকিলটির মাত্র একটি গুণ থাকতে হবে, আর সেই গুণটি হল কামেলিয়াত। বাজারের সস্তা কামেল নয়। বাজারের সস্তা কামেল পীর যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। (অবশ্য যতই সাবধান

হবার উপদেশ দেই না কেন, তকদিরে না থাকলে শত চেষ্টা করেও পাবেন না।
আবার হয়ত কামেল পীর পেলেন, কিন্তু খাদেমের মত জীবন উৎসর্গ করেও পেলেন
না। সুতরাং কী বলতে কী বলব? পথ পেলেন, সেই পথে চলে কামেল পীরও
পেলেন, কিন্তু হয়ত বাকীবিল্লাহর খাদেমের মত পেলেন না এবং এটাকেই বলা
হয় তকদিরের লিখন)।

তাহলে এটা পরিষ্কার বুঝা গেল, আল্লাহ ছাড়া পূর্ব-পশ্চিমে কিছুই নাই। এখন
আমরা আল্লাহর রূপের কথা বলতে চাই। আল্লাহ জ্ঞাতরূপে তথা খাসরূপে তথা
মূলরূপে তথা আসলরূপে অবস্থান করেন মাত্র তিনটি স্থানে। সেই তিনটি স্থানের
নাম হল, লা মোকাম, জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর। এই তিনটি স্থানেই
আল্লাহ মূলরূপে তথা জ্ঞাতরূপে অবস্থান করেন। এবং কোরান হতে এই তিনটি
স্থানে জ্ঞাতরূপে থাকার দলিলটি পাই। আর বাকি সমস্ত সৃষ্টিরাজ্য। তথা আল্লাহ
যাহা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই সেফাত তথা গুণাবলি। সেফাত তথা গুণাবলির
রূপান্তর তথা বিবর্তন হতেই থাকে। সেফাত তথা গুণাবলি একটি স্থানে থেমে থাকে
না। সেফাতের প্রতিটি মুহূর্তে রূপান্তর হচ্ছে তথা বিবর্তন হয়ে চলছে। সুতরাং
বিবর্তনবাদই হল আল্লাহর সেফাতের ধর্ম। সেফাত একরূপ হতে অন্যরূপ ধারণ
করে চলছে এবং এই রূপ বদলানোটাতেই মানুষ চমকে উঠে। এবং অবাক হয়।
এবং গবেষণায় নানা বিদ্রান্তির সৃষ্টি করে। এই সেফাতের বিবর্তনের উপকারও হয়,
আবার ক্লতিও হয়। উপকার এবং ক্লতি পাশাপাশি চলে এবং আপেক্ষিক।
সেফাতের বিবর্তন সর্বজনীন, কিন্তু আপেক্ষিকতা দিয়ে ভাগ করতে বাধ্য হতে হয়।
এখানে এসেই মানুষ চমকে উঠে এবং সর্বজনীন আর আপেক্ষিকতার দ্বন্দ্ব সিদ্ধান্ত

নিতে ভুল করে ফেলে। এটাকে এক ধরনের অতীব সূক্ষ্ম দৃষ্টিবিভ্রম বলা চলে (হ্যালুসিনেশন)। ইচ্ছায় নয় বরং অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিবিভ্রম। তাই কোরান বলেছে যে, আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যে বিন্দু পরিমাণ ভুল বা ত্রুটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিবর্তনবাদ যে আল্লাহর সেফাতে অবধারিত একটি ধ্রুব সত্য, সেটা অনেকেই মেনে নিতে চায় না একমাত্র দৃষ্টিবিভ্রমের কারণে। এই দৃষ্টিবিভ্রমের বিষয়টি একে অপরের উপর চাপিয়ে দেয় অনেক রকম যুক্তিতর্ক দিয়ে।

জাত এবং সেফাত বিষয়টি গুলিয়ে ফেললে বিভিন্মতা আসতে বাধ্য। সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস সেফাত। মানবদেহটিও সেফাত। এবং মানবদেহের মাঝে যে অন্তরটি আছে উহাও সেফাত। মানবদেহের মাঝে যে নফস তথা জীবাত্মাটি আছে উহাও সেফাত। সেফাতের রূপান্তর হয়, এবং এই রূপান্তরটির ধর্মকেই বলে বিবর্তনবাদ। সুতরাং সেফাত ধ্বংস হয় না, তথা সেফাত নাই হয়ে যায় না, বরং একরূপ হতে অন্যরূপ ধারণ করে। নফস তথা জীবাত্মা ধ্বংস হয় না, তথা নাই হয়ে যায় না, বরং স্বাদ তথা মজা তথা টেস্ট গ্রহণ করে। এই স্বাদ গ্রহণটাই রূপান্তর। তাই মৃত্যুটা ধ্বংস নয়, বরং ‘স্বাদ গ্রহণ করে’ বলা হয়েছে কোরানে। সুতরাং মানুষ সেফাত। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন যে, সেফাত জিন এবং সেফাত মানুষের শাহারগের নিকটেই জাতরূপে আছি। এই জাতরূপে আল্লাহর থাকার প্রকাশ্যে ঘোষণাটি সৃষ্টিরাজ্যের আর কোথাও বলা হয়নি। একমাত্র জিন এবং মানুষের সঙ্গেই আল্লাহ থাকেন সেফাতরূপে নয় বরং জাতরূপে। দুধ নাড়াচাড়া করলে যেমন সাদা চোখে মাখন দেখা যায় না, তেমনি একটি মানুষের মাঝে যে আল্লাহ জাতরূপে অবস্থান করছেন সেটা সাদা চোখে দেখা যায় না। তাই কোরান বলে

যে, অনেকেই চোখ থাকতে অন্ধ। দুধের মাঝে যে মাখন লুকিয়ে আছে, এটা অনেকেই চোখ থাকতেও বুঝতে পারে না। সেরকম মানুষের জীবাত্মার সঙ্গে (অন্য কোন জীবের সঙ্গে জাতরূপে আল্লাহ থাকেন না) আল্লাহ যে জাতরূপে থাকেন, সেটা বুঝতে পারে না। দুধ হতে মাখন বাহির করে আনতে হলে বিবর্তনের প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে হয়, সেরকম মানুষের মাঝে যে আল্লাহ জাতরূপে অবস্থান করছেন তাতে ধ্যানসাধনার প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে যারা পারেন, তারাই আল্লাহর ওলিরূপে গণ্য হয়। দুধ হতে মাখন বাহির করার কৌশল যিনি জানেন তার কাছে মাখন বাহির করার কৌশল জেনে নিতে হয়। সেরকম যিনি আল্লাহর ওলি, তার কাছ থেকে আল্লাহর ওলি হবার কৌশল জেনে নিতে হয়। এজন্যই ওলিরা বলেন যে, যার পীর নাই প্রবৃতি তথা শয়তান তার পীর। আল্লাহর ওলি হবার বসরে হাফী তাই বলেছেন যে, আল্লাহ মানা যেমন সহজ, পীর মানা তেমন কঠিন। আল্লাহ কখনোই একজন ধূমপানকারীকে ধূমপান ছেড়ে দেবার কথা বলবেন না। কিন্তু আপন পীর যখন ধূমপান ছেড়ে দেবার কথাটি বলবেন, তখন পীরের হুকুমটি বিশ্বের মত মনে হবে। অব্যাহত নফস তখন পীর মানতে চাইবে না। কারণ লাংস তথা ফেফড়া পঁচে গেলেও আল্লাহ ধূমপান ছেড়ে দেবার কথাটি বলবেন না। তাই যিশুখৃষ্ট বলেছেন, যারা যিশুকে না মেনে আল্লাহকে মানি বলে, তারা মিথ্যুক (প্রবৃতির পূজারক তথা শয়তানের পূজারক)। মহানবী বলেছেন, দুইটি জিনিস শত্রু করে ধরে রাখ, তাহলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কেতাব এবং অপরটি আমার বংশধর। রক্তমাংসের তৈরী বংশ নয়, বরং নূরের অধিকারীরাই হল বংশ। যারা আপন সত্তার মাঝে আল্লাহকে জাগ্রত করতে পেরেছেন তারাই নবীর বংশধর, এবং তাদেরকেই আল্লাহর ওলি বলা হয়। শিয়া

ফেরকার অনুসারীরা নবীর বংশ বলতে আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসায়ন, চৌদ্দ মাসুম, বারো ইমাম আর শাহাদানে কারবালাকেই বুঝে। এর বাইরে নবীবংশ বলে মানে না। তাই শিয়ারা মাজার এত বেশি মানে যে সুন্নিরা চমকে উঠে। কারণ শিয়ারা যা কিছু ফরিয়াদ করে তা নবীবংশের কাছেই করে। আবার তার ঠিক বিপরীত হল খারিজি আর ওহাবিরা। তাদের তো নবীর বংশ মানার প্রশ্নই উঠে না, কারণ তাদের হাতেই নবীবংশ লাঞ্চিত এবং অপমানিত হয়েছে। তাই তারা নবীবংশের নাম-গন্ধটি পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। আবার এর সঙ্গে আল্লাহর ওলিদের তো আরো সহ্য করতে পারে না। তাই তারা কেবল একমাত্র আল্লাহকেই মানে। খারিজিরা এবং ওহাবিরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও মানে না এবং তাদের বইপত্রে এবং লিখনিতে একমাত্র আল্লাহকে মানার আশ্রয় জানানো হয়ে থাকে। খারিজি এবং ওহাবিদের কথাগুলো কতই না সুন্দর, কতই না চমৎকার, কতই না আকর্ষণীয় এবং এদের লোভনীয় মিষ্টি ফাঁদে পড়ে যায় সহজ সরল সুন্নিরা। খারিজি আর ওহাবিরা কী সুন্দর বলে যে, খাজা বাবার কাছে চাও কেন? আল্লাহর কাছে চাও। এই মিষ্টি ধোঁকায় বড় বড় শিক্ষিত পণ্ডিতেরা পর্যন্ত পড়ে যায়। এই কিছুদিন আগে আজাদ কাশ্মিরে ভূমিকম্পে লঙ্কের উপর মুসলমান মারা গেল, আর লঙ্ক মুসলমান কেন বিদেশিদের কাছে তাঁবু, কঙ্কল, আর খাদ্যশস্য চাইল? তারা কেন আল্লাহর কাছে তাঁবু, কঙ্কল আর খাদ্য চাইল না? কারণ তারা জানে যে, আল্লাহ উসিলা ছাড়া কোন কিছু দান করেন না। বিধর্মীর কাছে চাওয়া হালাল, আর যিনি ওলিদের ওলি, যিনি আটশত বছর আগে অখণ্ড ভারতে অবস্থানকারী চার কোটি মানুষের মধ্য হতে বিরানব্বই লক্ষ মুসলমান বানিয়ে গেছেন, তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হারাম। যেখানে আল্লাহ বলেন

যে, বান্ধা নফল এবাদত করতে করতে আমার এত কাছে আসে যে, তার জিস্মা আমার হয়ে যায় এবং তার কথা আমারই কথা ইত্যাদি। আসলে যত দলিলই দেওয়া হউক না কেন, যে মানবার নয় তাকে শত দলিল দিয়েও মানানো যায় না। এটাই নিয়তির লিখন। এটাই তকদির।

আল্লাহর প্রধানত দুইটি রূপ। একটি জাত তথা মূল তথা আসল তথা আদি। অপরটি হল সেফাত তথা গুণাবলি। জাত এবং সেফাতের স্পর্শ ধারণা না থাকলে ধর্ম বিষয়ের অনেকখানি অংশ বুঝতে কষ্ট হয়। এবং পাঠক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে ফেলে। অনু কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, আল্লাহ তার সমগ্র সৃষ্টিজগতের মাঝে মাত্র তিনটি স্থানে জাতরূপে অবস্থান করেন। সেই তিনটি স্থানের নাম হল, লা মোকাম্ম তথা লাহুত মোকাম্ম এবং অপর দুইটি স্থানের নাম হল জিন জাতির অন্তর এবং মানুষ জাতির অন্তর। এই তিনটি স্থান ছাড়া আল্লাহকে জাতরূপে পাওয়া যায় না। তাই মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়ে থাকে। যেহেতু জিন বিষয়টি মানুষের ধারণায় স্পর্শ নয়, তাই জিন জাতিকে ইচ্ছে করেই বাদ দিয়ে আমরা বলি যে, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহ যে লা মোকাম্মে জাতরূপে বিরাজমান, সেই কথ্যটি কোরানের সূরা নজমের নয় নম্বর আয়াতেই পাই। মহানবীকে নিয়ে জিবরীল ফেরেশতা যখন মেরাজে গমন করলেন, তখন জিবরীল একটি স্থানে এসে থেমে গেলেন, তথা দাঁড়িয়ে গেলেন। সেই দাঁড়িয়ে যাওয়া স্থানটির নাম হল সিদ্দরাতুল মুনতাহা, তথা সৃষ্টির শেষ সীমানা। জিবরীল বললেন যে, তাকে আর এক পা এগিয়ে যাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কেন? জিবরীল সৃষ্টি, তাই সৃষ্টি কি করে সৃষ্টির ঘরে তথা আল্লাহর লা মোকাম্মে প্রবেশ করে? সৃষ্টির কোন অধিকার নাই যে, লা মোকাম্মে প্রবেশ করে। যেহেতু জিবরীল সৃষ্টি তাই সৃষ্টির ঘরে তথা লা মোকাম্মে প্রবেশ করার প্রশ্নই উঠে না। জিবরীল কি নুরের তৈরি নয়? হ্যাঁ জিবরীল নুরের তৈরি, তবে একটি বিরাট কিন্তু আছে। সেই কিন্তুটির অর্থ হল, জিবরীল সেফাতি নুরের তৈরি, তথা গুণাবলীর নুর দিয়ে তৈরি, তথা এক কথায় জিবরীল জাতি নুরের তৈরি নন। যিনি বা যারা জাতি নুরের অধিকারী, কেবল তারাই লা মোকাম্মে যেতে পারবেন। যদিও জিবরীলের আর এক নাম রুহুল আমীন, কিন্তু জিবরীলকে রুহ দেওয়া হয়নি। কানা ছেলের নাম যেমন পদ্মলোচন, অসিলে চোখ নাই, তেমনি জিবরীলকে রুহুল আমীন বলে ডাকলেও রুহ দেওয়া হয়নি। অনেক গবেষক জিবরীলের মধ্যেও রুহ ফৎকার করা হয়েছে বলে বিরাট ভুল করেন এবং এক ও অখণ্ড রুহকে কয়টি ভাগ করে ফেলেন। এমন কি এক ও অখণ্ড রুহকে হায়ওয়ানী রুহ তথা জানোয়ারের রুহ বলেন কয়টি ভাগের মধ্যে একটিকে। আবার অনেকে

এক ও অখণ্ড রূহকে বুঝতে না পেরে নুরানি মাখলুক বলে ফেলেন। অজ্ঞতা এবং প্রচুর গবেষণা না করা হতেই এসব আজগুবি কথা আসে এবং সরল সহজ পাঠকদেরকে এসব অখাদ্য কথা বাধ্য হয়ে গিলতে হয়।

সমগ্র কোরানে রূহ বিষয়টি মাত্র সত্তরবার উল্লেখ করা হয়েছে। জিন আর মানুষ ছাড়া আর কাহাকেও রূহ দেওয়া হয়নি। সৃষ্টিরাজ্য তো অনেক দূরের কথা, এমন কি পবিত্র ফেরেশতাদেরকে পর্যন্ত রূহ দেওয়া হয়নি। তাই ফেরেশতারা বলেছিলেন যে, আদমকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে উহার ধারে কাছেও যাবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আদমকে আল্লাহ রূহ ফৎকার করে দিয়েছেন বলেই তো ফেরেশতাদের সেজদা দিতে বলেছিলেন। সুতরাং ফেরেশতারা যতই পবিত্র হউক না কেন, অথবা মহাপবিত্রই হউক না কেন, কিন্তু আল্লাহর রূহ ফৎকার করা হয়নি। সুতরাং মানুষ ফেরেশতা হতে শ্রেষ্ঠ। তাই ফেরেশতা রসূল হতে পারেন, কিন্তু নবী হতে পারেন না। মানুষ হতেই নবী হন। কোরানের একটি স্থানেও ফেরেশতাকে নবী বলা হয়নি। এখানেই গবেষকেরা ফেরেশতা এবং মানুষের মাঝে পার্থক্যটি ধরতে পারবেন। অবশ্য অনেক গবেষক এই আদি সাধারণ ফর্মলাটিতে ভুল করে ফেলেন। সাধারণ ফর্মলাই জানা নাই অথচ বিরাট ইসলাম গবেষক। ভুলটি ধরিয়ে দিতে গেলে প্রথমে ফণা তুলে ছোবল মারতে চায়। পরে যখন ভুলটি পরিষ্কার করে বঝিয়ে দেওয়া হয় এবং ভুলটি বুঝতে পারেন তখন লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রাখেন। এক গবেষক তো রসূলকে বড় করতে গিয়ে বিরাট এক বই লিখে ফেলোছিলেন। চট্টগ্রাম পোর্টের অফিসারেরা আমাকে ওয়াজের দাওয়াত করেছিলেন। সেই ওয়াজে নবী এবং রসূলদের পার্থক্যটি যখন তুলে ধরাছি তখন সেই ভদ্র গবেষক আমাকে বারবার প্রশ্ন করেছেন। যখন প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন এবং নিজের এতদিনের লালিত ভুলটি পরিষ্কার একটি ভাষা ভুল বলে বুঝতে পারলেন, তখন পা জড়িয়ে শিশুর মত কাঁদলেন আর বললেন যে, এতকাল যা শিখলাম সবই ভুল।

জিবরীল সিদ্দরাতুল মুনতাহাতে দাঁড়িয়ে মহানবীকে লা মোকাম্মে যাবার অনুরোধ করলেন। মহানবী দুই ধনুকের ব্যবধানে অথবা আরো নিকটে গেলে আল্লাহর সঙ্গে মিলন হল। কোরান ধনুক বলল কেন? আবার একটি ধনুকের কথা বলা হল না। বলা হল, দুই ধনুকের ব্যবধানে অথবা আরো নিকটে। দুই ধনুক বলতে কী বুঝায়? একটি ধনুক একটি অর্ধবৃত্ত। দুইটি ধনুক দুইটি অর্ধবৃত্ত। অর্ধবৃত্তকে ইংরেজি ভাষায় একটি সেমিসার্কেল বলে। দুইটি অর্ধবৃত্ত তথা টু সেমিসার্কেল সমান সমান একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্ত। যদি বৃত্ত হতে কম হয় তো 'আওয়াদনা' তথা বৃত্ত বানিয়ে নাও। সুতরাং বৃত্তের আলোকিত অংশটির নাম নুরে

মোহাম্মদ এবং অন্ধকার অংশটি নাম হ'ল আল্লাহ। তাই বিশ্ববিখ্যাত ওলিরা বলেন 'দোনোহিকা শাকাল এক হ্যায় কিসকো খোদা কাহ।' উভয়ের চেহারা তো একই, কাকে খোদা বলব? সূরা নেসা-র পঞ্চাশ একান্ন আয়াতটির হুবহু অনুবাদটি পড়ুন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর যদি মনগড়া গৌজামিল দেওয়া অনুবাদ পড়েন তো বলার কিছু নাই। এজন্যই বাউল সম্রাট লালন ফকির বলেন, যিনি রসুল তিনিই তো খোদা, এটা কোরানের কথা। লালন ফকিরের মনগড়া কথা নয়।

আর একটু লক্ষ করুন, জিবরীলের কথার মাঝে খিসিস আছে এবং এন্টিখিসিসও আছে, কিন্তু সিনথেসিসটি নাই। সিনথেসিসটি নাই বলেই অনেক গবেষক ভুল করে ফেলেন। অবশ্য এই ভুলটিও গবেষকের তকদিরের লিখন ছিল বলেই এতদূর এগিয়ে যাবার তকদির দেওয়া হয়নি। জিবরীল বলছেন যে, ইয়া মহানবী, আমি সেফাতি নুরের তৈরি, তাই লা মোকাম্মে এক পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে যাব। কারণ সৃষ্টিরাজ্যের এটাই শেষ সীমানা তথা সিদরাতুল মুনতাহা। লা মোকাম্মে কেবল তিনিই যেতে পারেন যিনি আল্লাহর জাত নুরে নুরময়। মহানবী যে আল্লাহর জাত নুরে নুরময় সেই কথাটি পরিষ্কার হয়ে গেল এবং মহানবী লা মোকাম্মে দুই ধনুকের ব্যবধানে অথবা আরো নিকটে গেলে মিলন হ'ল। তাই তো আল্লাহর ওলিরা বলে থাকেন যে, উভয়ের রূপটি তো একই। তাহলে কাকে খোদা বলব? মহানবী কি একটি নুরময় দেহের মাঝেই সীমাবদ্ধ? সীমাবদ্ধতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না মহানবীকে। তাই মহানবী বলেছেন যে, শক্ত করে দুইটি বিষয় ধরে রাখ। একটি আল্লাহর কেতাব এবং অপরটি নবীর বংশধর। নবীর বংশধর বলতে এখানে মহানবীর নুরের অধিকার রহমতরূপে যারা

অর্জন করতে পেরেছেন তাদের কথাই বলা হয়েছে। যারা এই নুরের অধিকার অর্জন করতে পেরেছেন তারাই আল্লাহর ওলি। তাঁরাই পীরে কাম্মেল। আনুষ্ঠানিক চাকচিক্য আর বাহিরের কতগুলো অনুষ্ঠানের সৈনিক ধর্ম পালন করলেই আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না। বরং যারা মহানবীর নুরের অধিকারটি রহমতরূপে পেয়েছেন, তারাই হলেন নবীর বংশধর। মহানবীর এই নুরের বংশধরটিকে কেমন করে আশীর মুয়াবীয়া, মারওয়ান, এজিদ আর মালিকেরা মেনে নিতে পারে? যারা আওলাদে রসুলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অস্বধারণ করেছিল দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব আর দুনিয়ার ক্রমতা অর্জনের লোভে, তারা কেমন করে মহানবীর বংশধরকে শক্ত করে ধরে রাখার উপদেশটি গ্রহণ করে নিতে পারে? তাই তারা নবীর বংশধরদের কথাটি বাদ দিয়ে নবীর সুন্নতের কথাটি গ্রহণ করতে পারে এবং তাই করেছেন এবং এদের চেলা-চামুড়ারাই নবীর সুন্নতটির উপর যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করে, ততটুকু মহানবীর বংশধরদের ধরে রাখার কথাটি একটিবার ভুলেও উচ্চারণ করে না। মগলার অভিষেক গাদিরে খুন্সে লক্কের উপর মহানবীর সাহাবাদের সামনে মহানবীর উপদেশটির দুইটি অংশের একটিকে মেনে নিল, আর সেটা হল আল্লাহর কেতাব, কিন্তু নবীবংশটিকে ধরে রাখার আদেশটি উম্মাইয়া-আব্বাসীয়রা হাদিস হতে মুছে ফেলতে পারেনি, এবং চিরতরে মুছে ফেলতে গেলে তাদের চিকন প্রতারণা ধরা পড়ে যাবে, কারণ লক্কের উপর সাহাবাদের সাক্ষ্যটিকে কেমন করে উপেক্ষা করে? ধূর্ত শিয়ালের চেয়েও এরা মহাধূর্ত বলেই হাদিসের কেতাব এবং নবীবংশের কথাটি ঠিকই আছে, কিন্তু তাদের চালচলন, কথাবার্তা, লিখনি এবং প্রচারে কখনোই নবীবংশটি ধরে রাখার মহানবীর উপদেশটি পাওয়া যায় না, এবং যাবেও না। কারণ

উম্মাইয়া আর আব্বাসীয়রা চেয়েছিল দুনিয়ার ঋণস্থায়ী ঋমত। আজও এই একবিংশ শতাব্দিতে খারিজি আর ওহাবিদের মুখে কেবলমাত্র নবীর সুন্নতটির কথা শুনতে পাই, কিন্তু নবীবংশটিকে শক্ত করে ধরে রাখার কথাটি তাদের বইগুলোর একটি পৃষ্ঠাতে ভুলেও পাই না। আওলাদে রসুল ইমাম হসাইনের গলা কাটার আগে তাই ইবনে জিয়াদের কণ্ঠে শুনতে পাই, তাড়াতাড়ি গলা কাট, কারণ নামাজের সময় চলে যাচ্ছে। হায়রে খোদা! এজিদ আর ইবনে জিয়াদের অনুসারীরা সেইদিন নামাজ পড়া যে কত মূল্যবান কাজ সেটা মুসলিম জাতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। ইমাম হসাইনের গলা কাটার চেয়ে নামাজ পড়া অনেক বেশি মূল্যবান সেই কথাটি জগতবাসীকে মনে করিয়ে দিল। জগতবাসী এই চিকন প্রতারণাটি ধরতে পারছে, এবং একদিন গবেষণার মাধ্যমে ধরা পড়বেই। কারণ সত্য যে সর্বলোকে ধরা পড়বেই, এবং এটাই যে প্রকৃতির নিয়ম, এটাই যে ইতিহাস বিশ্লেষণের শেষ কথা, এটাই যে বিবর্তনবাদের শেষ উপসংহার। তাই সমগ্র পবিত্র কোরানের একটি সূরাতে, একটি আয়াতে, এমনকি একটি শব্দ চয়নেও পাওয়া যায় না যে, আল্লাহ নামাজিদের সাথে থাকেন, তথা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মুসল্লিন। কারণ কারবালায় ইমাম হসেনের তাঁবুতে আজান আবার এজিদের তাঁবুতেও আজান, এজিদের তাঁবুতেও এজিদের চেলাচামুগারা এবং বিকাহুয়া আলেমেরা (এজিদের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া আলেম-ওলামারা) নামাজ পড়ছে, রুকু সেজদা দিচ্ছে, আবার আওলাদে রসুল ইমাম হসাইনের তাঁবুতেও নবীর বংশধর এবং মক্কা-মদিনার জলিলকদরের সাহাবারাও নামাজ পড়ছে। যদি আল্লাহ কোরানে বলতেন যে, আমি আল্লাহ নিশ্চয়ই নামাজিদের সঙ্গে আছি, তাহলে এজিদের চেলাচামুগারা এবং বিকাহুয়া আলেম-ওলামাদের সঙ্গেও

যে থাকার কথাটি এসে যায়। তাই হয়তো আল্লাহ বলেন, তোমরা যত রকম চালাকিই কর না কেন, জেনে রাখ, আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় চালাক।

সুফিবাদের মূল কথা

আম্মার নিজের কিছুদিনের বয়সের অভিজ্ঞতা থেকে মাত্র একটি কথাই বলতে চাই। বলতে চাই সেই অভিজ্ঞতাটি অর্জন করতে একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীর প্রায় প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা সঙ্গীত সাধনা করে যে অভিজ্ঞতার ফলটি লাভ করেছে, সেরকম আম্মাকেও বই পড়ার মধ্যে ভুবে থেকে অর্জন করতে হয়েছে। সেই অর্জিত অভিজ্ঞতাটাই আম্মার কাছে সবচাইতে শক্ত বলে মনে হয়েছে। কী সেই অর্জিত কঠিন অভিজ্ঞতার নাম? ‘নিরপেক্ষতা’ তার নাম। এই পৃথিবী নামক গ্রহে কতজন নিরপেক্ষ মানুষের জন্ম হয়েছে তা আম্মার জানা নেই। তবে সেই সংখ্যাটি অনায়াসে হাতে কলমেই করা যাবে বলে মনে করি। তেলসম্মাতি ক্যালকুলেটর আর জটিল হিসাবের আজব কম্পিউটার নামক বাস্তবের প্রয়োজন হবে না। নিরপেক্ষ যারা, তারা অসাধারণ। এই অসাধারণ শব্দটি কিন্তু কেবল বিদ্যার ছকে ফেলতে গেলেই ভুল করা হবে। কারণ পৃথিবীতে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি আজ পর্যন্ত পয়দা হননি যিনি নিরপেক্ষ। হাঁ, যদি অহঙ্কার করছি বলেন, তবু আমি এই মতবাদ হতে এক চুলও খসে যেতে রাজি হব না। তাহলে সেই নিরপেক্ষ অসাধারণেরা কারা? তাদের নাম কী? এক কথায় তারা হলেন কাম্বল পুরুষ।

যাদেরকে অনেক নামে ডাকা যায়। যেমন, অলী, দরবেশ, পীর, ফকির, সম্যক গুরু, মুনি, ঋষি ইত্যাদি নামে। কারণ ঐরা আল্লাহপাকের বন্ধু। আল্লাহপাকের প্রেমে তাঁদের রিপূর বাতিগুলোকে তাঁর ইচ্ছার কাছে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিজের বলে কিছুই রাখেননি। রিপূর বাতিগুলো যখন আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে এক পা-ও এগিয়ে যায় না, সেই রিপূরগুলোকেই বলা হয় নিভে গেছে। নিভে যাওয়া রিপূর বাতিগুলোকে বাংলা ভাষায় বলা হয় নির্বান। আরবি ভাষায় বলা হয় ফানাফিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহতে ফানা হয়ে গেছে, তথা আল্লাহতে নিভে গেছে।

আল্লাহই একমাত্র নিরপেক্ষ। তাই আল্লাহর আর এক নাম আদিল। আদিল অর্থ অতীব সুক্ষ্ম বিচারক। তাঁর কাছে সবাই সমান। কারণ সকল মানুষের মধ্যেই তিনি রূহ তথা আত্মারূপে আছেন। নফস তথা প্রাণরূপে তিনি নেই। যদিও মনের অজান্তে আমরা নফস এবং রূহকে তথা প্রাণ ও আত্মাকে এক করে ফেলি। সকলের সাথে তিনি আছেন তাই তিনি নিরপেক্ষ। কেউ গাছতলায় আর কেউ পাঁচ তলায় আছেন কেন বলে আল্লাহকে প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ এই মারাত্মক বৈষম্য তৈরি করে মানুষ, অথচ অনেকেই দোষটা আল্লাহর উপর চাপিয়ে দিতে ভালবাসে। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের মত অনেক পণ্ডিতই দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সেজেগুজে বসে আছেন, অনেকটা তুলসী পাতা ধোয়া জলের মত। মানুষের চামড়ায় কৃত্রিম পালিশমারা মায়ার শরীরটার ভেতর যে হিংস্র পশুগুলো বাস করছে, এটা ধরতে কষ্ট হয়। কী সুন্দর শরীর আর কী বাক্স চেহারাখানা! যেন সাক্ষাৎ দেবতার মত। অথচ সেই মানুষটির মধ্যে যে একটা জঘন্য জানোয়ার ঘুমিয়ে আছে সেটা বুঝিয়ে না দিলে প্রথম দর্শনে কেউ বুঝতে পারবে না। যেমন ধরুন হিটলারের কথা। ছবিটার দিকে লক্ষ করুন, কী সুপুরুষ কী সুন্দর চেহারা!

যদি তার কুকামের ইতিহাস কেউ না জানে তাহলে কী ভাববেন? ধরুন, আপনি তার উপরটা দেখে খুব ভাল মানুষটি ভাবছেন আর এমন সময় কেউ যদি আপনাকে ধমক দিয়ে বলে যে, না, কখনোই একে ভাল মানুষটি বলা না, সে মোটেই ভালো নয়। আপনি যদি পার্টা প্রশ্ন করেন, কেন? উত্তরটি যদি এ রকম হয় যে, আমি যা জানি, তুমি তা জানো না, বুঝ না, কারণ সে আস্ত একটা হিংস্র জানোয়ার। যদিও তুমি তাকে ভালো মানুষরূপে দেখতে পাচ্ছ, আসলে সে তা নয়। আপনি তখন ধাঁধায় পড়ে যাবেন। মনে মনে ভাববেন, লোকটা বলে কী! পাগল-ছাগল নয় তো?

খুবই সহজ আর একটি বিষয় নিয়ে কিছু বলতে চাই। আপনার চোখের সামনে এক পাতিল দই রেখে যদি বলি, যদিও এটা দই কিন্তু আসলে এটা হল অনেক পোকাকার একটি ভাগাড়। অনেক ছোট ছোট পোকা এই পাতিলে কিলবিল করছে। এতই ছোট ছোট পোকা যে, চোখে দেখলে বুঝতেই পারবে না যে এটা দইয়ের পাতিল নয় বরং অগণিত পোকাকার ভাগাড়। তুমি কি বিশ্বাস করতে চাইবে? যদিও বারবার বলছি। বার বার অনুরোধ করছি। না, তুমি বিশ্বাস করবে না এবং এক মুহূর্তের তরে চিন্তাও করতে চাইবে না। অথচ যদি তোমার চোখে মাইক্রোস্কোপ বসিয়ে দিয়ে দইয়ের পাতিলটা দেখতে দেওয়া হয় তাহলে? তাহলে দইয়ের পাতিলে পোকাকার কিলবিল দেখে তোমার চোখ দুইটি বিস্ময়ে কেবল ছানাবড়াই হবে না, বরং বমি করার সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে। হয়তো জীবনের তরে দই খাওয়া ছেড়েও দিতে পার। অথচ চোখে দেখতে পাও না বলে আমার কথা বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, বরং মাথা খারাপ হয়েছে বলে গালি দিতে পার। সুতরাং যা

তুমি চোখে দেখছ উহা আসলে যে কী তা তুমি জান না। উহা তুমি বুঝতে পারছ না। কিন্তু আমি তা জানি এবং বুঝি। কারণ আগেই আমি মাইক্রোস্কোপের মধ্য দিয়ে দেখে নিয়েছি। তাই আমি যদি তোমাকে বলি যে, কখনোই বলো না যে এটা দইয়ের পাতিল। না-না, এটা দইয়ের পাতিল নয়, বরং কিলবিল করা লক্ক লক্ক পোকাকার একটা ভাগাড়। যদিও তুমি তা জান না এবং বুঝ না। এরকমভাবে আমরা যে সব বিষয় জানতে পারি না, বা বুঝতে পারি না, অথবা ধারণাও করতে পারি না, সে সব বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বিশ্বাস করতে বললে বড় কষ্ট হয়, বড় সন্দেহ হয়, মন সবটুকু শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ করে। কিন্তু যখনই সব সন্দেহের অবসান হয়, তখন মনে নিতে বার বার বাধ্য করছে বিজ্ঞান। একদম অবিশ্বাস্য, মগজেই ঢুকতে চায় না, তবু বিজ্ঞানের জোরে একান্ত মনের অনিচ্ছায় মনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। এরকমভাবে এক বোঝা নমুনা তুলে ধরা যায়, কিন্তু তাতে বইয়ের আকার বড় হতে থাকবে।

আর একটা নমুনা তুলে ধরেই আমি আমার আসল কথা বলতে চাই। যেমন ধরুন, যার রেডিওর বিষয়ে একদম জানা নেই, তাকে যদি হাজারবার বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, এই বাতাসের মধ্যে মানুষের অনেক রকম কথা, অনেক রকম গান ভাসছে, সেই ব্যক্তিটিকে হাজারবার অনুনয়-বিনয় করে বুঝাতে চেষ্টা করুন না কেন, এমনকি আপনার ধর্মের গ্রন্থটি স্পর্শ করে স্রষ্টাকে সাক্ষী করেও বলুন, তাতে সে হয়তো আপনার সততার প্রতি ভক্তি দেখাবে, কিন্তু মনটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারবে না। কিন্তু যখনই তাকে রেডিও নামক যন্ত্রটি দিয়ে বাতাসে-ভাসা কথা ও গান শুনিতে দেবেন, তখন সে চমকে যাবে। অবাক বিস্ময়ে ছোট

বাচ্চাদের মতো এটা-সেটা প্রশ্ন করবে আর ভাববে। এর কারণ, তার মনের ভেতর আরেকটা বোবা যুক্তি ছিল, যা বার বার তাকে বাতাসে-ভাসা কথার বিশ্বস্ততায় আঘাত হেনেছে। এখন রেডিও শুনে মনের সেই বিরাট অবিশ্বাসের পাহাড় কম্পন শুরু হয়ে গেছে, ভিত নড়ে উঠেছে। তাই চোখে-মুখে থাকবে একটা বোবা বিশ্বাসের স্পর্শ চিহ্ন। আপনি হয়তো সেই লোকটাকে গেন্নো বলে গাল দিতে চাইবেন। কিন্তু, দোহাই, সে কাজটা করতে যাবেন না। কেন? কারণ বড় বড় জাঁদরেল জ্ঞানী-গুণীরাও একদিন অমন বোকার কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন টমাস আলভা এডিসনের প্রথম আবিষ্কারের ফিল্ম দেখতে গিয়ে। এডিসনের ফিল্ম দেখানো শুরু হল। সবাই অবাক। একি! মৃত ছবি চলাফেরা করছে! জ্ঞানীদের মনগুলো কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না, তাই সাদা পর্দার দিকে সবাই দৌড়ে এসে পর্দার পিছনটা দেখছে। অর্থাৎ পর্দার পেছনে নিশ্চয়ই মানুষগুলোকে রেখে দিয়ে এরকম খেলা দেখিয়ে বোকা বানাবার কৌশল। কিন্তু কই, না তো, কোন মানুষ তো পেছনে নেই, তাহলে? বিরাট প্রশ্ন, এ কি তবে ভোজবাজি দেখানো হচ্ছে? অনেকটা ছোট শিশুদের আয়নায় তাদের ছবি দেখালে যেমন শিশুরা আয়নার পিছনটা বার বার উল্টিয়ে দেখতে চায়, সেরকম আচরণই করেছিলেন জাঁদরেল জ্ঞানী-গুণীরা। বিজ্ঞানী এডিসন যখন সবকিছু একটার পর একটা করে বুঝিয়ে দিলেন তখন আমেরিকার সংসদ সদস্যরা সবাই বিশ্বাস করলেন এবং এডিসনকে জানালেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার মনে হয়, কোন মানুষ, সে যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন, অন্ধভাবে মেনে নিতে চায় না। তা যত বড় মহাপুরুষই বলুক না কেন। অবশ্য কিছু লোক ভয়ে ভয়ে বিশ্বাস করে, তবে পূর্ণভাবে নয়। অনেকটা এ রকম, হয়তো হবে আবার হয়তো নাও হতে পারে। বিশ্বাস আর

সন্দেহ দুটোই পাশাপাশি তখন সহাবস্থান করে। কখনো বিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, আবার কখনো সন্দেহ। এই দোটার দোলনায় দুলভে হয়। কত ডিজাইনের যে তখন গবেষণা চলতে শুরু করে তার ইয়ত্তা নেই। গবেষণার ফলগুলো হল কিছু বিশ্বাস, কিছু হতেও পারে আবার কিছু হতে পারে না। দল, মত, নীতি, দর্শন, আদর্শ : এভাবেই তৈরি হয় অনেক ভাগ। একভাগ অপর ভাগকে করে সমালোচনা, টিটকারী এবং নানান ধরনের মন্তব্য। তারপর শুরু হয় মান-অপমানের প্রশ্ন। অবশেষে শুরু হয় জানোয়ারের খেলা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তখন শুরু করে দেয় মারামারি, হাতাহাতি। পশুরা পোশাক বানিয়ে পরতে জানে না, অথচ মানুষ কত সুন্দর ডিজাইনের পোশাক পরে, গায়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে পড়ে। বোবা জানোয়ারগুলো কথা বলতে পারে না। যদি কথা বলতে পারতো তাহলে হয়তো বলতো, আহা কী সুন্দর তোমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব! আসলে, তোমরা অনেক সময় আমাদের চেয়েও অনেক নিচে নেমে যাও। আসলেই তাই। অনেক মহাপুরুষ এরকম বাণীর মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কেউ শোনে আবার কেউ শোনে না।

কোরানভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও অমরত্ব

এখন আমরা কোরানুল হাকিমের (কোরানের সঙ্গে শরীফ শব্দটি সমগ্র কোরানে একবারও বলা হয়নি। তাই শরীফ শব্দটি নূতন এবং নূতন মানেই বেদাত। এবং বেদাত মানেই খারাপ তা নয়, কারণ বেদাতকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা

হয়েছে। একটা ভাল, অপরটা খারাপ। সুতরাং এই শরীফ বলাটা ভাল। তাই এটা বেদান্তে হাসানা। এবং এই বেদান্তে হাসানা অর্থাৎ শরীফ শব্দটি কেউ যদি ব্যবহার করেন তাতে দোষ দেওয়া মোটেই ঠিক নয়, কারণ এটা মানুষের একান্ত স্বাভাবিক গতির দর্শন। এখানেও অনেকেই আঘাত করতে চান, কিন্তু অধম লিখক এর মধ্যে থাকতে চাই না। কারণ আমি মনে করি, প্রত্যেকের বক্তব্যের প্রতি সহনশীল হওয়া উচিত, যদি উহা মার্জিত এবং রুচিশীল হয়। অবশ্য মার্জিত এবং রুচিশীল বলতে কী বুঝায় এবং সবার মনেই তা মার্জিত এবং রুচিশীল বলে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, সে প্রশ্নটিও অনেকেই করে বসতে পারেন। এভাবে কথা বলতে গেলে কথা কেবল লম্বাই হতে থাকবে।) কোরানের দুই নম্বর সূরা বাকারার একশত চুয়ান্ন নম্বর আয়াতটির মূল অনুবাদ, বাংলাতে আরবি উচ্চারণ এবং বিশদ ব্যাখ্যা করতে চাই। এবং কোরানের তিন নম্বর সূরা আল-এমরানের একশত ঊনসত্তর নম্বর আয়াতটিরও ব্যাখ্যা দিতে চাই।

ওয়ালা তাকুলু লিমাই ইয়ুকতালু ফি সাবি লিল্লাহে আম্মওয়াত, বাল আহইয়া উ ওয়ালা কিল্লা তাশউরুনা।

‘এবং বলিও না যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, “তারা মারা গেছে।” না, কখনোই নয়। বরং তারা জীবিত।’

ওয়ালা তাহসাবান্নাল লাজিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আম্মওয়াতান্, বাল আহইয়াউ ইনদা রাব্বিহিম ইউরজাকুনা।

‘এবং না না, চিন্তাও করো না, যারা আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়েছে তারা মৃত! না, না, কখনোই নয়। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের রবের নিকট হতে রেজেক পাইতেছে।’

কোরানের ত্রিশ পারায় যতগুলো আয়াত তথা বাক্য আছে তার মধ্যে আমার মতে যে কয়টি সাংঘাতিক ধরনের অর্থবহন করে, এই বাক্য কয়টিও সেরকম। এই বাক্যগুলোর সাধারণ ব্যাখ্যা, দর্শনের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ এবং বহুবিশ্লেষণভিত্তিক আলোচনা করতে গেলেও শেষ হবে না। কারণ তারপরও অনেক গোপনীয় কথার রহস্য লুকিয়ে আছে। যত গবেষণা করা যায়, এই বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা যেন চমকের উপর চমক দিয়ে যায় এবং এই চমকের তাল ও লয় যেন শেষ হয়ে না গিয়ে একটা বিরাট রহস্যের গুহা তৈরি করে রাখে। অধম লিখক সেই কথাগুলোই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে কেবলমাত্র চেষ্টা করছি।

এখানে স্বাভাবিকভাবে মারা যাবার কথাটি বলা হয়নি। বলা হয়েছে যারা নিহত হয়েছে। খুব সূক্ষ্মভাবে একটু লক্ষ্য করুন, এই কথাটি বলা হয়নি যে নিহত অন্য কারো দ্বারা হয়েছে। যদিও 'নিহত' বলতে অন্যের দ্বারা মৃত্যুবরণ করা বোঝানো হয়ে থাকে। আবার কেবল নিহত হলেই হবে না। সেই নিহত হবার সঙ্গে একটি বিরাট অথচ সূক্ষ্ম শর্তটি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই শর্তটি যদি নিহত হবার সঙ্গে না থাকে তাহলে নিহত হওয়াটি একদম মূল্যহীন হয়ে পড়ে, অর্থহীন হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হল, নিহত হবার সঙ্গে সেই মূল্যবান শর্তটির নাম কি? সেই মূল্যবান শর্তটির মাত্র একটি নাম আর সেই নামটি হল, ফি সাবিলিল্লাহে অর্থাৎ 'আল্লাহর রাস্তায়'। এই 'আল্লাহর রাস্তায়' কথাটিই হল একমাত্র শর্ত। অন্য কোনো প্রকার শর্তই এখানে দেওয়া হয়নি এবং উল্লেখও করা হয়নি। এখন 'আল্লাহর রাস্তায়' বলতে কী বুঝায়? আল্লাহর রাস্তা কত প্রকার এবং কী কী এবং কেমন? তা যত প্রকারই হোক না কেন, আসলে সবগুলো মিলেই পরিণত হয় আল্লাহর রাস্তা। সুতরাং কেবল নিহত হলেই চলবে না, বরং একমাত্র আল্লাহর রাস্তায় অথবা আল্লাহর জন্যই হতে হবে নিহত। তাই বারণ করা হয়েছে, নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, একটি কথা না বলতে। কী সেই কথাটি যা সরাসরি আল্লাহ আমাদেরকে বলতে একদম মানা করে দিলেন? সেই কথাটি হল, যারা আল্লাহর পথে অথবা আল্লাহর জন্য নিহত হয়েছেন, তাদেরকে ভুলেও একবার মারা গেছে বলে ঘোষণা করতে পারবে না। 'তারা মারা গেছে' এই কথাটি প্রথমে না বলে বরং প্রথমেই চমকিয়ে দিচ্ছে এই বলে যে, ওয়ালা তাকুল তথা 'এবং বলিও না'। প্রথমে আসল বিষয়টিকে তুলে না ধরে অনেকটা ধমক দিয়ে বলার মত উপদেশ দেওয়া হচ্ছে

যে, ‘এবং বলিও না।’ কিন্তু কী বলিও না সেই বিষয়টি আগে তুলে ধরা হয়নি। বরং পরে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর জন্য নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বা মরে গেছে বলিও না। এই আদেশটি অস্পষ্ট করে বলা হয়নি, অথবা ভাষার মার-প্যাচ খাটিয়ে বলা হয়নি। একদম সোজা করে, একদম সাদামাঠা ভাষায় সরাসরি মানা করা হয়েছে যে, ‘এবং বলিও না যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে ‘তারা মারা গেছে’ এই কথাটি ভুলেও উচ্চারণ করিও না। তার মানে ‘তারা মারা গেছে’ বলাটিই কোরান বিরোধী এবং যাহা কোরান বিরোধী উহা বলা হারাম, তথা একদম নিষিদ্ধ, তথা দুই ঠোঁটের উপর তালা মেরে বুলিয়ে রাখা হয়েছে। একটু লক্ষ করে দেখুন তো, পূর্বের বাক্যটিতে ধমক দেওয়া হয়েছে, সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, কোন প্রকার চিন্তাভাবনা মনের ভেতর আসতে বারণ করা হয়েছে এই বলে যে, ‘না কখনোই নয়’। সুতরাং এখানে আমরা দুটি আদেশ বা হুকুম দেখতে পাচ্ছি। প্রথম আদেশটি হল, আল্লাহর জন্য যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলে বারণ করা হয়েছে, এবং অপর আদেশটি হল, আল্লাহর জন্য যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলে চিন্তা করতে একদম মানা করে দেওয়া হয়েছে। কত বড় সাংঘাতিক কথা, মৃত বলেও যেমন মানা করা হয়েছে তেমনি মৃত বলে মনে মনে চিন্তা করা হতেও মানা করে দেওয়া হয়েছে। কোরান মৃত ঘোষণা করতে যেমন

ইনকার করেছেন, তেমনি বসে বসে মৃত বলে চিন্তা করতেও ইনকার করা হয়েছে। এমন মারাত্মক নির্দেশ এতকাল কোরান গবেষণা করেও একটি বাক্যেও পাইনি। কারণ আমরা কম-বেশি সবাই জানি যে, শরিয়তের আইনে কোনো বিষয়ে চিন্তা করলে গুনাহ লিখা হয় না, যে পর্যন্ত না সেই চিন্তাটিকে বাস্তবে সশরীরে করা হয়, যে পর্যন্ত না সেই চিন্তা-ভাবনাটিকে আমলের সুরতে করা হয়। যেমন ধরুন, রাতে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করি যে, চুরি করবো, অথবা জেনা করবো, ঘুষ খাবো, জুলুম করবো, অন্যের আম্মানত মেরে দেব, কিন্তু ঘুম হতে উঠে যদি সেই আজ্ঞেবাজে চিন্তাগুলোর জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করি তাহলে শরিয়তের আইনে গুনাহ লিখা

হবে না। কারণ ইহা বাস্তবে করা হয়নি, কেবল চিন্তাভাবনা করেছিলাম।

কারণ

শয়তানকে আমার ভেতর খান্নাসরূপে ঢুকে যাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে শয়তান আমাকে কুমন্ত্রণা দেবার অধিকার পেয়েছে, কিন্তু সেই অধিকার বাস্তবে করা না করাটা সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করে। তাই যদি শয়তানের ওয়াসওয়াসা হতে মুখ ফিরিয়ে নেই তাহলে ইসলামের আইন অনুসারে আমাকে কোন প্রকারেই দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু সমগ্র কোরানে মাত্র এই কয়টি বাক্যে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি স্পষ্টভাবে। পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করেছি যে, এই বাক্যেই কেবল বলা নয়, এমন কি চিন্তা করতে পর্যন্ত একদম মানা করে দেওয়া হয়েছে। আর সেটাই হল, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছেন তাদেরকে মৃত বলতে যেমন মানা করা হয়েছে, তেমনি মৃত বলে চিন্তা করতেও মানা করা হয়েছে। সত্যিই, কোরানের ভাষার গাঁথুনি অপূর্ব বিজ্ঞানময় একটি মহাবিশ্বয়।

‘আম্মওয়াত’ তথা ‘তারাত মৃত’ এই সন্দেহ করছ? ভাবছো যে তারাত মারা গেছে। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তো মারা যাবার কথাটাই বলতে চায়। কিন্তু এই অতি প্রাচীন প্রকৃতির সত্যটিকে কোরান এমনভাবে ‘তারাত মৃত’ শব্দটিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যে, মানুষের অতি স্বাভাবিক চিন্তাধারার উপর থাপ্পড় মেরেছে। তার মানে— না, তারাত মৃত নয়। ‘তারাত মারা যায়নি’ কথাটিকে কোরানের অনুবাদ যারা করেছেন তারা তেমন বেশি কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই ফস করে একটা গৌজামারা ব্যাখ্যা দিয়ে দায় সেরে গেছেন, এবং এই দায় সারাতে গিয়ে কত সহজ-সরল মানুষেরা এরকম ব্যাখ্যার অখাদ্য খেয়ে ভুলের জটিল আমাশয় রোগে ভুগছেন

তার ইয়ত্তা নেই। শত ‘ফেলাজল’-মার্কী ঔষধ খাওয়ানোর পরও কিছুদিন পর পর ভুলের আশা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেই ব্যাখ্যাটি এত সুন্দর যে, আপনার সরল বিবেক চট করে লুফে নেবে। আপনি সামান্য চিন্তা না করেই বলবেন, বা! কী অপূর্ব ব্যাখ্যা। ‘তারা মারা যায় না’ কোরানের এ কথাটিকে তারা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে, আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তারা অমর। তাদের নাম ইতিহাসের পাতায়, মানুষের স্মৃতির পাতায়, মুখে মুখে প্রবাদ বাক্যের মত অমর হয়ে থাকে। তাই তারা অমর। অনেকটা এই ডিজাইনের ব্যাখ্যাই আপনি আশা করবেন এবং পড়ে মেনেও নেবেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি যে কত মারাত্মক এবং জঘন্য ভুল সেটা কি একবার ভুলেও ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছেন? আপনি কি একবার ভেবে দেখেছেন যে, এরকম সস্তা দামের অমরতা আল্লাহর রাস্তায় নিহত না হয়েও পৃথিবীর অনেক মানুষের ভাগ্যে জুটেছে। আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া তো দূরের কথা, বরং যারা আল্লাহ বলে কোন স্রষ্টাই নেই এমন ঘোষণা করেছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়াকে অমরতা লাভ করা তো দূরের কথা, বরং জঘন্য ভাষায় টিটকারী করে, মন্তব্য করে বলে যে, আল্লাহর রাস্তার অপর নাম হল আফিম খেয়ে ঝিম্মানোর রাস্তা, নেশা খাওয়া বেতাল ভারসাম্যহীন মানুষদের বিকৃত চিংকারের নোংরা ফসল। আল্লাহর রাস্তাকে এমন জঘন্য ভাষায় গালি দিতে যাদের জিস্মা এক মুহূর্তের তরেও থরথর করে কেঁপে উঠেনি, সেই সব ভগুরাও পৃথিবীর ইতিহাসে বিরাট অমরত্ব লাভ করেছে। এমন ‘মহান ব্যক্তির’ অদ্বিতীয় মহাপুরুষ হিসেবে শুধু কিছু লোকের কাছে নয় বরং বহু দেশে রীতিমত পূজনীয় ব্যক্তিত্বরূপে অমরতা লাভ করেছে। তাহলে? কোরানের এই বাক্যগুলোর সঙ্গে কি এরকম ফালতু অমরতা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আমাদের এবং আমাদের পরে যারা

আসবে তাদের পাতে দেবার জন্য পরিবেশন করে রাখা হচ্ছে না? কোরানের বর্ণিত এই অমরতার অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাব বহন করে। ঢাক-ঢোল পেটানো, চোখ ধাঁধানো অমরতা এটা নয়। বরং এই অমরতা আসল অমরতা, অর্থাৎ সীমিত গণ্ডির বন্ধন হতে এরা মুক্ত। জীবন-মৃত্যুর গোল চাকার বারবার ঘুরে আসার শৃঙ্খল এরা ভেঙ্গে ফেলেছেন, তাই এদের আর মৃত্যু নাই। কোরানের এই অমরতা হল, এখানে প্রকাশ্যে একটি নিখর লাশ হয়ে শুয়ে আছেন, অথচ ঐ একই সময়ে অন্য জায়গায় হয়তো মুরিদানের সঙ্গে কথা বলছেন, নয়তো পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, নৌকায় বসে নদীপাড়ি দিতে দেখা যাচ্ছে। তার মানে, কোরানের এই অমরতা বন্দিজীবনের বোবা জ্বালা-যন্ত্রণার দহন হতে মুক্ত। কারণ এই রকম দহনকেই জাহান্নাম বা নরক বলা হয়। জাহান্নামের আগুন যে মাত্র একটি জিনিসই আক্রমণ করে, একটি মাত্র ঘরেই সে আগুন ধরিয়ে দেয়, আর সেই আগুনের যে কী ভয়ঙ্কর প্রচণ্ডতম জ্বালা যে, সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে। জেনে শুনে সেই ভয়ঙ্কর বিষ পান করে, যে বিষের পরিণাম অবধারিত মৃত্যুবরণ। অথচ উপর হতে কেউ বুঝতে পারে না সেই জ্বালার ভয়াবহ দহন। দুনিয়ার আগুন তো এর সামনে একেবারেই তুচ্ছ। তুলনা দিতে গেলেও হাসি পায়, তাই তো আমরা জাহান্নামে বাস করছি। জাহান্নামে যাবো না, বরং আছি। একদম বর্তমান কাল। অথচ এই জাহান্নামে বাস করা, আল্লাহকে অস্বীকারকারী, নমরুদ-ফেরাউনের মত কত নামের মানুষেরা

অমর হয়ে আছে। কোথায় দুনিয়াতে বাস করা মানুষের অমরতার কথা তুলে ধরা, আর কোথায় কোরানের বর্ণিত অমরতার গোপন রহস্য! সত্যি, ভাবতেও অবাক

লাগে, কোরানের এরকম মার্ক-মারা কত মনগড়া ব্যাখ্যা পড়ে পড়ে আমরা কত দলে কত মতে ভাগ হয়ে চলেছি, যেন ডারউইন সাহেবের বিবর্তনবাদের একটি ছাপ মনগড়া ব্যাখ্যার উপর সুগন্ধি ছড়ানোর স্প্রে মারা হচ্ছে। ‘তারা মৃত নয়’ কোরানের এই কথাটি ঘোষণা করার সাথে সাথে বিপরীত কথাটিও বলে দিয়েছে। ‘বাল আহুইয়া’ অর্থাৎ ‘বরং জীবিত’ অর্থাৎ তারা অমর। কোরানের এই অমরতার কথাটি আমাদের দুনিয়ায় প্রচলিত তথাকথিত অমরতা নয়। তবে কোরানের এই ‘বাল আহুইয়া’ তথা ‘বরং তারা জীবিত’ কথাটির রহস্য বাজারে চালু সম্ভা অমরতা নয় বলেই সবার পক্ষে বুঝাও সম্ভব হয়ে উঠে না। কোরানের এই অমরতা সবাইকে এমনভাবে চমকিয়ে দেয় যে, মনের মধ্যে আস্থা মোটেই আসতে চায় না, বরং আজগুবি, গাঁজাখুরি কল্পনা ইত্যাদি বলতে হয়। বলতে বাধ্য হয়, কারণ কথায় কথায় এর প্রমাণ দেওয়া যায় না। এমনিতাই মানুষ একটি নতুন বৈজ্ঞানিক সত্যকে সহজে মেনে নিতে চায় না। প্রথমে চমকায় তারপর ধীরে ধীরে মেনে নেয়। অনেকটা ঘাড় ধরে জোর করে মানানোর মত। সেখানে নতুন বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোকে মানিয়ে নিতে অনেক সময় বেগ পেতে হয় বৈকি। আর যিনি স্রষ্টা, যিনি সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র মালিক, যিনি একমাত্র প্রশংসার মালিক (এখানে একমাত্র প্রশংসার মালিক বলার মধ্যেও অনেক কথা এবং ব্যাখ্যা থেকে যায়। তবু পাঠকদের সামান্য বুঝানোর জন্য বলতে হচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকলে তো প্রশংসার প্রশ্নটা উঠে। আসলে তিনি ছাড়া যে আর কেউ নেই। আর কেউ থাকলে তো প্রশংসা করবো। যেহেতু তিনি ছাড়া আর কেউ থাকা তো দূরের কথা, একটি বালি কণারও যদি আলাদা অস্তিত্ব থাকতো তবে তো সেই বালি কণাটির প্রশংসা করা যেত। তিনি ছাড়া যে আর কিছুই নেই, তাই নেই যাহা

তাহার প্রশংসা কেমন করে করা যায়? সুতরাং একমাত্র প্রশংসাটি কেবলমাত্র তারই জন্য করার কথাটি কোরানে প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে এই বলে যে, আল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আল আমিন। এই একমাত্র প্রশংসাটি যে একমাত্র আল্লাহপাকের জন্য, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও যুক্তি বিস্তারিতভাবে আমার রচিত কোরানের তফসিরে পাবেন) তাঁর রহস্য, তাঁর মারোফতি কথাগুলো বুঝা কতটুকু শক্ত হতে পারে! আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর যত দূরে যাবার এবং বুঝবার শক্তি থাক না কেন, কিছু তারও একটা সীমা আছে। সুতরাং সীমার মাঝে বাস করে অসীমের বাণী ‘বরং তারা জীবিত’ বাক্যটি বুঝা খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

কয়েকজন অলীর পরিচিতি

আজকের দিনে অনেক আরবি-ফার্সি জানা পীরে কামেল (?) পাওয়া যায়, এবং অনেক মানুষের আগমনও ঘটে, কিন্তু সেই রকম দুনিয়াকে লাখি মেরে আল্লাহর প্রেমে মাস্ত হয়ে থাকা মজ্জুবের কদর আরবি ভাষায় বিদ্বানদের কেতাবি ফতোয়ার চোটে প্রায় বুঝতে পারে না। আসলে কথা হল, যেই সে কো তেইসে মিলে, ভূতের কপালে পেত্নী মিলে। আমি যেমন তেমনটিই তো বেছে নেব। কারণ এটাই হল তকদির। এর বেশি খোলাসা বয়ান করতে চাই না। তাই স্বাধীনভাবে কিছু খুলে লিখতে পারি না। যারা বোঝার তারা এই সামান্য কথাতেই আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। কারণ আকলমন্দের লিয়ে ইশারাই কাফি হয়।

অনেক কাম্বেল মজ্জুব দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। নমুনা হিসাবে কয়টি নাম ইচ্ছা করেই উল্লেখ করলাম, যেমন- লৌহজং উপজিলার কদম মস্তান, শ্রীনগরের চাঁন মস্তান, ঢাকা শহরের চানখাঁর পুলের করিম মস্তান, শ্রীনগর উপজিলার শিকারপুর গ্রামের নিমু চাঁদ মস্তান, বগুড়া জিলার ভাই পাগলা মস্তান, কুমিল্লার মতলব উপজিলার বেলতলির বাবা সোলায়মান শাহ লেংটা, ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজিলার আগলা গালিমপুরের বাবা আফাজুদ্দীন মস্তান, ময়মনসিংহের চুপ শাহ বাবা, মামু মস্তান, ফরিদপুর জিলার রাইজের উপজিলার আমগাঁওতে আমীর শাহ বাবা।

এরকমভাবে বহু পীরে কাম্বেলদের নাম উল্লেখ করা যায়। ঐদের নামগুলো কেন উল্লেখ করতে গেলাম? এজন্যই ঐদের নামগুলো বলতে হল যে, ইনারাই সেই সব মহাপুরুষ যাদেরকে কোরানে ‘বাল আহইয়া’ বলে ঘোষণা করেছেন। ‘বরং তারা জীবিত’ এই সাংঘাতিক রহস্যের এক একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত হলেন ঐরা। অথচ আমরা কয়জন তাদের চিনতে পেরেছি? কয়জন জানতে পেরেছি? কয়জন এই ভেদ-রহস্যের সামান্য আভাস পেয়েছি? নকল মাল বাজারে এত বেশি যে, আসলটা পাওয়াও একটা কপালের ব্যাপার। হাঁ, সত্যিই ইহা তকদিরের ব্যাপার। আপনার তকদিরে লেখা থাকলে অবশ্যই কোন না কোন উসিলাতে পেয়ে যাবেনই। আর যদি তকদিরে লেখা না থাকে তাহলে বাড়ির সামনে থাকলেও আপনি পাবেন না। আপনার মন-মগজে যা সাজানো হয়ে গেছে, সেই রকম সাজানো চিহ্নটাই তো ফস করে জুটে যাবে। আর তাই পেয়ে আপনি হবেন মহাখুশি।

বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি শামসুর রাহমান একবার টেলিভিশনের পর্দায় একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন। সেই কথাটির মূল বিষয়বস্তু হল, রবি ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম আর লালন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে বানানো যায় না। যদি যেত তাহলে এতদিনে কত হাজার এরকম কবি আমরা পেতাম? কবি শামসুর রাহমানের মত অধম লিখকও বলতে চায় যে, আল্লাহর পাঠানো দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীদের মধ্যে একজনও মাদ্রাসায় পড়েনি। কারণ মাদ্রাসায় পড়ে কেউ নবী হয় না। মাদ্রাসায় পাশ করে মুফতি, মাওলানা হওয়া যায়। তেমনি পীরে কামেল হতে হলে নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার অথবা খান্নাসটিকে মুসলমান বানাবার সাধন-ভজনে লেগে থাকতে হয়। এই সাধন-ভজন যুক্তি-তর্ক আর আইনের জটিল ধারাতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় আল্লাহর সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে। আল্লাহর সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা কতটুকু করলে আল্লাহকে পাওয়া যেতে পারে বলে যদি আমাকে প্রশ্ন করেই বসেন, তাহলে হাতছোড় করে কমা চেয়ে নেব। কারণ আমি এ বিষয়ে অন্ধ। যেহেতু আমি এই বিষয়ে অন্ধ, সেহেতু ইহার মাপকাঠি আমি নই। কারণ অন্ধ কখনো এবং কোনদিন সত্যের মাপকাঠি হয় না, হতেই পারে না। যিনি আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়ে গেছেন তাঁকে খুঁজে বাহির করুন, কারণ তিনি কতল হয়েও যে জীবিত অমর, ‘বাল আহইয়া’, এবং তাকেই জিজ্ঞেস করুন যে, কেমন করে আমি এই অমরতার পুরস্কার পেতে পারি সেই পথ ও রিয়াজত আমাকে দয়া করে শিখিয়ে দিন, বুঝিয়ে দিন। কারণ সিংহের শরীরে কতটুকু শক্তি আছে সেটা কেবল বাঘই বলতে পারবে, কিন্তু একটা বাইতা ইঁদুরের পক্ষে কি তা সম্ভব? যেহেতু এ বিষয়ে আমি বাইতা

ইঁদুরের মত একটি জীব, তাই সিংহ নামক জীবের শক্তি কেমন করে আন্ডাজ করতে পারবো?

কথায় বলে, বনে যারা বাস করে তাদের বনেতেই মানায়, এবং শিশুকে মানায় মায়ের কোলে। ভাটিয়ালি গান, চাষাদের আনন্দ উৎসবগুলো চাষা পরিবেশেই সুন্দর মানায়, কিন্তু ওটাই যদি পাঁচতারা বিলাসবহুল হোটেলে শো করে দেখানো হয় তাহলে কি ততটুকু মানাবে? কোথায় যেন একটা গরমিল আপসেই মনের মধ্যে ধরা পড়তে চাইবে। এটাই স্বাভাবিক। সে রকম মাদ্রাসার ক্লাশরুমে বসে অথবা এ ধরনের কোন পরিবেশে থেকে কোরানের ব্যাখ্যা লিখাটার মাঝেও যেন কোথায় একটা গরমিল থেকে যাচ্ছে বলে মনে হবে। সমাজ জীবনে বাস করা মানুষগুলো এই গরমিলের হিসাব মিলাতে গিয়েই খায় হিমশিম। শৃঙ্খলার শক্ত বাঁধনের ভেতরও যেন ঢিলামির অদৃশ্য ফাঁক থেকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। অথচ ভাল করে দেখেও সেই ফাঁকটুকু আবিষ্কার অনেকেই করতে পারে না। যারা পারে না তাদের কোন দোষ নেই, এবং দোষ দেওয়াও চলে না। কারণ এটা যে তকদিরের খেলা। এ খেলার সুতোটা কোথায়? খুঁজে খুঁজে না পাওয়ার হতাশায় দীর্ঘশ্বাসটিও যে তকদিরের খেলা, সেটা মনপ্রাণ কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। অসম্ভব বলে চোখ-মুখ লাল করে বিদ্রোহ নামক আক্ষালালটির আগমন যে অবধারিত। অনেকটা গাড়ি নিয়ে পথে এসে একসিডেন্ট করে মৃত্যুকে বরণ করার মত। হাসতে হাসতে পথে বেরুলাম, কিন্তু তকদির যে এত করুণ হবে এটা কি কেউ ভাবে? ভাবতে চায়?

এবার আমরা কোরানের বর্ণিত ‘ইয়াকতালু’ শব্দটির সামান্য ব্যাখ্যা করতে চাই। ‘কতল’ শব্দ হতে ইয়াকতালু। কতল অর্থ হলো হত্যা, খুন, মেরে ফেলা। কোরানের এই ইয়াকতালু শব্দটি ব্যহার করার দরুন চিন্তার রাজ্যে অনেক রকম অর্থ হবার চিন্তাভাবনা আসা স্বাভাবিক। বেশির ভাগ কোরানের ব্যাখ্যাকারীরা এই ইয়াকতালু শব্দটি থাকার দরুন ধর্মযুদ্ধে শহীদ হবার চিন্তাটি টেনে আনতে বাধ্য হয়েছে। এতে সমস্ত বিষয়টিতে মিল থাকুক আর নাই থাকুক, ইহা ছাড়া তাদের মাথায় অন্য ধরনের ব্যাখ্যা করার মত চিন্তা ঢুকতে পারেনি। অথচ সূরা বাকারার একশত তেপান্ন আয়াত হতে একশত সাতান্ন আয়াতের সমস্ত বর্ণনার ধারাবাহিক হবহ অনুবাদ করে দেখুন, একবারও এই ধরনের সামান্যতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। ধর্মযুদ্ধের কথা তো বাদই দিলাম। তাহলে সহসা ‘তাকুলু’ শব্দটি কেন ব্যবহার করা হল? আমরা কোরানের আগের এবং পেছনের সবগুলো আয়াতের অনুবাদে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবো, রক্ত পরীক্ষা করার মতো, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নেবার মতো হাজার প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসার গবেষণায়ও তাকুলুর সঙ্গে কোন প্রকার যুদ্ধ, মারামারি অথবা এ ধরনের কোন প্রকার সামান্য একটি ঘটনারও উল্লেখ পাই না। অথচ তাকুলু শব্দটি ব্যবহার করা হল কেন? তা হলে এই তাকুলুর অর্থ কী হতে পারে? যদিও সাধারণ অর্থে ধর্মযুদ্ধে খুন হওয়াটাকেই আমরা শহীদ বলি, কিন্তু এখানে তাকুলু শব্দটি কেন ব্যবহার করা হল? তাকুলু অর্থ যদি মেরে ফেলা হয়, তাহলে কি মেরে ফেলতে বলা হল? এর আগের আয়াতেই কিছু বলা হয়েছে যে, যারা সালাত এবং সবার তথা ধৈর্যধারণ করে, তাদের সঙ্গে অবশ্যই আল্লাহ আছেন এবং থাকেন। এখানে আল্লাহ আছেন

এবং থাকেন বাক্যটির সঙ্গে ‘অবশ্যই’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে আল্লাহর নিশ্চয়ই থাকার কথা স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

আম্মানু ও মুম্বিনুগণের মধ্যে পার্থক্য

এর আগের আয়াতে তাদেরকেই লক্ষ করে বলা হয়েছে যারা আম্মানু। অন্য কাহাকেও কিছু বলা হয়নি। একমাত্র আম্মানুদেরকেই লক্ষ করে বলা হচ্ছে। এখানে কিছু ইনসান, মোম্বিন অথবা মুসলমানকে লক্ষ করে বলা হয়নি। ইনসান তথা সাধারণ মানুষকে আম্মানুভাবে বলা হয়নি। তারপর মুসলমানকেও বলা হয়নি। কারণ মুসলমান হল দলগত ব্যাপার। আর মোম্বিনকে বলার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ মোম্বিন তারাই, যারা আদেশ-নিষেধের বাইরে চলে গেছেন। মোম্বিনকে লক্ষ করে সমস্ত কোরানের একটি আয়াতেও বলা হয়নি, ‘ইয়া আইয়ুহাল মুম্বিনু’। কারণ মোম্বিনের জন্য যেহেতু আদেশ অপ্রয়োজন, সেহেতু উল্লেখ করার প্রশ্নই উঠে না। কেবল এখানেই নয়, বরং কোরানের অধিকাংশ আয়াতে আম্মানুদেরকেই লক্ষ করে যত আদেশ আর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আম্মানু তারাই যারা ঈমানের মহড়ায় আছে। যারা মোম্বিন হবার সাধনায় অস্থির হয়ে সাধনায় লিপ্ত, যারা সংগ্রামরত নফস তথা প্রাণ, যারা নফস তথা রিপূর বাধ্যতামূলক গোলামির শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার জন্য যোদ্ধার বেশে নীরব যুদ্ধে সংগ্রামরত অবস্থায় ছটফট করছে, তাদেরকেই আম্মানু বলা হয়। আর এই আম্মানুদেরকেই একমাত্র উদ্দেশ্য

করে কোরান ঘোষণা করছে এই মহা সুসংবাদ। সুতরাং ধর্মযুদ্ধের কথা তুলে ধরা এবং সেই যুদ্ধে শহিদ হবার কথা এখানে একবারও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ অনেকের মনে এই ধরনের চিন্তা আসতে পারে। কিন্তু আমি অতি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এরকম চিন্তা করাটাই ভুল, এবং এই ভুলই আমাদেরকে উপহার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহকে লাখ লাখ শুকরিয়া এবং তার সঙ্গে লাখো সালাম জানাই সেই মহান সাহাবাকে, যিনি ইমাম্মে কেবলাতাইনের দুই-দুইটি নূরের তোহফা পাওয়া আমিরুল মুমিনিন, যিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ইমাম্মে কেবলাতাইনের পদতলে লুটিয়ে দিয়েছেন সেই মহা মহীয়ান হজরত উসমানকে। কারণ তিনিই সমস্ত কোরানকে একত্র করেছিলেন। এই দায়িত্ব যে কত বড় দায়িত্ব পালন করা তা তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। শ্রদ্ধেয় খ্রিস্টান ভাইয়েরা রাগ করবেন না, কারণ অধম লিখক নিরপেক্ষ, সাইনবোর্ড ফেলে দিয়েই কলম ধরেছি এবং আপনাদেরকে বলছি যে, হিব্রু ভাষায় বাইবেল না পেয়ে গ্রিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ কেন পাব? অনুবাদের সঙ্গে কেন মূল ভাষার বাইবেলটি পাশাপাশি রাখা হল না? অনুবাদে অবশ্যই সত্য থাকে, কিন্তু অনুবাদ যত সুন্দর আর মার্জিতই হোক না কেন তাতে আসল সত্যটির উপর বিকৃতির অনেক চাকনা যে পড়ে তা দুনিয়ার সাধারণ সাহিত্য পড়লেও অতি সহজেই বুঝা যায়। তাই ইটালিতে একটা প্রবাদ আছে যে, অনুবাদকের আর এক নাম বিশ্বাসঘাতক। এই ইটালির প্রবাদটি যে কত বড় সত্য কথা, তা কেবল আপনাদের বেলায় বলছি না, আমাদের বেলায়ও একবার লক্ষ করে দেখুন তো, আমাদের কোরানের ব্যাখ্যার কথা তো একদম বাদই দিলাম, এমনকি কোরানের অনুবাদের প্রশ্নেও পনের-বিশটি অনুবাদকের অনুবাদ পড়ে

দেখুন তো, মিল পান কিনা। অতি সাধারণ একটা কথা তুলে ধরছি, কোরানে আল্লাহ যেখানে ‘আম্মি’ না বলে ‘আম্মরা’ বলেছেন, অনেকের অনুবাদে আপনি তা পাবেন না। আজ যদি মূল কোরানটি খোদা না খাস্তা না থাকতো, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াতো? তাই কোরানের উপর আপনি অনেক রকম ব্যাখ্যা ও গবেষণা পাবেন এবং ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক, এরকম গবেষণার উৎসাহ স্বয়ং মহানবীই দিয়েছেন। কিন্তু মূল কোরান তো সঙ্গেই আছেন। তাই ভয় পাওয়া অথবা চিন্তার কোন কারণ থাকতে পারে না। এই কথাগুলো বলা এখানে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়, তবু বলতে হল। না হলে কত প্রকার যে রেফারেন্স তুলে ধরতাম, যা পড়লে আপনি অবাক হয়ে যেতেন। কিন্তু অনেক সময় আসল কথাটা বলতে গেলে কিছু অপ্রয়োজনীয় কথা এসে পড়ে। গোলাপ ফুল হাতে নিতে গেলে মাঝে মাঝে দু’একটা পাতা অকারণেই এসে পড়ে, যদিও পাতা ফুল নয়।

তকদির সম্পর্কে সুন্নাহ তত্ত্ব

যারা আমান কেবলমাত্র তাদেরকেই লক্ষ করে আল্লাহ বলছেন যে, যারা নিজেদের রিপুগুলোর খেয়াল-খশিমতো চলার পথে বাধা দান করে, যারা নিজেদের রিপুগুলো যা চায় তা দিতে অস্বীকার করে, যারা নিজেদের রিপুগুলোকে যেমন খশি তেমন ধেই ধেই করে নাচতে দেয় না, যারা নিজেদের রিপুগুলোর লোভনীয় স্বভাবের উপর তালা বুলিয়ে দিতে পেরেছে, যারা নিজেদের রিপুগুলো যা বলে

তাই করার গোলামি হতে মুক্তির তরে যুদ্ধ করছে এবং এই রিপু নামক দানব-দৈত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে, তাদেরকেই আল্লাহর জন্য নিহত হয়েছেন বলে কোরান ঘোষণা করেছে। কী সুন্দর ভাষার নিখুত কৌশল অবলম্বন করে বলা হয়েছে, যাতে অনেক রকম অর্থ করা যায়। ভাষার কী বিজ্ঞানময় কৌশল! যার জন্য কোরান নিজেই যে কতবার বলছে যে, এই কোরান পাঠ করে কেউ পথ পাবে, আবার কেউ পাবে না। কেউ প্রশংসায় অভিভূত হবে, আবার কেউ বিরূপ মন্তব্য ছুড়ে অস্বীকার করবে। আবার কেউ বুঝতে গিয়ে ভুল বুঝাটাকেই ঠিক বুঝ মনে করবে। আবার কেউ নিজের বুঝটাকেই সঠিক এবং অন্যেরটা ভুল বলবে। যদি বলেন, এরকম কেন হয়? এর উত্তর হল, তকদির। আপনার তকদিরে যা জন্মের আগেই লিখা হয়ে গেছে, উহা কেউ বদলিয়ে দিতে পারবে না। আবার এই 'পারবে না'র মধ্যে একটি সামান্য কিন্তু থেকে যায়। সেই কিস্তিটি আবার কী? তকদির কখনো কখনো বদলায়, তবে সেই বদলানোর পেছনে দোয়া থাকতে হবে। কোন অলীয়ে কামেলের দোয়া থাকলে তকদির বদলিয়ে যায়। এছাড়া তকদির বদলানোর আর কোন পথ অধম লিখকের জানা নাই। আপনার তকদিরে যদি জন্মের আগেই লিখা হয়ে থাকে যে, আপনাকে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে তাহলে আপনি যতই ভুল কাজই করুন না কেন, এমন কি জান্নাতে প্রবেশ করতে মাত্র একটি পা বাকি আছে, তখন ফেরেশ্তারা আপনাকে লাথি মেরে জাহান্নামে ফেলে দেবে। কারণ? কারণ আগেই যে জাহান্নামে আপনার নাম রেজিস্ট্রি করে রাখা হয়েছে। আবার যদি আপনার তকদিরে জন্মের আগেই লিখা হয়ে থাকে যে, আপনাকে জান্নাতে নেওয়া হবে, তাহলে আপনি যত খারাপ কাজই করুন না কেন, এমনকি জাহান্নামে প্রবেশ করতে মাত্র একটি পা বাকি আছে, তখন ফেরেশ্তা আপনাকে ধরে জান্নাতে ঢুকিয়ে দেবে। কারণ? কারণ আগেই জান্নাতে আপনার নাম রেজিস্ট্রি করে রাখা হয়েছে। এই কথা শুনে আপনি হয়তো হতাশ হয়ে যাবেন। হতাশ হতে যাবেন কেন? আপনি হয়তো মনে মনে বলছেন, ইহা অধম লিখকের কথা। মোটেই না। আমি অম্মন কথা লিখতে যাব কোন দুঃখ? হাদিসের বইগুলো পড়ে দেখুন না, তাহলেই বুঝতে পারবেন। যদি বলেন, আমি এরকম হাদিস মানি না, তাহলে এই না মানাটাই আপনার তকদির। এতে আল্লাহর কিছুই যায় আসে না। আপনি যা ইচ্ছে তাই রাগ করে বলতে পারেন, এবং এটাও জেনে রাখুন, এই যা ইচ্ছে তাই বলাটাও আপনপর তকদির। বড় সাংঘাতিক রহস্য এই তকদির। আমার কথা শুনে যদি হাত-পা ছেড়ে বসে পড়েন, আর মনে মনে বলেন যে, যা হবার তাটা আগেই হয়ে আছে তাহলে আর চিন্তা করে কী লাভ, এই রকম বলাটাও আপনার তকদির। আপনি যত বাহাদুরি আর লাফালাফি করুন না কেন, তকদিরের লিখন কিছুতেই খঙাতে পারবেন না। তকদিরে যদি একসিডেন্টে মারা যাওয়া লিখা থাকে, অথবা কোন কঠিন রোগে ভুগতে হবে, তাহলে তাই হবে। তখন এ

অসহায় দার্শনিকের মত আপনার অবস্থা হবে, যে জীবনভর নাস্তিক থেকে মরার আগে নাকের উপর বসা মাছিটিকে হাত দিয়ে সরাতে না পারায় শিষ্যদের শেষ কথাটি বলে গেলেন, 'আজ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলাম, আল্লাহ তুমি আছ, এবং তোমার মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' তকদিরের কথা শুনে কি কেবল আপনার একাই রাগ হয়? আমরাও কি আপনার মত মানুষ নই? রাগ কি কেবল আপনাকে একাই দেওয়া হয়েছে? কিন্তু যেহেতু কিছু করার নেই তাই চিন্তা করি, যদি কোন অলীয়ে কামেলের লাখি-পুতা খেয়ে মুখ বুঝে সহ্য করতে পারি এবং সেই অলীয়ে কামেলের যদি ইচ্ছা হয় যে বদলিয়ে দিলুমি, তাহলে আর কী, বদলে গেল। আমার কথাগুলো পড়ে মনে করবেন না যে কাচা হাতে লিখা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিযাজত করার মত অনেক ধরনের বই পড়েই এ কথাগুলো বলছি। তকদিরে টাকার অভাব ছিল না, তাই অনেক টাকার বই যখন তখন কিনেছি। একটু অহঙ্কার করছি? খোদার কসম, অহঙ্কারের নিয়তে কথাগুলো বলছি না। তাই আমার নিয়তটা কী তাও আপনাকে জানিয়ে দিলাম।

এবার আসল কথায় আসা যাক। এই রিপু নামক পণ্ডুলোকে যারা আল্লাহকে পাবার জন্য খন করে ফেলতে পেরেছেন, মেরে ফেলতে পেরেছেন, হত্যা করতে পেরেছেন, তাদেরকে আল্লাহ চিরজীবিত, অমর বলে ঘোষণা করেছেন। তাই ধর্মকের ভাষায় আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'বাল আহইয়া' 'বরং তারা জীবিত'। 'এই জীবিত' কথাটি কিন্তু আপেক্ষিক সত্যের প্রশ্নে নয়, বরং সার্বিক সত্য। দূনিয়ায় যা কিছু দেখছেন, কোনটাই কিন্তু সার্বিক সত্য নয়। সব কিছু আপেক্ষিক সত্য। এই আপেক্ষিকতার মধ্যে আবার সম্মুখসূচী নির্ধারণ করা থাকে। ধরুন, কোনটা এক মিনিটের সত্য, কোনটা এক ঘণ্টার সত্য, এক দিনের সত্য, এক বছরের সত্য, একশত বছরের সত্য, এক কোটি বছরের সত্য। এই প্রতিটি সময়ে বাস করা সত্যগুলো সবই আপেক্ষিক সত্য। ধরে নিলাম আমাদের জীবনগুলো শত বছরের আপেক্ষিক সত্য। তুরপরে আর থাকবো না। হারিয়ে যাব। এই যে নেপাল নামক দেশটি দেখছেন, এই যে বিরাট হিমালয় পর্বত দেখতে পাচ্ছেন, যা আপনার চোখ ও মন সার্বিক সত্য বলে ধরে নেবে। কিন্তু, দুঃখিত, ইহা সার্বিক সত্য নয় বরং ইহাও আপেক্ষিক সত্য। কারণ দুই কোটি বছর পূর্বে এই নেপাল নামক দেশটি এবং এই বিশাল হিমালয় পর্বতটি ছিল না। এখানে ছিল এক বিরাট এবং ভয়াবহ মহাসাগর। যে সাগরটির নাম পর্যন্ত বইতে লিখা হয়ে থাকে। সেই ভয়াবহ সাগরটির নাম ছিল টেথাস। প্রচণ্ড ভূকম্পনের ফলেই এই দেশ আর পর্বতের জন্ম। এই কথাগুলো শুনে যেন কেমন লাগে। কিন্তু নমনা হিসাবেই যদি পদ্যানদার কথা বলি? কত সুন্দর সুন্দর গ্রাম, নদীবন্দরগুলোকে গ্রাস করে আবার যেখানে গভীর পানি ছিল সেখানেই কী সুন্দর বিরাট চর পড়ে গেছে। সেই চরে আবার নতুন করে আবাস তৈরি করা। তাই যা কিছু দেখছেন সবই আপেক্ষিক সত্য। কেবল প্রশ্নটি হল, ইহা কতদিনের সত্য হয়ে থাকবে? আমার একথাগুলো কিন্তু কোরান অনেক আগেই ঘোষণা করেছে। সুরা রুহমান নিশ্চয়ই পড়েছেন। তাই 'বাল আহইয়া' 'বরং তারা জীবিত' কথাটি আপেক্ষিক সত্য নয় বরং সার্বিক সত্য।

কারণ এই জীবিতদেরকে নিয়েই তিনি এক, অদ্বিতীয় হয়েও আমরা রূপ ধারণ করেন। এই আমরা রূপেই তিনি তথা আল্লাহ হেদায়েত করেন, রেজেক দান করেন, রুহ ফৎকার করেন। এই বিষয়ে কোরানের একটি স্থানেও আল্লাহকে আমি রূপে পাবেন না। পাবেন আমরা রূপে। এই আমরা রূপটাই হল রবের চেহারা। সব কিছু ফানা হয়ে যাবে। ধ্বংসস্থাপে সবকিছু পরিণত হওয়াই নিয়ম। কেবল ব্যতিক্রম হল রবের চেহারা। কারণ রবের চেহারা হল সার্বিক সত্য।

মৃত কাবলা আনতা মৃত তথা 'মরার আগে মরে যাও' কথাটির আসল অর্থ হল, আল্লাহর জন্য খন হয়ে যাওয়া এবং এই ধরনের খন হতে পারলে সবাই মৃত বলে জানবে এবং মৃত লাশ দেখে কে-না মনে করবে? কিন্তু এখানেই আল্লাহর প্রচণ্ড ধমক। সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হল। বলা হল, ন-কখনোই তারা মৃত নয়, বরং তারা জীবিত এবং আরেকটা ধমক দেওয়া হল এই বলে যে, তোমরা যা বুঝ না, জান না, আমি তা জানি। এই ধমক দেবার প্রয়োজন আছে। কারণ, আমাদের হৃদয়গুলো দেখছে মৃত, অথচ হৃদয়গুলোর মাধ্যমে ছাড়া সেই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের হৃদয়গুলোকে আল্লাহর জন্য কোরবানি করতে পারলেই জন্ম নেয় শুদ্ধ হৃদয়, এবং সেই পরিশুদ্ধ হৃদয়গুলো অর্জিত হলেই বুঝা যাবে যে, কোন অলীয়ে কামেল মারা যান না। কারণ তারা যে মারা যাবার আগেই হৃদয়গুলোকে আল্লাহর জন্য কতল করে দিয়েছেন। যেমন আমরা দইয়ের প্যাকটিকে ব্যাকটেরিয়ার ভাগাভা বলে মনে করতে পারি না, কারণ আমাদের মূল হৃদয়গুলো ব্যাকটেরিয়া দেখতে পায় না। যেমন বাতাসে কথা, গান, এমনকি মানুষের ছবিগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে বললে মূল হৃদয় মেনে নিতে চায় না, যদি না রেডিও এবং টেলিভিশনে তা দেখানো হয়।

জেহাদে আসগর ও জেহাদে আকবরের মাঝে প্রভেদ

মহানবীর সঙ্গে কাফেরদের যতগুলো যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধগুলো নিছক নিজেদের রক্ষা করার জন্য। কাফেরেরা যখনই আক্রমণ করেছে তখনই প্রতিহত করতে মহানবী বাধ্য হয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় এ সকল যুদ্ধকে আমরা কেবল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ হিসাবেই দেখতে পাই। তাই প্রতিটি যুদ্ধের পরই মহানবী সাহাবাদের এই বলে উপদেশ দিয়েছেন যে, জেহাদে আসগর তথা ছোট জেহাদ। আরো একটি কথা হল, মহানবী এই অস্ত্রের যুদ্ধকে কখনোই একবারও 'জেহাদে আকবর' অথবা 'জেহাদে কবির' বলে ঘোষণা করে যাননি। বেশি উদ্ভাহরণ দিয়ে বই বড় না করে তিরমিজি শরীফের একটি হাদিস বর্ণনা করে বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলে ধরছি। মহানবী বলেন, রাজানা মিনাল জিহাদি সাগিরা ইলাল জিহাদি

কাবির অর্থাৎ ‘আমরা ছোট জেহাদ হতে বড় (আকবর) জেহাদের দিকে ফিরে এসেছি।’ তাবকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর মহানবী এই উপদেশ সাহাবাদের দিয়েছিলেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্বযুদ্ধে জয়লাভ করাই যদি একমাত্র জেহাদ বলে আমরা ধরে নেই, তাহলে মহানবীর এরকম উপদেশ দেবার অর্থ কী হতে পারে? আর তিনি জেহাদকে ভাগই বা করে দেখালেন কেন? কেন তিনি তাবকের যুদ্ধকে জেহাদে সাগীর বললেন? তাহলে জেহাদে আকবর বলতে কী বুঝাতে চেয়েছেন? নিজের রিপুগুলোর বিরুদ্ধে তথা হিন্দুয়নুলোর বিরুদ্ধে তথা এক কথায় নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই জেহাদে আকবর বলেছেন। এখন কোরানের আগের এবং পেছনের আয়াতগুলোর হুবহু অনুবাদ বার বার মনোযোগ সহকারে পড়ে দেখুন তো, অস্বযুদ্ধের কথাটি থাকে না তো দূরে থাক। বরং নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে ‘ইয়াকুতালু’ তথা আল্লাহর জন্য কতল হয়ে যান বলার মধ্যে জেহাদে আকবরের কথাটিই ঘোষণা করা হয়েছে। তবে যদি সত্যিকার অর্থে ধর্মযুদ্ধে কেউ কতল হন, তাহলে কোরানের এই ঘোষণাটি সেই কতল হয়ে যাওয়া মানুষটির জন্যও প্রযোজ্য হবে। উভয় অর্থই গ্রহণীয়, কিন্তু এখানে জেহাদে আকবরের কথাটি, তথা নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করাটাই বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। ‘জাহাদা’ শব্দ হতে জেহাদ। যার অর্থ করা হয়, কোন কর্মে সর্বশক্তি নিয়োজিত করা। মহানবী বলেন, আল মুজাহিদ মান জাহাদা নাফসাহ ফি তা আতিল্লা অর্থাৎ একমাত্র মোজাহেদ সবসময় নফসের বিরুদ্ধে আল্লাহর এতায়াতের জন্য জেহাদে মশগুল থাকে।

এখন কোরানের পুরো আয়াতটি মিলিয়ে দেখুন তো, আপনার মন ও বিবেক কী বলে? যদি মিল পান তাহলে এটা আপনার তকদির, আর যদি মিল না পান তাহলে সেটাও আপনার তকদির। নফসের বিরুদ্ধে জেহাদের বিষয়টি নিয়ে আরো অনেক কথা তুলে ধরা যেত, কিন্তু যাদের লাভ হবার তাদের জন্য এই সামান্য ব্যাখ্যাটিই যথেষ্ট মনে করি, আর যাদের হবার নয় তাদের এক বস্তা উদ্ধারণ তুলে ধরলেও যেরকম তেমনই থেকে যাবে। কারণ তকদিরে না থাকলে আমি কী করতে পারি?

ইমাম গাজালীর মোকাবেলাতুল কলুব নামক বিখ্যাত বইটির ২১৩ পৃষ্ঠায় কী বলা হয়েছে? বলা হয়েছে, একবার জেহাদ হতে একদল মুসলমান সবে মাত্র ফিরে আসায় মহানবী বললেন, ‘মারহাবা’ এবং সেই সঙ্গে এটাও বলে দিলেন যে, ছোট জেহাদ হতে তোমরা বড় জেহাদের দিকে এসেছ। তখন মহানবীকে প্রশ্ন করা হল, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! জেহাদে আকবর বলতে কী বুঝায়?’ মহানবী বললেন, ‘নিজের নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকেই বলা হয় জেহাদে আকবর’। তাই যারা আল্লাহর জন্য কতল হয়েছেন, যারা ফানাকিল্লাহ হয়েছেন, যারা মরার আগেই মারা গেছেন, তাদেরকে সবচাইতে সাংঘাতিক উপাধি এবং সম্মানের মুকুট পরিষে দিয়েছেন এই বলে যে, তারাই হল ‘বালু আহইয়া’ বরং তারা জীবিত। এত বড় সম্মান পাওয়ার অর্থই হল কোরানে বর্ণিত সবচাইতে বড় সম্মানটি পাওয়া। কারণ

আপেক্ষিক অর্থে নয়, কিছুদিনের জন্য নয়, বরং সার্বিক অর্থে, সব সময়ের জন্য তথা চিরন্তন জীবন লাভ করেছেন।

কোরানে বর্ণিত এই চিরন্তন জীবন যিনি লাভ করতে পেরেছেন তাকে দুনিয়ার মানুষের সামনে দেখানো হবে যদি ঘোষণা করা হয়, তা হলে সেই চিরন্তন মানুষটির রূপ দেখে দুনিয়ার মানুষেরা হয়তো হাসবে, টিটকারী করে হয়তো বলতে চাইবে যে, এই মানুষটিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। আরো হয়তো বলতে পারে, আমাদের মধ্যে এর চেয়েও শত রূপে অনেক মানুষ আছে। হা, তাদের জন্মের রোগের হলুদ চোখে তাই দেখবে। কারণ, তারা রূপ বলতে চামড়া আর মুখের আকৃতি দিয়ে বিচার করবে, আর গুণ বলতে মালপানি, নেত্ৰ, বড় বড় ডিম্বাধারীদের দিয়ে বিচার করবে। এই রকম বিচার দেখে চিরন্তন জীবনের উপহার পেয়ে যারা পারে কামেল তারা চপ করেই থাকেন। কারণ তাদের বুঝার অনেক কিছু থাকলেও বলতে চান না, অথবা জানেন যে, যত সুন্দর করেই বুঝিয়ে বলি না কেন, তারা বুঝতে চাইবে না। কেন? এটা যে তাদের তকদিরের লিখন। চামড়া আর আকৃতির রূপ দিয়ে কিন্তু এরাই আবার তাদের বিষয়ে তরাই বিচার করে না। এটা শুনে হয়তো অবাক হচ্ছেন, তাই না? তারা ভাল করেই জানে যে, কোকিলকণ্ঠী লতা মুস্কেশকর এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানগুলো শুনতে কত মধুর, অথচ তত মধুর কি তাদের চেহারা-স্বরত দেখতে? তারা এটা ভাল করেই জানে যে, কেবল গানের বেলায় নয়, যে কোন বিষয়ের বেলায় এরকম বিরাট গভীর্ণতা বার বার দেখতে পাচ্ছে, অথচ চিরন্তন জীবনের উপহার পাওয়া পারে কামেলদেরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কেন? তকদিরের লিখন। 'তকদির বদলায় না', কিন্তু তখনই বদলাতে পারে যদি এই চিরন্তন জীবন পাওয়া পীর-ফকিরেরা দোয়া করেন, তথা নেক নজর দান করেন, তথা ফুয়েজ দান করেন, তথা যখন কেউ মরিদ হয়ে তার কথা মত কাজ করেন, তথা তাকে ধ্যান করেন, তার চোখ, মুখ, হাত, পা, সবকিছু মনে মনে ধ্যান করেন, আমার মধ্যেই তিনি, আমি দেখছি না, তিনি দেখছেন, আমি শুনছি না, তিনি শুনছেন, আমি খাই না, তিনি খাচ্ছেন, আমি চলি না, তিনি চলছেন, আমি ঘুমাছি না, তিনি ঘুমাচ্ছেন, আমি হাসছি না, তিনি হাসছেন, আমি কাঁদছি না, তিনি কাঁদছেন, আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছি না, তিনি দিচ্ছেন, আমি দুঃখ পাচ্ছি না, তিনি দুঃখ পাচ্ছেন, আমাকে মারছে না, তাকে মারছে, আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে না, তাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে এভাবে প্রতিটি কাজে-কর্মে চলা-ফেরায়, আচার-ব্যবহারে যখন তার ধ্যান করতে করতে আপনি আর আপনার মধ্যে থাকবেন না, সম্পূর্ণ তিনি হয়ে যাবেন, তখনই আপনি সম্পূর্ণরূপে থাকবেন, তথা তার মত চিরন্তন জীবন পেয়ে আপনিও পারে কামেল হয়ে যাবেন এবং এই পারে কামেল হওয়াটা আপনার তকদিরের সবচাইতে বড় পাওয়া। এই ধ্যানের নামই বৈরাগ্য সাধন। বৈরাগ্য সাধনের শেষ পর্বটিই হল মুক্তি। চক্রাকারে আগমনের পরিব্রাণ হল এর নাম। এই

ধ্যান কর্মের মাঝে নিয়োজিত থেকেও করা যায়, সংসার জীবন পালন করেও করা যায়, আবার সংসার জীবন পালন না করেও করা যায়। ঘর ছেড়ে দিতে পারলেই বৈরাগ্য হয় না, আমার এই ‘আমি আমি’ ভাবটি ত্যাগ করতে পারলেই হয় বৈরাগ্য। ‘সংসারধর্ম ত্যাগ করলেই হবে’ এরকম কথা ইসলামে বলা হয়নি। ত্যাগ করা না করা যার যার নিজস্ব বিষয়। এখানে বাধ্যবাধকতা নেই। বাধ্য যারা করতে বলেন এটা তাদের নিজেদের বানানো আইন। ইহা কখনোই ইসলামের আইন নয়। কারণ ইসলামে বলপ্রয়োগ নেই। বাহির এবং ভেতর উভয় দিকের একটিতেও বলপ্রয়োগ একদম মানা করে দেওয়া হয়েছে। চিরন্তন জীবন পাবার সোভাগ্য যাদের হয়েছে তাদেরকে আবার অলী, আবদাল, কতুব, মজুব, মাস্তান, দরবেশ, পারি, ফকির, মুনি, খাম্বি, মোমিন ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। এরা সবাই মিলে এক, আবার একই হয় বহু। অনেকটা একের মাঝে দশ, আবার দশের মাঝে এক। এক ক্যাসেটের কথা ও গান দিয়ে অনেক ক্যাসেট বানানো যায়। বহু হলে কি হবে, মূলে একই কথা ও গান। এই মারফতের গোপন আল্যুপটি যিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে, কোরানে কেন আল্লাহ একবার আমি বলেছেন আবার আমরা বলেছেন। সবখানেই যদি আমরা শব্দটি ব্যবহার করা হতো তা হলে না হয় মনে করতাম যে এটা কোরানের একটি বাচনিক স্টাইল, কিন্তু একবার আমি আবার আমরা এ কেমন কথা? তাও আবার কয়টি বিশেষ বিশেষ বিষয় বলার সময় তিনি আমরা রূপে বলেন, আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমি বলেছেন।

আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে আলোচনা

এই অলীরা কিছু কখনোই মারা যায় না। কোরানে আল্লাহ যেমন ঘোষণা করেছেন, তেমনি আবার মহানবীও ঘোষণা করেছেন এই বলে যে, ইন্না আওলিয়া আল্লাহি লা ইয়া মৃতু অর্থাৎ ‘অলীরা কখনোই মারা যায় না’। সুরা কাহাফের সাতজন অলীর তিনশত নয় বছর না খেয়ে পর্বতের একটি গুহায় গুয়ে থাকার কথা অবশ্যই আপনার জ্ঞানা থাকার কথা। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানীদেরকে প্রশ্ন করে দেখুন না যে, মানুষ কতদিন না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে? বৈজ্ঞানিকদের

খাসা উত্তরখানা পাবার পরই আপনার হুঁশ আসবে। সত্যিই তো, এত বছর, তিনশত বছরের যুগ পেরিয়ে গেল একদম না খেয়ে অথচ তারা জীবিত ছিলেন। এটা তো হাদিসের কথা নয় যে দাঁত খিচুনি একটা মেরে দেব। মন-মগজের হিসাবে না মিললেই যত বড় সহি হাদিসই হোক না কেন, থাপ্পড় একখানা মেরে দেব। কিন্তু এটা যে স্বয়ং কোরানের কথা। এটা ফেলতে গেলে তো সরাসরি কাকের হয়ে যাব। তাহলে? তকদির খারাপ হলে গোঁজামিলের গবেষণা চলতে থাকবে আপনার মন-মগজে। গবেষণার লেবরেটরি হতে হয়তো এমন একখানা খাসা চিঙ্ক আবিষ্কার হতে পারে, যার দ্বারা সাপও মারা হবে আবার লাঠিও ভাঙবে না।

আবার যদি প্রশ্ন করি যে, তিনশত নয় বছর পাহাড়ের গুহাতে ঘুমিয়ে ছিলেন, কিন্তু এত বছরে তো মাটির দেহগুলোকে খেয়ে ফেলার কথা। মাটিও তো এত শত বছরে দেহগুলো খেতে পারলো না। তাহলে? আর কত গোঁজামিল দিয়ে মনের শান্তি দেবেন? আপনার মন আর বিবেকের মধ্যে কি তাহলে মারাত্মক তালা বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে?

আবার যদি প্রশ্ন করি, এত শত বছর পর ঘুম হতে চট করে উঠেই বাজারে গেল কেমন করে? মাত্র হাতে গোনা ক'টা দিন আধ পেট খেয়ে শুয়ে থাকার পর উঠে হাঁটতে চাইলে দু'তিন জনকে ধরে উঠাতে হয়, তারপর হা-হ করে কত ডিজাইনের কোঁকানীর আওয়াজ শুনতে হয়, আর এই সাতজন সাহাবা তিনশত নয় বছর একটানা ঘুমিয়ে থাকার পর যখন ঘুম ভাঙলো, সঙ্গে সঙ্গে উঠেই এটা সেটা বলাবলি করে একদম সুস্থ শরীরে বাজারে দিব্যি হেঁটে চললো। এটার কী

গোঁজামিল মেরে দেবার ফন্দি বের করবেন? আপনার তকদির যদি আপনাকে ফন্দি বানাবার রাজা বানিয়ে রাখে তাহলে তো পারবেনই। বোম্বাই ফিল্মের হাঁপানি রোগী লাকড়ির মত শরীরটা নিয়েও অমিতাভ বচ্চন সাহেব ডজন ডজন হোমরা চোমড়া পালোয়ানকে যেন থাম্পড় দিয়ে মাছি মারার মত চুস্তা মার্কা দৃশ্য দেখে সাবাস সাবাস বলে চিৎকার করে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনার এমন ডিজাইনের তকদিরকে হাজারবার ধন্যবাদ জানাই, আর আল্লাহ পাক যে এমন আজব তকদিরও বানাতে পারেন তার জন্য তাঁর পাক দরবারে জানাই হাজার শুকরিয়া।

আল্লাহর অলীরা যে মারা যান না, মৃত নন, তার জ্বলন্ত নমুনা হল সুরা কাহাফের কয়েকজন অলী। যারা তিনশত নয় বছর না খেয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। আরো মজার কথা হল, এঁরা কিছু একজনও নবী ছিলেন না। নবীর কথা যদি এখানে উঠতো তাহলে হযরত ইউনুস (আঃ) নবীর কথা তুলে ধরতাম। তুলে ধরতাম এই বলে যে, একটা মানুষ দশ-পনের হাত পানির নিচে ডুব দিতে গেলে কান পটপট করে, সেখানে কয়েক হাজার হাত পানির নিচে হযরত ইউনুস নবী চল্লিশ দিন থাকলেন। তাও আবার মাছের পেটে এবং অক্সিজেনের বাক্স নেবার তো প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং হযরত ইউনুস নবী যদিও আমাদের মত মানুষ কিছু আসলে আমাদের মত মোটেও নন। আমাদের মত পিতা-মাতার নিয়মেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, আমাদের মত লালন-পালনেই বড় হয়েছেন, অথচ আমাদের মত মোটেই নন। ‘আমাদের মত’ মনে করাটাই একটা চিকন প্রতারণার ফাঁদে পা রাখা। বিভ্রান্তির ঘোলা জলে দিশেহারা হয়ে যাবার তকদিরের খেলা। এ খেলা

যাদের কপালে নাচবে তারা কী করে মারফত বুঝতে পারবে? তাদেরকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে খাজা বাবা বার বার উপদেশ দিয়েছেন।

নবীদের বিষয় নিয়ে আলোচনা এখানে করার কথাই উঠে না। কারণ কোরানের যে কয়টি আয়াত নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে অলীদের কথা বলা হয়েছে। তাই অলীদের কথায় আবার ফিরে আসছি।

জ্ঞান ও বিদ্যার বিষয়ে আলোচনা

প্রথমেই ভাল করে জেনে রাখতে হবে যে, কোরানের একটি আয়াতেও অস্ত্রের যুদ্ধকে 'জেহাদে আকবর' বলা হয়নি। অস্ত্রের যুদ্ধকে অনেকবার অনেক পরিবেশে মহানবী 'জেহাদে সগীর' তথা ছোট জেহাদ বলে ঘোষণা করেই সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জেহাদে আকবর কী এবং কাকে বুঝানো হয়েছে। এই বিষয়টি চিকন, সূক্ষ্ম তাই ডাইলে-চাইলে মিলে খিচুড়ি করার সম্ভাবনা আছে বলেই মহানবী বারবার সাহাবাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। কারণ, কাফেরদের আক্রমণকে প্রতিহত করাটাকে স্থায়ী জেহাদ বলা হয়নি। এরকম আক্রমণকে প্রতিহত করাটা হল সাময়িক জেহাদ। সময়ের প্রয়োজনে কখনো ইঁহা ঘটতে পারে, আবার অন্য সময়ে তা ঘটে না।

আবার আরো একটি যুদ্ধ আছে। সেই যুদ্ধটির নাম হল কলম্বের যুদ্ধ। এই কলম্বের যুদ্ধকে জেহাদ বলা যায় কিনা তা বিজ্ঞ আলেম সমাজই বিচার করে দেখবেন। তবে কলম্বের যুদ্ধ যে এই বিংশ শতাব্দীতে কত বড় মারাত্মক যুদ্ধ তা

আজকের যুগের মানুষেরা হাড়ে হাড়ে টের পায়। কাল মার্কস, ডারউইন সাহেবদের কলমের বোবা যুদ্ধ যে কত কোটি কোটি মানুষের মগজকে একদম ওয়াশ করে দিতে পারছে তার উদাহরণ তুলে ধরাটা পাগলামিই মনে করি। যেন প্রতিটি কলমের লাইন এক একটি ধারালো ছুরির মারাত্মক আঘাত হানে, কিন্তু সেই আঘাত দেখা যায় না, যেমন জাহান্নামের আগুন দেখা যায় না, অথচ কী ভয়ঙ্কর বোবা জ্বালা যে, আপন গলায় দড়ি বুলিয়ে, নয়তো বিষপান করে মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি পেতে চায়।

‘শহিদের রক্ত হতে জ্ঞানীর কলমের কালি অধিকতর পবিত্র’ বলে যে হাদিসটি পাই সেই হাদিসটির প্রতি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা ও গবেষণা করে দেখুন তো, সেখানে এরকম কথার ব্যবহার করা হয়েছে কিনা? কারণ ধর্মযুদ্ধে আক্রমণকারীরূপে তো হতেই পারে না, বরং আক্রমণ প্রতিহত করার প্রশ্নে অস্ত্রযুদ্ধে যারা নিহত হন তাদেরকে ‘জেহাদে আকবরের’ মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এই রকম আক্রমণকে প্রতিহত করতে গিয়ে যারা নিহত হন তারা শহিদ এবং তাদের মর্যাদা অনেক। কিন্তু জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদের রক্ত হতেও পবিত্র। এখন প্রশ্ন হল, জ্ঞান বলতে কী বুঝায়? জ্ঞান কত প্রকার এবং সেই প্রকারগুলোর গুণাগুণ কি অনেক প্রকার? না একই রকম? সেই জ্ঞান কি আপেক্ষিক? না চিরন্তন? আপেক্ষিক যদি বলা হয় তাহলে সেই জ্ঞান কত দিনের জন্য? সেই জ্ঞান কি স্থির না চলমান? সেই জ্ঞান কি অসীম না সীমাবদ্ধ? অসীম হলে কী রকম অসীম? আর সীমাবদ্ধ হলেই বা তার সীমার পরিধি কত বড়? সেই জ্ঞান কি বহুভিত্তিক? যদি বহুভিত্তিক জ্ঞান হয় তাহলে কি খেমে থাকে? যদি খেমে না থাকে তবে কি প্রাথমিক বহুভিত্তিক জ্ঞান

গবেষণার মাধ্যমে নূতন নূতন রূপ ও গুণ নিয়ে কি এগিয়ে যাচ্ছে? এই এগিয়ে যাওয়ার কি শেষ আছে? বিদ্যা বলতে কী বুঝায়? বিদ্যা ও জ্ঞানের মধ্যে কী পার্থক্য আছে? বিদ্যার আসল চরিত্র কি দলিল লেখকদের ডেপারী হতে উন্নতমানের ডেপারী? বিদ্যা অর্জন করা আর জ্ঞান অর্জন করা কি একই কথা? এরকম ভাবে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়। অনেক প্রশ্নের অনেক উত্তর অনেক মানুষ দিয়ে যায় নির্দিষ্ট তকদিরের বন্ধনে থেকে। যে আত্মা দেখা যায় না, অর্থাৎ চোখে দেখা যায় না, সেই আত্মাকে ভিত্তি করে যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের নাম হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এই জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মাকে চেনা যায়, জানা যায়। তাই এই চেনা ও জানার আর এক নাম হল নিজেকে চেনা ও জানা। যারা আত্মাকে চেনা ও জানার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন তারাই আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়েছেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় কতল হতে পেরেছেন তাঁরা চিরজীবিত। তাঁরা আমাদের মত মৃত নয়। তাই কোরানের মাত্র এই দুটি আয়াতে আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে মৃত তো বলতেই পারবো না বরং মৃত বলে চিন্তা করতেও একদম মানা করে দেওয়া হয়েছে। বলা এবং চিন্তা করা দুটোই একত্রে কোরান ধর্মক দিয়ে নিষেধ করেছে।

কবর ও মাজারের মাঝে প্রভেদ

এখন প্রশ্ন হল, যারা জীবিত তাদের তো কবর হতেই পারে না। কবর তো কেবল মৃতদের জন্য। যারা মারা যায় তাদের জন্য কবর। জীবিত যারা তাদের কী করে কবর হতে পারে? তা হলে এই জীবিতদের যে মাটির গর্তে রাখা হয় সেই গর্তকে

কবর বললেও ইহা সাধারণ কবর নয়। ইহা অসাধারণ। কারণ এরা মারা যান নি। এরা তো মরার আগেই মারা গেছেন। তাই পুনরায় কী করে মারা যেতে পারেন? কারণ কোরান বলছে যে, মৃত্যুর স্বাদ মাত্র একবারই গ্রহণ করতে হয়। দুইবার নয়। খুব ভাল করে লক্ষ্য করুন, যেখানে মৃত্যুর মজা একবারই গ্রহণ করতে হবে বলে কোরান ঘোষণা করেছে এবং এরা মরার আগেই মারা গেছেন, তাহলে আবার কী করে মারা যায়? একটি মানুষ দুইবার মরে না, এটা যে কেউ জানে। তাহলে যারা একবার জীবিত থেকেই মারা গেছেন তারা আবার কী করে মারা যায়? যায় না। তা হলে এই জীবিতদের কবর হয় কী করে? যদি হয় তাহলে সেই কবরগুলো অসাধারণ কবর। অসাধারণ কবরকেই মাজার অথবা রওজা বলা হয়। এই অসাধারণ কবরগুলোকে বিশেষ মর্যাদা অবশ্যই দিতে হবে, কারণ এরা জীবিত। বিশেষ মর্যাদা এবং সম্মান দিতে হলে এই জীবিতদের কবরগুলোর উপর গিলাপ দিয়ে ঢাকতে হবে। ঘর বানাতে হবে। অনেক প্রকার সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষেরা যাতে বুঝতে পারে যে, এরা জীবিত। এদেরকে জীবিত অবস্থায় দাফন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে যারা কবর পূজা মনে করতে চায় তারা কোরানের কিছুই বুঝতে পারেনি। কেবল কোরান মুখস্থ এবং ভাসা ভাসা অর্থ জানলেই কোরান বুঝা হয় না। এত সহজ কোরান নয়। যেখানে বড় বড় জ্ঞানীপণ্ডিতের বই-পুস্তক বুঝতে হিম্মশিম্ম খেতে হয় সেখানে আসমান-জমিনের সব কিছুর মালিকের রহস্যময় বাণীগুলো বুঝা কতটুকু কষ্টকর বিষয় হতে পারে? একবার নিজের মন ও বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন তো।

আজ একটি আজব কথা শোনাব। সেটা হল, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোরানের একটিও তফসীর নেই। অবাক হচ্ছেন, তাই না? আমাদের কথায় সীমিত বুদ্ধি বিদ্রোহ করতে চায়। কিন্তু খোদার কসম, কোরানের একটিও তফসীর আজ পর্যন্ত হয় নি, আর কোনকালে হবে বলেও তো মনে হয় না। একটিও যে কোরানের তফসীর হয়নি তার নমুনা কোরানের সর্বপ্রথমেই আপনি পেয়ে যাবেন এবং পাবার পর আমার কথা যে ঠিক তা আপনিও মেনে নেবেন। আলিফ, লাম, মিম, জালেকাল কেতাব কোরানের কেবলমাত্র এটুকুরই অর্থ আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেন নি। শুনলে আরো অবাক হবেন যে, জালেকার ব্যাংলা অর্থ হল এটি। এখন আসুন, হবই অনুবাদ করে দেখি কী অর্থ হয়। 'আলিফ, লাম, মিম, এটাই কেতাব' এখানে এইটি তথা হাজ্জাল (দিস ইজ্জ) বলা হয়নি। বলা হয়েছে জালেকাল (দ্যাট ইজ্জ)। তাহলে কেতাব বলতে কোনটিকে বুঝানো হয়েছে? আলিফ, লাম মিমই হল কেতাব। এখন এই তিনটি অক্ষরকেই যেখানে কেতাব বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে এই তিনটি অক্ষরের মধ্যে কী রহস্য লুকিয়ে আছে তার আজও কেউ সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। তাহলে কোরান তফসীর করতে গিয়ে বিসমিল্লাহতেই আপনার মাথায় চক্কর দেওয়া শুরু হয়ে যাবে। তখন একটা কিছু গোজাম্মার কথা মনে সাজাতে হবে। যে গোজাম্মার কথা মনে পাঠকদের

উপহার দিচ্ছেন, সত্যি বলতে কি, সেই কথাগুলোর উপর আপনারই মন ও বিবেক বার বার অনাস্থা প্রকাশ করবে। কোরানের এরকম বেশ কিছু সুরাতে অন্ধুর বসানো আছে যার অর্থ আজও কেউ করতে পারেনি। তবে, হ্যাঁ, যারা পারেন তারাই আল্লাহর অলী, তারাই কামেলত এবং তারাই পরি-মুর্শেদ হবার একমাত্র যোগ্যতার দাবীদার এবং তারাই জ্ঞানী। অথচ চান্দা ব্যাটারীর মত কত নকল মালকে যে আসল মাল বলে ধোকা খাই সেটাও কি বলে দিতে হবে? আসলে, নকল মাল যদি কিনেই ফেলি আর সেই নকলটাকেই আসল মনে করে মনে শান্তি পাই, তাহলে কাকে দোষ দেবেন? দোষ দেবার পথ অবশ্যই খোলা আছে, আর সেই পথটার নাম হল তকদির। তকদিরে যা লিখা আছে সেটা তো নিজের কপালে নাচবেই। তা যত বেদনাদায়কই হোক না কেন। হাসতে হাসতে বাড়ি হতে পথে বেরুবার পরই যে সহসা জীবনটা চলে যেতে পারে, এটা কি কেউ আগেই জানতে পারে? পারে না। এই পারে না-টাকেই বলে তকদিরের লিখন। এই নিশ্চিত তকদিরের লিখনটাও যারা বদলিয়ে দিতে পারেন, তারাই অলীয়ে কামেল। আবার এই অলীয়ে কামেলদের চেয়েও অনেক উচু স্তরে যারা আছেন তাদেরকে কোরান 'আবদুহ' বলে ঘোষণা করেছেন। সূরা কাহাফে হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত খিজিরের (?) যে ঘটনার উল্লেখ আছে সেখানে কি হযরত খিজিরের (আঃ) নামটি বলা হয়েছে? একবারও বলা হয় নি। অথচ ফস করে খিজিরের নামখানা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোরানে বলা হয়েছে 'আবদুহ'। আবদুহকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা যায় আল্লাহর বিশেষ দাস বলে। অবশ্য খিজির নামটি হাদিসে পাওয়া যায়। খিজির অর্থ হল চিরসবুজ। 'চিরসবুজ' কি কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম না সার্বজনীন বিশেষণ?

বাংলাদেশের আবদুহ কে হতে পারেন এই বিষয়টি জানবার খুবই আগ্রহ ছিল অধম লিখকের। অবশেষে বেশ কিছুদিন পর যাকে আবদুহ বলে জানতে পারলাম তার নাম মাওলানা সোলায়মান শহী ওরফে লেখটা বাবী। উনার মাজার শরিফ চাঁদপুর জিলার মতলব উপজিলার বেলতলীতে। একজন আবদুহর শান, মান ও জালুয়া কত উচুতে তা জানলেও লিখতে পারবো না। কেবল আবদুহর শান কতটুকু হতে পারে তা সূরা কাহাফ পড়েই কিছুটা বুঝতে পারবেন বলে আশা করি। অরিও আশা করি যে, জ্ঞানী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে সে বিষয়টি ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছেন। যাদেরকে জীবিত অবস্থায় দাফন করা হয়েছে তারাই জিন্দাপীর। তাদের কবরকে যারা কবরপূজা বলে তারা কোরান-হাদিসের কিছুই বুঝতে পারেনি। দুই কলম আরবি জ্ঞানলেই কোরানের ব্যাখ্যা লিখা যায় না। লিখতে গেলেই লাগে যত গুণ্ডগোল। এই গুণ্ডগোলের অনেক খেসারত দিতে হয়েছে সাধারণ সরল প্রাণের মুসলমানদের। বিভ্রান্তির অতল তলে তুলিয়ে যেতে হয়েছে বহু মুসলমানকে। কোরানের অখাদ্য-মাকী ব্যাখ্যা তথা তফসীর পড়ে সত্যকে গ্রহণ করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পারেনি বহু মুসলমান। আরবি ভাষায় সম্পূর্ণ

অঙ্ক ব্যক্তিটিও সমগ্র কোরান মুখস্থ করতে পারে। এমনকি জন্মান্তর অনেক আছে যারা কোরান মুখস্থ করেছে। তাই বলে কি তারা কোরানের অর্থ তো দূরের কথা অনুবাদও কি করতে পারবে? গাধার পিঠেই চিনির বুস্তা, অথচ চিনি খেতে কেমন তা গাধা জানে না। এরকম উদাহরণ কি কোরানে নেই?

সর্বক্লমতার একমাত্র যিনি মালিক সেই আল্লাহর কলাম্ব কতখানি গভীর এবং বিজ্ঞানময় হতে পারে তার সামান্য নমুনা যদি আপনি বুঝতে চান, দেখতে চান, চমকে যেতে চান, আশ্চর্য কিছু দেখার মত হা করে থতমত খেতে চান তাহলে? তাহলে খোদার কসম খেয়ে বলছি, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতগুলো কোরানের তফসীর তথা ব্যাখ্যা হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরখানি আপনি পড়ে দেখুন। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ কোরানের তফসীরটি কে করেছেন? যিনি করেছেন সেই মহান মহাপুরুষটির নাম হল মুফতি ইয়ার আহমদ খান। যাকে হাকিমুল উম্মত টাইটেল দেওয়া হয়েছে। আরো একজন মাওলানা হাকিমুল উম্মত টাইটেল পেয়েছেন, কিন্তু সেই টাইটেল কোন সূন্নি আলেম দেননি। ওহাবিরা সেই টাইটেলখানা দিয়েছে। আমি তার নাম উল্লেখ করলাম না। কারণ আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন। যা হোক, সেই বিখ্যাত কোরানের তফসীরটির নাম হল তফসীরে নস্‌মী। পনের খণ্ডে উর্দু ভাষায় লিখা হয়েছে এবং চটুগ্রামে কিনতে পাওয়া যায়। এই বিশাল তফসীরটি যদি আপনার পড়ার সৌভাগ্য হয় তা হলে কিছুটা বুঝতে পারবেন যে, কোরান কতখানি গভীর। আবার যদি প্রশ্ন করেন, এই কোরানের তফসীরটি তো উর্দু ভাষায় লিখা হয়েছে, তা হলে এর বাংলা অনুবাদ কেন করা হল না? এর দুটো কারণ হতে পারে। একটি কারণ হল, ওহাবি এবং গোলাবি ওহাবিরা এই তফসীরে নস্‌মী-কে আজরাইল দেখার মত ভয় করে, আর অপর কারণটি হল, যারা আসল সূন্নি তাদের পক্ষে এত বড় বিশাল পনের খণ্ডের বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশ করার মত অর্থ কোথায়? কারণ ওহাবি এবং গোলাবি ওহাবিরা যেভাবে সংঘবদ্ধ তার শত ভাগের একভাগ সংঘবদ্ধ আজও সূন্নিরা হতে পারেন নি। ইহা বেদনাদায়ক হলেও সত্য কথা। তবে হালে সূন্নিরা একটি সংগঠনের প্রয়োজন আছে বলে এগিয়ে চলেছে।

সাধারণ যারা তারাই তো মারা যায়। তারাই তো মৃত। তাদের জন্যই তো কবর এবং এই রকম কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একটা বোকা মানুষও কিছু চায় না। কারণ সেই বোকাটিও জানে যে, এই মরা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু চাওয়া আর না চাওয়া একই কথা। সামান্য একটা নমুনা তলে ধরছি। হাইকোর্টের জিন্দা কবরে যিনি জিন্দা অবস্থায় গুয়ে আছেন তার কাছে প্রতিদিন কত মানুষের আনাগোনা। অথচ সরকারি পয়সায় বানানো সামান্য কিছু দূরেই তিন নেতার কবরে কি একটি মানুষও কিছু চাইতে আসে? ভাল করে জানি যে, এখানে চাওয়া মানে কপালে মার্কচুও মিলবে না। নেতা হিসেবে শ্রদ্ধা জানায়, কিন্তু শ্রদ্ধা জানানো এবং কিছু চাওয়ার মধ্যে তফাত হল আকাশ-পাতাল।

বার বার আমি ওহাবি এবং গোলাবি ওহাবিদের কথা বলি। কিন্তু তাদের আসল পরিচয় যদি জানতে চান তা হলে শুদ্ধেয় মাওলানা বেদোয়ানুল ইসলাম সাহেবের বাংলা ভাষায় রচিত অহাবী পরিচয় নামক বইটি পড়ুন। সব গোমড় ফাস করে দিয়েছেন।

যাদেরকে কোরানের ভাষায় মৃত বলিও না এবং মৃত বলে চিহ্নাও করো না, সেই জীবিতদের জীবিত অবস্থায় যে সব কবরে রাখা হয়েছে সেই সমস্ত কবরগুলোকে অন্য দশজন আমাদের মত মানুষদের কবরের সঙ্গে যাতে মিলিয়ে না ফেলি, যাতে তুলনা না করি, যাতে একরকম মনে না করি তার জন্য কবর নাম না দিয়ে বিশেষ সম্মানের সহিত বলা হয় রওজা অথবা মাজার। তবে হালে দুনিয়াদার নেতাদের কবরগুলোকে এখন মাজার খেতাবখানা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য এই ভুলটি ইচ্ছাকৃত নয়। কারণ অনেকেই এই বিষয়টি জানে না। এই রওজা অথবা মাজারের উপর অবশ্যই দামী গিলাপ বিড়িয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। আগরবাতি, গোলাপজল, ফুল, সুগন্ধি, খাট ইত্যাদি নানারকম সাজে সাজানো অবশ্য কর্তব্য। কারণ তারা যে জীবিত শুয়ে আছেন। খবরদার, মৃত বলে চিহ্না করার অধিকার কোরান দেয়নি। মৃত বলে চিহ্না করলেই মহাপাপ। কারণ কোরানকে অস্বীকার করা হচ্ছে। আর কোরানকে অস্বীকার করার অর্থ হল কাফের। এখন ভেবে দেখুন, ওহাবি এবং গোলাবি ওহাবিদের তকদিরের লিখন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুঁবিগ্ন কাবাঘরে কেন গেলাপ চড়ানো হয়? আল্লাহর ঘরের চারিদিকে কেন দামী গেলাপ চড়ানো হয়েছে? গেলাপ যদি কাবাঘরে না দেওয়া হয় তাহলে কাবার কিছুই যায় আসে না। গেলাপ থাকলেও কাবা আল্লাহর ঘর, আবার গেলাপ না থাকলেও কাবা আল্লাহর ঘর। কিন্তু কাবাঘরে এজন্যই গেলাপ চড়ানো হয় যে, কাবা মসজিদুল হারাম। অর্থাৎ কাবা এবং মসজিদ দুটোকেই বুঝানো হয়। আমরা যাতে দুনিয়ার অন্যান্য মসজিদের মত একই মনে করে না বসি তার জন্য কাবাঘরে গেলাপ চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাবাঘরের এ গেলাপ চোখে দেখলেই যাতে আমাদের বিবেক ও মন বুঝতে পারে যে, ইহা মসজিদ এবং কাবাও। কারণ দুনিয়ার বহু মসজিদের সঙ্গে কাবাকে থাকতে হয়। আমরা যাতে দুনিয়ার অন্যান্য মসজিদের মত মনে করে বিরাট ভুল না করে বসি তার জন্য কাবাঘরের চারিদিকে দামী গেলাপ চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাবার এই গেলাপ কিন্তু কাবার জন্য দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়েছে আমাদের জন্য। আমরা যেন দুনিয়ার অন্যান্য মসজিদের মত সাধারণ মসজিদ বলে মনে না করি তার জন্য এই গেলাপ দেওয়া হয়েছে। এই গেলাপ দেখতে পেলেই আমাদের মন ও বিবেক বুঝতে পারবে যে, এটা কাবাঘর। কাবাঘরের প্রয়োজনে গেলাপ দেওয়া হয় না। গেলাপ দেওয়া হয় আমাদের মন ও বিবেককে মনে করিয়ে দেবার জন্য।

কোরান শরীফের উপর কেন গেলাপ দেওয়া হয়? কোরানের উপর গেলাপ দিলেও কোরান কোরানই, আবার গেলাপ না দিলেও তাই। কোরানের উপর এজন্যই গেলাপ দেওয়া কর্তব্য যে, এই পবিত্র কোরান দুনিয়ার অনেক রকম বইয়ের সঙ্গে রাখতে হয়। গেলাপ কোরানের উপর ঢেকে দিলে মানুষের মন-বিবেক সাবধান হয়ে যাবে। কারণ কোরান নাপাক অবস্থায় স্পর্শ করা উচিত নয়। গেলাপ থাকলেই সহজে বুঝা যাবে যে, এটা পবিত্র কোরান। নাপাক অবস্থায় স্পর্শ করা যাবে না। তাই এই গেলাপ কোরানের জন্য নয়, বরং যারা কোরান পড়বে তাদের জন্য। তাদের মন ও বিবেককে সাবধান করে দেওয়ার জন্য এই গেলাপ। তাছাড়া এই গেলাপ দুনিয়ার অন্যান্য বই-পুস্তক হতে কোরানের যে আলাদা মর্যাদা আছে তা বুঝিয়ে দেয়। মানুষ যেন দুনিয়ার অন্যান্য বই-পুস্তকের মত কোরানকে মনে না করতে পারে তার জন্য কোরানের উপর গেলাপ দিয়ে ঢেকে রাখার সুন্দর ব্যবস্থা। সুতরাং গেলাপটি দেওয়া হয় মানুষের মন ও বিবেককে সাবধান করে দেবার জন্য। কোরানের জন্য নয়। কবরার জন্য নয়। যারা কখনোই মারা যান না, যারা সব সময় জীবিত, যারা গর্ত নামক কবরে জিন্দা থেকেও আল্লাহর আশেকদেরকে দেখা দিতে পারেন, যারা যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে, যে কোন আল্লাহর প্রেমিককে দেখা দিতে পারেন, তাদের কবর তো অসাধারণ কবর। অসাধারণ মর্যাদার অধিকার বহন করে সেই অসাধারণ জিন্দা কবর। সুতরাং এই জিন্দা কবরের উপর অবশ্যই গেলাপ দিতে হবে এজন্য যে, সাধারণ মানুষ যেন সাধারণ মরা মানুষের কবর মনে করে বিরাট ভুল করে না বসে। এই ভুল করা হতে সাধারণকে মুক্তি দেবার জন্যই দাম্মা গেলাপ চাড়িয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কারণ এই গেলাপ দেখলেই সাধারণ মানুষ মনে করবে যে, এটা জিন্দা কবর। কারণ কবর দেখলেই আমরা মনে করি মৃত। সুতরাং জিন্দা কবর দেখেও যাতে মৃত মনে না করে তার অনেক রকম ব্যবস্থা নেওয়া কর্তব্য। কারণ জিন্দা কবরকে মৃত বলে চিন্তা করামাত্রই কোরানকে অস্বীকার করা হচ্ছে। বলেছে, ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাজিনা অর্থাৎ 'এবং না, তাদেরকে চিন্তা করোনা, আমোয়াতো অর্থাৎ 'মারা গেছেন'। সুতরাং যারা জীবিত তাদের কবর হয় কী করে? ঐ গর্তগুলো তো জীবিত কবর। এরা যে কোন সময় যখন ইচ্ছা দেখা দিতে পারেন এবং অহরহ দেখা দিয়ে থাকেন। এরা রবের নিকট থেকে বিশেষ রেজেক পাইতেছে। এই রেজেক পাবার কুখ্যাতি ঘোষণার দ্বারা আরো অধিক নিশ্চিত করে দেওয়া হল যে, কোন অবস্থাতেই তারা মৃত নন। মৃত যারা তাদের রেজেক পাবার প্রশ্নই উঠে না। তাই 'রেজেক পাচ্ছে' শব্দটির দ্বারা তারা যে অবধারিতভাবে জীবিত আছেন সেই বিষয়টিকে একদম পরিষ্কার করে কোরান আমাদেরকে বুঝিয়ে দিল। সুতরাং যারা জীবিত, যারা রাতিন্ত রবের নিকট হতে রেজেক পাচ্ছেন, তাদেরকে কী করে মরা মানুষের মত ভাবা যায়? সুতরাং জিন্দা কবরকে বিশেষ ভাবে হেফাজত করতে হবে। হেফাজত করার দায়িত্ব না নিলে সাধারণ

মানুষ মৃত বলে মনে করতে পারে। সুতরাং জিন্দা কবরের সামনে অতি তাজিমের সঙ্গে দেখা করা কর্তব্য এবং পায়ের সামনে চুপন দেওয়া কর্তব্য। মনে রাখতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই যেন বেয়াদবি না হয়। কারণ তারা জীবিত এবং আল্লাহর বিশেষ রেজেক পাচ্ছেন, যা আমরা চিন্তাই করতে পারছি না। বস্তুর বিজ্ঞানের সাধারণ একটা টেলিভিশনে কেমন করে ছবি আসতে পারে, তাও আবার সাদা-কালো নয়, কেমন করে সেই ছবিগুলো কথা বলে, গান করে, নাচে-কাদে, এগুলোই বুঝতে গেলে সাধারণ মানুষেরা বোকার মত হা করে থাকিয়ে থাকে, আর

যিনি সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক, তাঁর শক্তি, শান এবং জালুয়া কি কল্পনা করা যায়? সাধারণ তো দূরের কথা, বড় বড় বিজ্ঞানীরা আসমানের ভেতর কত কি আছে বলে জানায়, যা মন অবিশ্বাস করতে চাইলেও তিতা ঠষধ সেবন করার মত মাথা নিচু করে হজম করতে হয়। এই বিজ্ঞানীদের চড়-খাল্লড় খেতে খেতেই আমরা মহাবাণী কোরানের সত্যতা অনেকখানি বুঝতে পারছি। অধম লিখকের মত টুইনার হটাক মগজে কেবল ফউতাই মাইরা গেলাম। এই ফউতার পাহাড় সরিয়ে সত্যকে টেনে তোলা যে কতখানি কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা বোধ হয় এখন কিছুটা বুঝবার দিন এসে গেছে। তাই তো কোরান বার বার বলছে যে, জ্ঞানীজনদের জন্য অনেক কিছু বুঝবার নিদর্শন আছে। এই জ্ঞানীজনেরা সম্ভবত আমানুর দলে পড়তে পারে। আবার নাও পড়তে পারে। আবার হয়তো জ্ঞানীজন বলতে সম্পূর্ণ অন্য একটি শ্রেণীকেও বুঝাতে পারে। আবার হয়তো বিজ্ঞানীদেরকেও বুঝাতে পারে। অধম লিখক এই বিষয়টি বুঝতে পারিনি বলে ‘হয়তো’ শব্দটি ব্যবহার করলাম।

সুতরাং এই জিন্দা কবরের পায়ের সামনে বসে অতি সম্মানের সহিত পদচুপন করুন। এই পদচুপনের দ্বারা আপনার তকদির বদলে যাবার জন্য কাতর মিনতি করুন। খবরদার! সেই জিন্দা কবরে বাস করা অলীকে যেন আপনি ভুলেও দোয়া করতে যাবেন না। তা হলে ইহা হবে চরম বেয়াদবি। কারণ যিনি চিরজীবিত তাকে আপনি কোন স্পর্ধার পূজি নিয়ে দোয়া করতে যাবেন? কী পূজি আপনার কাছে আছে যে, সেই পূজিটি তাঁর মর্যাদার চেয়েও বড়? যদি সেই উচ্চ মর্যাদার পূজি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার দোয়া করার অধিকার আছে। না হলে

যাকে কোরান ‘মরে গেছে’ বলে বলা তো দূরে থাক, চিন্তাটি করতে পর্যন্ত একদম মানা করে দিয়েছে তাকে কি দোয়া করতে যাবেন, না দোয়া চাইতে যাবেন? আপনার মন ও বিবেক কী বলে? যেটাই আপনার মন ও বিবেক বলতে চাইবে সেটাই আপনার তকদিরের লিখন। যদি এরকম জিন্দা কবরের জিয়ারত করা ঠিক হবে না বলে ভাবছেন, তাহলে আপনাকে দোষ দিতে পারবো না। কারণ আপনার তকদিরে যাওয়াটা লিখা নেই, তাই আপনি যাবেন কেমন করে? কারণ তকদিরের লিখন খণ্ডানোর কোন শক্তি ও ক্ষমতা আপনাকে মোটেই দেওয়া হয়নি।

জিন্দা কবরে বাস যিনি করছেন তিনি আল্লাহর অলী। প্রত্যেক আল্লাহর অলী অবশ্যই একজন মুমিন। আমান নয়। আমান কখনোই মুমিন নয়, আর মুমিন কখনোই আমান নয়। গবেষণার দৃষ্টি দিয়ে, মাহারাজা পাখির মত মাছু ধরার চোখে কোরান পড়ুন। বারবার পড়ুন, দেখতে পাবেন শব্দ চয়নের কী অপূর্ব কৌশল। আমি অবাক হই তখনই যখন দেখতে পাই, কোরানের বড় বড় তফসীরকারেরা পর্যন্ত আমান এবং মুমিনকে লাভডা পাকিয়ে পাতে দিয়ে ফেলেছেন। মুফতি ইয়ার আহমদ খান সাহেব রচিত পনের খণ্ডের তফসীরে নব্বই-তে পর্যন্ত আমান আর মুমিন দুটো যে এক মোটেই নয়, সেটা পেলাম না। যদিও এই কোরানের তফসীরটি সবচাইতে ভাল হয়েছে বলে দাবি করছি। অধম লিখকের চোখেও এই আমান এবং মুমিন এককাল একই ভেবেছিলাম, কিন্তু বাংলাদেশেরই একজন কোরান গবেষক, যিনি সবকিছু ফেলে দিয়ে একটানা ষাট বৎসর ধরে কোরান গবেষণা করে কোরানের তফসীর লিখেছেন এবং ইতিমধ্যেই সেই কোরান তফসীর চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সেই গবেষকের নাম হল সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী আর তার তফসীরের নাম হল তফসীরে কোরানুল করিম। এই গবেষক এমন কিছু নতুন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন যা সত্যিই অবাক করে। তিনিই আমান এবং মুমিন যে এক কথা নয় তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আরও কিছু বিষয়ে এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা পড়লে বাতিমত চমকে যেতে হয়। এই গবেষক সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর রচিত কয়টি উচ্চ মানের বই বাজারে পাওয়া যায়। তার মধ্যে মসজিদ দর্শন, রুমজান দর্শন এবং কেবলা ও সালাত বই কয়টি বিখ্যাত ইসলাম গবেষক মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবির কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে একখাটিও সত্য যে, তার গবেষণার ফল যে একেবারে তলসি পাটা ধোয়া জলের মত সবই সত্য তা নয়। কারণ অনেক বিষয়ে তার গবেষণার সঙ্গে একমত হতে পারি না। তবে গবেষণার কাজটিকে উৎসাহ দেবার জন্য বললাম। হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত নির্ভীক গবেষক ইসলামের ইতিহাসে আর একটি এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেছে বলে আমার জানা নেই। তিনি এতই সাহসী ইসলামের গবেষক ছিলেন যে, তিনি তার বাচুনায় এমন কথাটি পর্যন্ত বলেছেন যা আর কেউ সাহস করে বলতে পারেন নি। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন যে, হযরত উমর

ফারুক (রাঃ) জীবনে বহু ভুল করেছেন এবং মাওলা আলী তিনশত ভুল করেছেন। এত বড় বড় সাহাবাদের উপর এরকম মন্তব্য আমরা চিন্তাই করতে পারি না।

অধম লিখক দঃখিত। সত্যিই আমি দঃখিত এজন্য যে, আমি ফেরকার সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে কলম ধরেছি। আমি যদি মাওলানার মণ্ডদীর লিখার মধ্যেও ভাল কিছু পাই তা শ্রদ্ধাসহকারে প্রকাশ করতে চাই। যদিও মাওলানার মণ্ডদীর লিখা বেশির ভাগ মুসলমান গ্রহণ করেন না, সে যে ফেরকার মাওলানাই হোক না কেন। আমি ফেরকাবাজিতে বিশ্বাসী নই। এ কেমন কথা যে, আমার বাবা হিন্দু বলে আমাকেও হিন্দু হতে হবে? আমার বাবা খ্রিস্টান বলে আমাকেও হতে হবে খ্রিস্টান? আমার বাবা মুসলমান বলে আমিও মুসলমান? এ যে বাবার সাইনবোর্ড ছেলের কাছে তুলে দেবার পুরাতন নিয়ম। কাঁধের উপর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে সত্যকে বকে তুলে নেওয়া যে কত বড় কুণ্ঠের কাজ, কত বড় বিদ্বেষ ঘোষণা করা এবং কতখানি মন ও বিবেকটাকে নিরপেক্ষ রেখে একটানা বিভ্রান্তি ধর্মের গবেষণায় মশগুল হয়ে থাকতে হয়। বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমার পীর ও মুরশিদ কেবলমাত্র কাবা হযরত বাবা সামসেত্তারাজি এইজন্যই বলেছিলেন যে, না তাসরাও, না ইহদিয়াম, না গাবরাম, না মুসলমানাম তথা 'আমি অগ্নি উপাসকও নই, আমি ইহুদিও নই, আমি খ্রিস্টানিও নই, আমি মুসলমানও নই'। সত্যিই সাইনবোর্ড একটি পুরাতন আমাশা রোগ। ফেলাজল খেলে পালিয়ে যায়, আবার দেখা দেয়। এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগই হয়তো এক সাথে সবাইকে বাসিয়ে ছাড়বে।

জিন্দা কবরে যিনি বাস করছেন তাঁর অনেক নাম। তার মধ্যে দুটো নাম উল্লেখ করলাম। একটি আলাহর অলী আর অপরটি মুমিন। এখন সবচাইতে যে মারাত্মক প্রশ্ন এখানে দেখা দিচ্ছে সেটা হল এই আলাহর অলী তথা মুমিন ব্যক্তিটি কে? কী তার পরিচয়? তিনি যত বড় অলীই হোন আর মুমিনই হোন না কেন, তাঁর আসল পরিচয় কী? তাঁর মূল পরিচয় কী? তাঁর প্রথম ভিত্তির নাম কী? তাঁর আসল পরিচয়টি হল, তিনি মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর উম্মত। তাঁর মূল শিকড়টি, যে শিকড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন সেই শিকড়ের নাম হল ইমাম্মে কেবলাতাইনে মোহাম্মদ মোস্তফার আশিক তথা প্রেমিক। তাঁর উপর ভিত্তিটির নাম হল ইমাম্মে কেবলাতাইনে মোহাম্মদ মোস্তফার তিনি একজন সার্থক গোলাম। এখন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এখন সবাইকে একটু মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো পড়তে বলছি, একটু নিরপেক্ষ হয়ে চিন্তা করে দেখুন তো যে, মহানবী মোস্তফার একজন উম্মত, মহানবী মোস্তফার একজন আশিক তথা প্রেমিক, এতবড় শান, এত বড় উচ্চ সম্মান স্বয়ং কোরান ঘোষণা করছে সেখানে মহানবীর শান, মান, জালুয়া আর সম্মানের মর্যাদা কতখানি উচু হতে পারে? মহানবীর মান-মর্যাদার উচ্চতা কি তাহলে আমাদের ধারণার বাইরে নয়?

মহানবী মোস্তফার মান-মর্যাদা কি তবে অসীম নয়? যদি মোস্তফার একজন উম্মতের শান, একজন প্রেমিকের শান, একজন গোলামের শান এতখানি উচুতে অবস্থান করছে তাহলে যিনি মহানবী, যিনি মহা মাহবুব, যিনি মহা ইমাম তার শান কতখানি উচু হতে পারে এবং তার শান কেমন হতে পারে? যেখানে উম্মত মারা যায় না, যেখানে প্রেমিক মারা যায় না, যেখানে গোলাম মারা যায় না বলে কোরান ঘোষণা করেছে 'মারা গেছে' বলবে না, এমনকি চিন্তাও করতে পারবে না, সেখানে মহানবী, মহা মাহবুব এবং মহা ইমাম কী করে মারা যেতে পারে? আপসোস। আমরা কোরানকে গবেষণার পর গবেষণা করে দেখছি না, তাই যত আজেবাজে কথার বস্তা সাজিয়ে রাখি আর সেই বস্তার খাদ্য খেয়ে সহজ, সরল, কাচা, গলা মোমের মানুষগুলো গোমরা, বেয়াদব হয়ে এবং ফেরকাবাজির ধোকায় পড়ে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছি। বড়পীর বাবা আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) যেখানে বলছেন যে, অলীর মর্যাদা যেখানে শেষ সেখান থেকেই শুরু হয় মহানবী মোস্তফার শান। সত্যিই! গোলামের শানই যখন এত বড় সেখানে ইমামের শান কী হতে পারে?

মেরাজের আলোচনা

মেরাজের ঘটনাটি আমরা কম বেশি সবাই জানি। উম্মে হানির ঘরে থাকার সময় এই বিখ্যাত মেরাজের ঘটনাটি ঘটেছিল। এখানে বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা দিতে চাই না। কেবল মেরাজের মূল বিষয়টি কী তারই কিছুটা আভাস দিয়ে রাখতে চাই। মহানবী যখন সিদ্রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গেলেন অর্থাৎ সৃষ্টিরাজ্যের শেষ সীমানাতে এলেন তখন ফেরেশতা জিবরীল আর এক পা-ও এগিয়ে যাবার

অন্ধমত প্রকাশ করলেন। কারণ সিদ্দ্রাতুল মুনতাহা হল সৃষ্টিরাজ্যের শেষ সীমানা। অনেকটা রূপক ভাষায় বলতে গেলে, কোন একটা দেশের শেষ সীমানা অর্থাৎ এই শেষ সীমানার পরই অন্য আর একটি নূতন দেশের শুরু হওয়াকে বুঝায়। সেরকমভাবে সমস্ত সৃষ্টিরাজ্য পার হবার শেষ ধাপটি, শেষ বর্ডারটির নাম দেওয়া হয়েছে সিদ্দ্রাতুল মুনতাহা। ফেরেস্টা জিবরীল এই সিদ্দ্রাতুল মুনতাহায় এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মহানবীকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে আর একটি পা-ও এগিয়ে যাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যেহেতু ফেরেস্টার পক্ষে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার সাধারণ বিধান রাখা হয়নি সেই হেতু আদেশ অমান্য করার প্রশ্নই উঠে না। বরং কবির ভাষায় সীমানা থেকে এক পা এগিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এর কারণ কী? কারণ হল, সৃষ্টির শেষ সীমার পরই শুরু হয় লা মোকাম। লা মোকাম বলতে কী বুঝায়? লা মোকাম হল কেবলই আল্লাহর রাজ্য। এই আল্লাহর রাজ্য তথা লা মোকামে সৃষ্টির আগমন নিষেধ। সুতরাং জিবরীল থেমে গেলেন এবং মহানবী লা মোকামে চলে গেলেন। আমি আগেই বলেছি যে, এখানে মেরাজের বিষয়টি অতি সামান্য যাহা আমাদের মূল কথাটিকে তুলে ধরার জন্য বলতে হচ্ছে যে, মহানবী যদি অনায়াসে লা মোকামে গিয়ে থাকেন তা হলে তিনি কেমন করে সৃষ্টি বলে ধরে নেই? কারণ সৃষ্টি মহাশক্তির অধিকারী জিবরীল যেখানে পা রাখার অন্ধমত প্রকাশ করলেন সেখানে মহানবী কী করে যেতে পারেন, যদি তাঁকেও সৃষ্টির মধ্যে ধরে নেই? কারণ লা মোকামে তথা আল্লাহর রাজ্যে তো কেবল আল্লাহরই থাকার কথা। তা হলে মহানবীর লা মোকামে যাবার রহস্যটা কী? কী এমন মারোফতের গোপন কথা থাকতে পারে? কোরানের ঘোষণাটি হল, মহানবীর সঙ্গে আল্লাহর মিলন হল

মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধানে। এখন এই দুই ধনুকের ব্যবধান বলতে কী বুঝানো হয়েছে? তীর না বলে ধনুক বলা হল কেন? অথবা তীর এবং ধনুক দুইটাই কেন বলা হল না? কারণ ধনুক কখনো ছুড়ে মারা হয় না। ছুড়ে মারা হয় তীর। অথচ যাহা ছুড়ে মারা হয় সেই তীরের উল্লেখ কোরানে করা হয়নি। উল্লেখ করা হল কেবল ধনুকের। তাও আবার একটি ধনুকের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে দুইটি ধনুকের কথা। তা হলে ধনুক দেখতে কীরকম? ধনুকের আকৃতি কীরূপ? ধনুক দেখতে অনেকটা আধা বৃত্তের মত। যাকে অর্ধবৃত্ত বলা হয়। তাহলে দুইটি ধনুকের দুইটি আধা বৃত্তকে একত্র করলে হয়ে যায় একটি বৃত্ত। যদি কোন গবেষক ভেঁটাম্বী করে বলে যে, দুটো ধনুক একত্র করলে বৃত্ত না হলেও বৃত্তের কাছাকাছি হয়ে যায়, কিছুটা বাকি থেকে যায় একটি পূর্ণ বৃত্ত হতে। তাতেও সেই গবেষক যাতে এই সামান্যতম ভুলটিও না করে বসেন তার জন্য কোরান সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর শব্দ যোগ করে দিয়েছে। কোরানের সেই সুন্দর শব্দটি হল, ‘আও আদনা’ তথা ‘আরো নিকটে’। এই আরো নিকটে শব্দটি কোরান যোগ করে দিয়ে একটি পূর্ণ বৃত্তের কথাই বলেছে। পূর্ণ বৃত্ত মানেই হল আল্লাহ এবং মহানবীকে একাকার করে দেওয়া। বাংলার বিখ্যাত সুফি সাধক বাবা লালন ফকির তাই হয়তো লিখে গেছেন, যিনি রাসুল তিনিই খোদা। আবার বাবা লালন ফকির এই কথাটিও জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে পাঠক ভুল না বুঝে, এই বলে যে, যিনি রাসুল তিনিই খোদা। এই কথাগুলো কিছু লালনের মনগড়া কথা নয়। এই কথাগুলো কিছু লালনের খেয়াল-খুশিতে বলা নয় বরং এই কথাগুলো কোরানেরই কথা। অর্থাৎ এই কথাগুলো লালনের মুখের কথা নয়, বরং কোরানের বাণী। সত্যি! ভাবতেও অবাক লাগে যে, লালন ফকির কত উঁচু দরের সাধক ছিলেন। অবশ্য লালন

ফকিরের আগেও বহু পীর-ফকির, মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন। তবে বাংলা ভাষায় নয়। এই ধরনের কথাগুলো আরো যারা বলে গেছেন তার নমুনা তুলতে গেলে বিরাট এক ফিরিস্তি লিখতে হয় আর তাতে বইটি হয়ে যাবে পালোয়ানের মত মোটা তাজা। অবশেষে পাঠকের ধৈর্যই থাকবে না। (অবশ্য আমাদের রচিত কোরান তফসীরে সব কিছু তুলে ধরবো। এতে যত বড়ই হোক না কেন)।

এই ‘আও আদনা’ তথা ‘আরও নিকটে’ বলে আল্লাহ এবং রসূলকে একাকার করা হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের বুঝাবার জন্য একটি ঢাকনার প্রয়োজন। পরদা দিয়ে দিতে হয়। দেয়াল দাঁড় করাতে হয়। সেই পরদাটির নাম হল শরিয়ত। একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। অধম লিখকের বাবার নাম হেলাল উদ্দীন। তিনি বিয়ে করেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম সেতারা বেগম। হেলাল উদ্দিনের ঔরসে সেতারা বেগমের পেটে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছে। সেই পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর তথা অধম লিখক। অধম লিখক ভাল করেই জানে যে তার মাতা হলেন বাবার স্ত্রী। তাই বলে কি আমি আমার মাকে এই বলে ডাকতে পারি যে, এই হেলাল উদ্দিনের স্ত্রী অথবা এই হেলাল উদ্দিনের বউ? পারি না। কেউ পারে না। এরকমভাবে ডাকলে মানুষ পাগল বলবে। কারণ এটা চরম অভদ্রতা এবং শালীনতার বাইরে। আমাকে ডাকতে হবে মা, মাতাজি, মামনি, মাম। বাবার বউ, হাকিকতে ইহা একদম সত্যকথা। কিন্তু শরিয়তে এসেই একদম সত্যকথাটিকে আর বলা যাচ্ছে না। বলা নিষেধ অথচ সত্য। সেরকম মহানবীই যে আল্লাহ এটা কেবল সত্যই নয় বরং ধ্রুব সত্য। অথচ শরিয়তে সেই কথা বলা যাবে না। তবে বলা না গেলেও এই রহস্যটি অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে। যদি না জানতে পারেন, যদি না জানার চেষ্টা

করেন, যদি সরাসরি অস্বীকার করেন, তাতেও আপনাকে দোষ দিতে পারি না, কারণ তকদিরের লিখন খণ্ডাবেন কী করে? আপনার জন্মের আগেই তো তকদির লিখে রাখা হয়েছে। তা হলে আমার কী করার আছে? আমি কি অলী যে আপনার তকদির বদলিয়ে দিতে পারবো? অলীরা ভুলেও কোরানের তফসীর লিখেননি, আর যিনি কোরানের তফসীর লিখেন, সে যত বড়ই হোক না কেন, কিছু ভুলেও অলী নয়। পাঠক ভাইদের সাবধান করে দিলাম। যাতে না বলতে পারেন যে, কেউ তো এমন কথা বলেওনি আর শুনিওনি। কোরান যারা তফসীর করেন ভুলেও তাদের কাছে মুরিদ হতে যাবেন না। তারপরও যদি মুরিদ হয়ে যান তাহলে আপনার তকদির। আমার জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তাই জানিয়ে দিলাম। আবার কোরান কিছু একটি সাংঘাতিক বুঝবার মত কথা বেশ কয়েকবার ঘোষণা করেছে এই বলে যে, এই কোরান পড়েই একজন পথ পাবে আর একজন পথহারা হবেন। এই কথাটির ব্যাখ্যা লিখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা এতই গোপনীয় যে ভাষায় প্রকাশ করা ঠিক হবে না। এখন আবার সেই কথায় আসা যাক যেখানে বলা হয়েছে যে, মহানবীর উন্মত্তের, প্রেমিকের এবং গোলামের আজন্মত, চরম মর্যাদা, শানই যদি কোরান মতে, ‘বাল আহ্‌হিয়া’ বলে এত বড় মর্যাদা দিয়ে থাকে তা হলে স্বয়ং মহানবীর আজন্মত এবং শান কী হতে পারে?

মেরাজের এই ঘটনায় মহানবীকে আমরা তথা মুসলমানেরা বলে থাকি যে, সৃষ্টির প্রথম প্রকাশটির নাম হল নূরে মোহাম্মদ। এই নূরে মোহাম্মদী হতেই সমস্ত আগমন, বিবর্তন এবং পরিণামে প্রত্যাবর্তন। আবার হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে যে, ভগবান কৃষ্ণের জ্যোতি হতেই সকলের আগমন, বিবর্তন এবং পরিণামে প্রত্যাবর্তন। আবার বৌদ্ধ ধর্মে গৌতম বুদ্ধকে, ইহুদি ধর্মে মুসাকে এবং খ্রিস্টান ধর্মে ঈসা তথা যিশু খ্রিস্টকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

কোরান বেশ কয়েকবার ঘোষণা করেছে যে, এমন কোন জাতি নেই, যে জাতির নিজস্ব ভাষায় কমপক্ষে একজন রসূল পাঠানো হয়নি। এখন কোরান মতে প্রত্যেক জাতির নিজের ভাষায় রসূল পাঠানো হয়েছে। কোরান বলছে, লা নুফাররেকু বাইনা আহাদিম্ন মিনহম্ অর্থাৎ ‘আমরা ছোট বড় করিনা তাঁদের মাঝে।’ নবীদের মাঝে কে বড় এবং কে ছোট এই মতপার্থক্য করা হতে বিরত থাকার স্পষ্ট ঘোষণাটি সুরা বাকারার একশত ছত্রিশ নম্বর আয়াতে পাচ্ছি এবং আরো পাচ্ছি যে, এই আয়াতে বর্ণিত কয়েকজন নবীদের কথা যাদের উপর আল্লাহর তরফ হতে ওহি নাজেল হয়েছে এবং আরো অনেক নবীর উপর যাদের নামগুলো এই আয়াতে বলা হয়নি। অথচ আমরা নবীদের মাঝে প্রায় অনেকেই ছোট বড় করতে ভালবাসি এবং মনে কত তৃপ্তি পাই এই বলে যে, আহা! কত বড় সোয়াবের কাজটাই না করে ফেললাম। অথচ কোরান ধর্মকের সুরে করো না বলেনি বরং বলা হচ্ছে, ‘আমরা ছোট বড় করি না’। কাহাদের মধ্যে ছোট বড় করি না? সকল নবীদের মধ্যে ছোট বড় করি না, কারণ আলাদাভাবে দেখা গেলেও তাঁরা আহাদের সঙ্গে মিশে আছেন, অর্থাৎ সবাই এক অখণ্ড সত্তায় একাকার হয়ে আছেন। সুতরাং পার্থক্য করার প্রশ্নই আসে না। মহানবী বলেছেন, আউয়ালুনা মোহাম্মদ, আওসাতুনা মোহাম্মদ, আখেরুনা মোহাম্মদ, কুল্লুনা মোহাম্মদ অর্থাৎ ‘আমরা প্রথমে সবাই মোহাম্মদ, মাঝখানেও সবাই মোহাম্মদ, শেষেও সবাই মোহাম্মদ (এবং) সবাই আমরা মোহাম্মদ।’ এত বড় সুমহান ঘোষণা, এত বড় শাস্বত এবং সার্বজনীন ঘোষণার মাধ্যমে একটি মহাবিস্ময় মহাসাম্রের বাণী অধম লিখক পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থে খুঁজেও পাইনি-এই কথাটি নিরপেক্ষ হয়েই আমাকে জানিয়ে দিতে হচ্ছে। যিশুখ্রিস্ট বলতেন, যত বিনয় তত উচুতে

অবস্থান। সত্যিই যিশুখৃস্টের এই মহাবাহীর জ্বলন্ত নমুনাটি আমরা অবশেষে পেলাম মহানবীর পবিত্রতম ঠোঁটে। যদিও তিনি শরিয়তের দৃষ্টিতে মহানবী, কিন্তু মারফতের দৃষ্টিতে তিনি কে এবং কী তাঁর আসল পরিচয় তা বলা নিষেধ থাকলেও মেরাজের ঘটনাটি একটু গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়লেই সব কিছু জলের মত পরিষ্কার বুঝা যায়। আমরা যে পানি পান করি এটা ফারসি, উর্দু এবং হিন্দি শব্দ। অনেকেরই ধারণা যে, হিন্দুরা পানিকে জল বলে। আসলে ইহা মোটেই সত্য নয়। রাজস্থানের হিন্দুরা জলকে পানিই বলে। আসলে জল শব্দটি হল বাঙালির বাংলা শব্দ। আরবিতে এই একই পানিকে পানি না বলে বলে আব্বুন, সংস্কৃত ভাষায় বলে অপ, ফরাশি ভাষায় আও, ইটালীয় ভাষায় একোয়া, স্পেনের ভাষায় এগোয়া, ইংরেজিতে ওয়াটার, জাপানিতে মিজু, চীনা ভাষায় সুই, বার্মায় বলে রি, তামিল ভাষায় তান্নি। এরকম একই পানিকে বিভিন্ন দেশের ভাষাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু সত্য বলতে কি, শব্দ তো নানা রকম, আসল মালটি তো ঐ পানিই। তাহলে ধর্ম নিয়ে এত মারামারি এত হানাহানি হয় কেন? হয়তো আমরা ভুল বুঝি, না হয় আমাদেরকে ভুল বুঝানো হয়, না হয় নিজের বিষয়টিকে বড় করে তোলার প্রবণতা, না হয় তকদিরের খেলা। এই তকদিরের লীলাখেলা চলতেই থাকবে। যদি প্রশ্ন করেন কতদিন এই তকদিরের লীলাখেলা চলবে? উত্তরটি সোজা। আমি জানি না।

মহানবীর মেরাজের ঘটনাটি খুব ছোট করে এজন্যই উল্লেখ করলাম যে, যেখানে আল্লাহর রাস্তায় তাঁরই একজন উন্নত ফানা তথা নির্বান হলে ‘মারা গেছে’ বলে ঘোষণা করা এবং বসে বসে চিন্তা করা হতে একদম বারণ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে মহানবীর শান ও জালুয়ার সীমা কোথায়? আজও কিছু অপদার্থ

আরবি-জানা পণ্ডিত নামের কুলাঙ্গার মহানবীকে পর্যন্ত মারা গেছেন বলতে ঠোট কেঁপে উঠে না। যে সমস্ত মাদ্রাসায় এরকম জঘন্য মিথ্যা কথাগুলোকে সরল-সহজ ছাত্রদেরকে শেখানো হয় তাদের তকদিরগুলো কত বেদনাদায়ক হতে পারে একবার ভেবে দেখুন তো। আমি এরকম কথা যদিও বলতে চাই না যে, এরা ছাত্র হয়ে প্রবেশ করে কিছু অবশেষে গোলাবি ওহাবি হয়ে বের হয়। আমি বলতে চাই না যে, এরা গাছের গোড়া কেটে মাথায় পানি ঢেলে গাছটিকে তরতাজা করার জন্য সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছে।

মিলাদের আলোচনা

এক শয়তান বহু শয়তানে পরিণত হয়ে পৃথিবীর মানুষগুলোকে ধোঁকা দেবার, কুমন্ত্রণা দেবার, ওয়াসওয়াসা দেবার কলমে রাখে বলে বিশ্বাস করি। এক আজরাইল নামক ফেরেস্টা সকলের জীবন ছিনিয়ে নেয় বলে বিশ্বাস করি। অথচ মহানবীর পক্ষে একই সময়ে হাজার হাজার মিলাদের অনুষ্ঠানে হাজির হওয়াকে অসম্ভব ব্যাপার বলে ফতোয়া দেয় সেই সব আলেম নামের কুলাঙ্গারেরা। শয়তান আর আজরাইলের উপর এই কুলাঙ্গারেরা বিশ্বাস করে অনায়াসে, আর যিনি লা মোকাম্মে গিয়ে দুই ধনুকের ব্যবধানে একাকার হয়ে আছেন তাঁর নামে কেন এই জঘন্য অপপ্রচার? আমি এদেরকে সালমান রুশদীর মত বলতে চাই না, বরং বলতে চাই যে, এদের এহেন কথাবার্তায় আরো সালমান রুশদী হয়তো তৈরী হতে পারে? এরা এই বলে ফতোয়া দেয় যে, যেহেতু হাজার হাজার মিলাদ মাহফিলে মহানবীর পক্ষে একই সময়ে উপস্থিত থাকা সম্ভবপর নয়, সেই হেতু মিলাদ

মহাফিলের অনুষ্ঠানটি হল শেরেক ও বেদাত। ইটালীতে বিশ্বকাপের ফুটবল খেলাগুলো একই সঙ্গে পৃথিবীর অনেকেই কেন্নন করে দেখলো? অনেকে আবার মিলাদে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নবী, ইয়া রসুল’ বলাকেও শেরেক বলে। ছোট করার মন নিয়ে বলছি না, বরং নমুনা হিসাবে তুলে ধরতে চাই যে, ছেলের বয়সের বিচারক যখন আদালতের এজলাসে আসেন তখন বাপের বয়সের বুড়ো উকিলেরা কেন দাঁড়িয়ে সম্মান দেখান? এরকমভাবে আমরা কি অনেক স্থানে বিশেষ ব্যক্তির মর্যাদার প্রতি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করি না? তা হলে যে মহানবীর নামে মিলাদ নামক অনুষ্ঠানটি করা হচ্ছে সেই অনুষ্ঠানে তাঁর মত মহানবীর আগমনে কি আর বসে থাকা যায়? বসে থাকা কি চরম বেয়াদবি নয়? যদি কেউ বলতে চায় যে, অনুষ্ঠানের আবার কী প্রয়োজন? যদি এর উত্তরে বলি যে, প্রতিটি মানুষই হল আল্লাহর এক একটি নতুন নতুন অনুষ্ঠান। আমার পা হতে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটাই তো আমার প্রাণের জন্য একটি অনুষ্ঠান। প্রাণটি যদি শরীরে না থাকে তা হলে দেহটা হয়ে পড়ে একটা মূল্যহীন লাশ। প্রাণের উপস্থিতিতে দেহটির অনুষ্ঠান আর অনুপস্থিতিতে লাশ। তা হলে আমি নিজেই একটি অনুষ্ঠান, অথচ সেই অনুষ্ঠানের প্রতি অস্বীকার। তা হলে তো নিজেকেই অস্বীকার করছি। মহান আল্লাহ পাকের অনুষ্ঠানের বিচিত্র লীলা খেলাই তো চালিয়ে যাচ্ছে মানুষ তৈরি করে। মানুষের মাঝেই তো আল্লাহর অনুষ্ঠানটিকে ধরে রেখেছেন। যদি সবকিছু তিনি ধ্বংসই করে দেন তা হলে অনুষ্ঠানটি থাকে কোথায়? থাকে না। তা হলে কী করে এই অনুষ্ঠানটিকে বাদ দিতে চাই? আমরা জানি না, আমাদের জীবন দেহের কোথায় লুকিয়ে আছে? মাথার মগজে? রক্তকণিকায়? হৃদয়ে? কোথায় লুকিয়ে আছে? অথচ এই লুকানো জীবনটাই আমার দেহটিতে ধারণ করে কত রকম

অনুষ্ঠান করে চলছে তার হিসাব কে রাখে? প্রতিটি মুহূর্তে যেখানে এক একটি অবিরাম অনুষ্ঠানের খেলা চলছে সেখানে মিলাদের অনুষ্ঠানটি, ওরশের অনুষ্ঠানটি, ঈদের অনুষ্ঠানটি, মহরমের মাতমের অনুষ্ঠানটি কী করে কেমন করে শেরেক বেদাতের ধূয়া তুলে বন্ধ করতে চান? পছন্দ না হয় ভাল কথা, আর সবকিছুই যে একজনের পছন্দ হবে এটা তো নাও হতে পারে। কেবল মানুষগুলোই কি আল্লাহর একমাত্র অনুষ্ঠান? পৃথিবী নামক একটি ছোট গ্রহের মধ্যে কত অগণিত অনুষ্ঠানের রূপ বলসিয়ে উঠছে এবং সেইসব অনুষ্ঠানগুলোর কিছুটা দেখতে পেয়ে আমরাই রীতিমত খতমত খেয়ে যাই, আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারি না, মাথার মগজ অবাকের পর অবাক হয়। পৃথিবীর মত আরো কত গ্রহ আছে? কত সৌরজগত আছে? এত সব বলে প্রথম আকাশে অবস্থান করছে? তা হলে এত বড় বিশাল প্রকাশটাই কি একটি অনুষ্ঠান? একটি চোখে না দেখা শুক্রকীট দৃশ্যমান পূর্ণ মানব আর মানবীতে পরিণত হওয়াটাই কি একটি ছোট অনুষ্ঠান? অদৃশ্য হতে দৃশ্যে পরিণত হবার নামই কি অনুষ্ঠান? তা হলে প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি ধাপে অনুষ্ঠানের বিচিত্র লীলা খেলা চলছে। তা হলে এমন একটি সামান্য বিষয় কি দেখাতে পারবেন যে, অনুষ্ঠানের প্রয়োজনটি একটি মূল্যহীন বিষয়? অথচ আমাদের মাঝে অনেকেই অনুষ্ঠানটিকে ফালতু বিষয় মনে করেন। মনে পল্লবপ্রাণিতার অপর নামই অনুষ্ঠান এবং বর্জন করে বিমূর্ততাকেই আদর্শ মনে করেন। বিমূর্ততা (নিরাকার) কখনোই আদর্শ হতে পারে না। কারণ বিমূর্ততার সঙ্গে আদর্শ শব্দটি মিলে না। অনুষ্ঠান থাকলেই আদর্শের কথাটি আসে। অনুষ্ঠান আর আদর্শ পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ। কিন্তু যাহা বিমূর্ত তথা নিরাকার উহা

অনুষ্ঠানের প্রশ্নে অজ্ঞাত। বিমূর্ত যখন জ্ঞাত হয়ে উঠে মানুষের গবেষণার মাধ্যমে তখনই বিমূর্ত আর বিমূর্ত থাকে না। উহা তখন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। বিমান কিছুদিন পূর্বেও বিমূর্ত ছিল। আবিষ্কারটাই অনুষ্ঠান। সুতরাং বিমূর্তকে নেই বলা যাবে না। শূন্য বলা যাবে না। কারণ নেই এবং শূন্য হতে শূন্যই আশা করা যায়। সুতরাং বিমূর্ত যদিও অজ্ঞাত, অজানা বিষয়, কিন্তু শূন্য নয়। স্রষ্টা আল্লাহ যদি তাঁর সমস্ত প্রকাশ-বিকাশের ধারাগুলোকে গুটিয়ে নেন তা হলে অনুষ্ঠান আর থাকে না। আর এই অনুষ্ঠান না থাকলে

বিমূর্তের ধারণা করার প্রশ্নই আসে না। কারণ ধারণাটা বিমূর্ত নয়, বরং অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত তথা মূর্ত। সুতরাং অনুষ্ঠানই বিমূর্তের একমাত্র পরিচয়। বিমূর্ত এবং অনুষ্ঠান দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় বলে যারা ধারণা করেন, তারা সত্যকে অস্বীকার করেন। এবং সত্যকে অস্বীকার যারা করেন আরবি ভাষায় তাদেরকে কাফের বলা হয়। বিমূর্তের সর্ব প্রথম প্রকাশটির নাম হল নুরে মোহাম্মদী। অবশ্য আরবি ভাষায়। অন্যান্য ভাষায় বিমূর্তের প্রথম প্রকাশটির বিভিন্ন নাম আছে। যেমন, নুরে মুসা, নুরে ঈসা, নুরে শ্রীকৃষ্ণ, নুরে গৌতম বুদ্ধ ইত্যাদি। তা যে নামই দেওয়া হোক না আসলে বিমূর্তের ইহাই প্রথম প্রকাশ। আমরা ঝগড়া করি বিভিন্ন নাম দেবার কারণে। এই ঝগড়াগুলো কি এক একটি ভুল বুঝাকুঝির অনুষ্ঠান? সুতরাং বিমূর্ত এবং মূর্ত (আকার) দুটোর আদি রূপ একই। কিন্তু আমরা ভাগ করে নেই। এমনকি মূর্তকে বিমূর্তের অংশ নয় বলে অনেকেই সরাসরি অস্বীকার করি। এই অস্বীকার একটি ভ্রান্তি। একটা মায়া। যাহা অনুধাবন করা সবার পক্ষে তো মোটেই সম্ভব নয়, বরং অতি অল্প লোকেই বুঝতে পারে। সুতরাং সত্য উপলব্ধির প্রশ্নে জনতার ভোট গ্রহণ করতে গেলে জ্ঞানীদের জ্ঞানানত বাজেয়াপ্ত হতে বাধ্য।

কিন্তু একটি বিষয়ে জ্ঞানীদের জ্ঞানানত বাজেয়াপ্ত হয় না। সেটা হল বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের প্রশ্নে। এখানে জনতার আদিম ধ্যান ধারণাগুলো প্রচণ্ড মার খেয়ে চলছে। কারণ বিজ্ঞান বিমূর্তকে সবার সামনে অনুষ্ঠানের রূপ দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিদ্রোহের চাপা বেদনা কিছুটা প্রকাশ পেলেও পরে গা সঙ্গে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু যত গুপ্তগোল বাঁধে আত্মার বিজ্ঞানের প্রশ্নে। কারণ আত্মার বিজ্ঞানের বিষয়টির অনুষ্ঠান থাকলেও উহা জনতাকেন্দ্রিক হয় না, হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সুতরাং যেখানে অনুষ্ঠান ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেখানে গালমন্দ, টিটকারী এবং কাদা ছোড়াছুড়ি নামক অপবাদগুলোর আগমন অবধারিত। এখানেই মত ও পথের বিভিন্মতা দেখা দেয়। এবং এর ফলে নির্যাতন বহু বেদনাদায়ক রূপ ধরে আসে। আত্মার বিজ্ঞানী মনসুর হাল্লাজের আনাল হক ঘোষণায় নির্যাতন এসেছিল। আত্মার বিজ্ঞানী সামসেত্তারীজের কুম বে ইউজনি ‘আম্মার হকুমে মৃত জীবিত হও’ বলার কারণে নির্যাতন করেছিল আলেমসম্প্রদায় তথা ধর্মবিদ্যা বিশারদেরা। বিখ্যাত অলীয়ে কামেল বাবা সারমাস্তের মাথা কাটা গিয়েছিল আলেম সম্প্রদায়ের ফতোয়ায়। কারণ আত্মার বিজ্ঞান যদিও অনুষ্ঠান, কিন্তু সেই অনুষ্ঠান ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমাজকেন্দ্রিক নয়। আত্মার বিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষণার সামান্য বই লিখতে গিয়ে ইমাম গাজ্জালী হতে রুমী, হাফেজ, জামী, আন্তার, বড়পীর সাহেব, খাজা বাবা, ইউনুল আরাবীর মত অনেককে জঘন্য অপবাদ সইতে হয়েছে। অথচ সেই অপবাদগুলো এসেছে সাধারণ জনতা হতে নয়, বরং আলেম নামক বিশেষ সম্প্রদায় হতে। গবেষণার গণতন্ত্র এই বিষয়টিকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। যার দরুন আত্মার বিজ্ঞানীদের কথা না হয় বাদই দিলাম,

আলেমদের মধ্যেই দেখা দেয় অনেক প্রকার পার্থক্য। বরং এখানেই শেষ নয়। এই মতপার্থক্য নিয়ে খুনাখুনির বেদনাদায়ক বহু নজির আমরা ইতিহাসের পাতায় পাই। একদল অপর দলকে সহ্য করা তো দূরে থাক, সামান্যতম মানবিক আচরণটুকু পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়ে পাশবিক শক্তি দিয়ে আক্রমণ করতে পর্যন্ত বিবেক বাধা দেয়নি। অথচ কোরান ঘোষণা করছে এই বলে যে, জেনে-শুনে যে মুসলমান ভাইকে হত্যা করলো সে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে গেলো। কোরানের এই সাবধানবাণী কিছু সব কয়টি দলই কম-বেশি জানে কিছু তারা মুসলমান ভাইকে প্রথমে কাফের ফতোয়া দিয়ে তারপর হত্যা করেছে। সহনশীলতা, পরমত সহ্য করা, গবেষণার অধিকার এদের চরিত্রে খুব কমই পাওয়া যায়। যার দরুণ ধর্ম বিষয়টি একটি গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে আছে।

আত্মা ও প্রাণের মাঝে প্রভেদ

দেহ হতে যখন প্রাণটি বেরিয়ে যায় সেই প্রাণটির আকার আছে কি? নেই। কারণ প্রাণ নিরাকার। দেহের আকার সাড়ে তিন হাত অথচ প্রাণটি নিরাকার। আরবি ভাষায় প্রাণকে বলা হয় নফস। এই নফস তথা প্রাণটিই মৃত্যুর মজা গ্রহণ করে। কয়বার গ্রহণ করে? মাত্র একবার। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়টি হল, মৃত্যুর মজা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। কারণ মৃত্যু ধ্বংস নয়, বরং একটি ঘটনা। রুহ কিন্তু প্রাণ নয়। তবে কী? রুহ আল্লাহর আদেশ। আল্লাহর আদেশ কি আল্লাহ হতে আলাদা? বাস্তব আলো কি বাস্তব হতে আলাদা? তাই রুহ মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত নয়। রুহ মৃত্যুর ধার ধারে না। মৃত্যুর ধার ধারতে হয় প্রাণকে। তাই কোরানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নফস তথা প্রাণ মৃত্যুর মজা গ্রহণ করে। কিন্তু কোরানের কোথাও একবারও বলা হয়নি যে, রুহ মৃত্যুর মজা গ্রহণ করবে। তাই হলে রুহের মাগফেরাত চাওয়াটাই একটা মারাত্মক ভুল কথা, যা সবার মাঝে প্রচলিত হয়ে আছে। একদম ভুল কথা, অথচ সেই ভুলটি সবাই বলছেন। এর চেয়ে আর দুঃখজনক কী হতে পারে? এভাবেই বোধ হয় অনেক ইচ্ছাকৃত ভুল আর ভ্রান্তি ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। অবশ্য গবেষকদের গবেষণায় অনেক সময় ভুলগুলো ধরা পরে যায়। তাই গবেষণায় মগ্ন জ্ঞানীদের মর্যাদার কথা কোরান-হাদিসে বহুবার বলেছে। কিন্তু বেদনাদায়ক বিষয়টি হল, এ শ্রেণীর আরবি-জানা আলেম সম্প্রদায় সব সময় গবেষকদের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা তো দূরে থাক বরং প্রচণ্ডভাবে অপমানিত করেছে। দার্শনিক সফ্রেটিসের সেই মূল্যবান কথাটি এই শ্রেণীর আলেমদের কাছে আশা করা বুখা। সেই কথাটি হল, 'আমি জানি না'। এই শ্রেণীর আলেমরা কোরান-হাদিসের বাণীগুলো যেন পানির মত সহজ মনে করে যা মনে ধরে সে ভাবেই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখে যায়। এরা 'জানি না' বাক্যটিকে ঘৃণা করে। অধম লিখকের কাছে মনে হয় যে, কোরানের প্রতিটি বাক্য আইনগঠনের ই ইজিকুয়েল টি এম সি ফ্লোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন এবং গভীর। অথচ অবাক হই এরা কোরানের নামে আরবি ব্যাকরণের ভেঙ্কিবাজি দেখিয়ে কতবড় যে ভিগবাজি মার্কি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখে গেছেন এবং এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে কত শাখা-প্রশাখার বিভক্তি দেখতে পাই। তবে এরা বলতে শিখেন যে, এর অর্থ ও বিষয়বস্তুটি বুঝতে পারলাম না। অথচ বস্তুর বিজ্ঞানীদের মুখে সব সময় শুনতে পাই যে, অম্লক অম্লক বিষয়গুলো বুঝতে পারলাম না। অম্লক রোগের কারণ জানি না ইত্যাদি। আমাদের কথাগুলো পড়ে হয়তো দুঃখ পাবেন, কিন্তু ইহা একটি অপ্রিয় সত্য কথা। অনেকদিন ভেজাল দুধ খাবার পর খাটি দুধ পেতে

পড়লে পেট খারাপ হবার যেমন সম্ভাবনা থাকে, সেদিক ভাবে একটা ভুলকে যদি কোন গবেষক চোখে আসুল দিয়েও বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন, তবু সহজে গ্রহণ করতে পারে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে নিখাতন সহজে হয়েছে। হজরত ইমাম আহমদ হাফলকে দিয়ে মোতাজ্জিলা ফেকার অনুসারীরা কিছুতেই বলাতে পারেনি এই বলে যে, 'বুল, কোরান মানুষের কথা।' অথচ অবাক হই তখনি যখন দেখি যে সেই মোতাজ্জিলা নামক একদম জঘন্যতম বাতেল ফেকার একজন গুরু ঠাকুর আলুমা জামাকসুরির কোরানের তফসীর তফসীরে কাশশাক কে নিয়ে গোলুবি ওহাবি এবং এমনকি আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের অনুসারীদের সে কি লাফালাফি! মহান গবেষক ইমাম আবু হানিফাকে নিখাতনে প্রাণ দিতে হল। আল মনসুরের জেলখানায় ইমাম সাহেবকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কারণ গবেষণার গণতন্ত্র এবং স্বাধীকার দেওয়া হয়নি। যে কোন উজ্জ্বল বা মতাদর্শ, তা যত উচ্চ মানেরই হোক না কেন, উহা যদি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে সেটা টেকে না। টিকতে পারে না। তার জুলন্ত নমুনা হল মার্কস আর লেনিন সাহেবের মৃত্যু। চাপিয়ে দেওয়া যে কোন বিষয়ই হোক না কেন উহা টিকতেই পারে না। হয়তো আপেক্ষিক অর্থে তখা কিছুদিনের জন্য চলতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর ঘণ্টা যে একদিন রাজবে সেটা অবধারিত। যেখানে জুল্মগতভাবে স্বাধীকার দেওয়া হয়েছে, সেখানে কিছু একটা চাপিয়ে দিতে গেলে ফলটা ভাল হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস এই অপ্রিয় সত্যটি কতবার যে প্রতিটি যুগে যুগে দেখিয়েছে, কিন্তু আমরা জেনেও ইতিহাসের এই শিক্ষাটিকে গ্রহণ করতে পারিনি। দার্শনিক হেগেল সাহেবকে এরকম মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

আত্মার বিজ্ঞানী বাবা লালন ফকিরের ধর্মীয় গবেষণার অনেকগুলো দর্শনের মাঝে একটি বিশেষ দর্শন পাঠক সমাজকে ভাবিয়ে তোলে। অবশ্য সাধারণ পাঠকদেরকে ভাবিয়ে তোলার মতই এই দর্শনটি। তিনি বলেছেন যে, 'মুরশিদ, রাসুল এবং আল্লাহ নামে তিন হলেও মূলে এক।' এদের আলাদা করা যায় না। এদেরকে পৃথক করে দেখার প্রশ্নই উঠে না। নামের বেলায় আলাদা শোনায়, কিন্তু আসলে একেরই তিন নাম। তিনি এই কথাগুলো কেবল বলে শেষ করে দেননি, বরং বলেছেন যে, যারা মুরশিদ, রাসুল এবং আল্লাহকে আলাদা করে দেখে এবং আলাদা বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তারা ধর্মকেই সুবাসরি অস্বীকার করছে। বাবা লালনের ভাষায় এরা একদম খাটি কাফের। খাটি ঘি, খাটি সরিষার তেলের মত এরা একশত ভাগ খাটি কাফের। তারপর বাবা লালন আর একটি কথা ঘোষণা করে আমাদেরকে আরো বেশি অবাক করে দিচ্ছেন, আর সেই কথাটি হল যে, এই যে একেই দর্শন ইহা লালনের নিজস্ব দর্শন নয়। ইহা লালনের মনগড়া কথা নয়। লালন নিজের মন হতে এরকম কথা ভুলেও বানিয়ে বলছে না। তা হলে প্রশ্ন আসে, যদি ইহা লালনের কথা না হয় তবে এই কথাগুলো কার এবং কে বলেছে? এই প্রশ্নগুলো উঠতে পারে এবং উঠা স্বাভাবিক মনে করেই তিনি

একদম সোজা কথায় ঘোষণা করলেন এই বলে যে, উহা কোরানের কথা। কোরানই বলছে যে, মুরশিদ, রসুল এবং আল্লাহ এক ও অভিন্ন এবং কোরানই বলছে যে, এই তিনটিকে যারা এক বলে মেনে নেবে না তারা খাটি কাফের। বাবা লালন এই কথাগুলোর উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করে বার বার কোরানের ঘোষণা বলে দাবি করেছেন। আবার সেই সঙ্গে বার বার এই কথাটিও বলেছেন যে, ইহা লালনের মনগড়া কথা নয়। বাবা লালন ফকিরের মত শক্তিশালী মহাসাধকের মুখে এই কথাগুলো পাঠকদেরকে একটি কারণেই সামান্য ভাবিয়ে তোলে যে, তিনি কোরানের কোথায়, কোন সুরার কত লাইনে বলা হয়েছে সেটা তুলে ধরেননি। গবেষক যখন কিছু একটা নতুন কথা পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেন তখন তার দলিলটি সঙ্গে জুড়ে দেন। কিন্তু এখানে বাবা লালন তা না করে বরং পাঠক সমাজের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। পাঠকসমাজই কোরানের এই দলিলটি খুঁজে বাহির করে নিক। বিরাট একটা দায়িত্ব পাঠকদের কাছে চাপিয়ে দিলেন বাবা লালন ফকির। চমৎকার একটি দাবি। এ দাবির সত্য-মিথ্যার দোটার দোলনায় পাঠক যেন দুলতে পারে তার সুন্দরতম পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। পাঠক মহাফাপরে পড়ে যায়। কোরানের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে না পড়লে লালনের এই কথার সত্যতা যাচাই করার উপায় থাকে না। অবশেষে কোরান পড়ে কেউ লালনের কথার সত্যটি পেয়ে যায়, আবার কেউ পায় না। যারা পায় না তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ এই না পাওয়াটাই ছিল তাদের তকদিরের লিখন। তকদিরে লিখা নেই তাই পায় না। লালন ফকির কি তা হলে সমস্ত কোরানের বাণী তন্ন তন্ন করে খুঁজে গভীর মনযোগসহকারে অধ্যয়ন করেছেন? যদি তা হয় তাহলে তার আরবি ভাষার উপর সাংঘাতিক দখল ছিল। আর যদি উনি কোরান না পড়ে থাকেন তা হলে কেমন করে কীভাবে এরকম সাংঘাতিক কথাটি ঘোষণা করলেন? এখন প্রশ্ন হল, মহানবীকে কিন্তু বৃকে কয়েকবার চাপ দিয়ে হেরাণ্ডহায় কোরান পাঠ শিখিয়েছেন হজরত জিবরিল (আঃ)। আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে বই দেখিয়ে পাঠ শিক্কা দেই সেরকমভাবে কিন্তু মহানবীকে শিক্কা দেওয়া হয়নি। আর একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তা হলে সিনায় সিনায় তথা বৃকে বৃকে চাপ দেবার মত কিছু একটা মারফতি রহস্য লুকিয়ে আছে যার মাধ্যমেই কোরান জ্ঞান অর্জন করা যায়। সাদা কাগজের উপর কালির তৈরী অঙ্করে সাজানো কোরান চোখে ও মুখে পড়া যায়। কিন্তু কাগজ আর কালিতে বানানো কোরানকে হাজার বারও যদি বৃকে জোরে জোরে চাপ দিতে থাকি তাহলে কি কোরান জ্ঞান অর্জন করা যাবে? যায় না। কারণ ইহা চাপ দেবার বিষয়ের বাইরে। ইহা মনোযোগ সহকারে পবিত্র মনে বার বার পড়তে হয়। তা হলে আবার প্রশ্ন আসে, মহানবীকে কাগজ-কালির লিখা কোরান দেখিয়ে পড়ার আদেশ না করে বার বার বৃকে চাপ দিয়ে কোরান-জ্ঞান দেবার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের প্রচেষ্টা কেন? এই অন্য ধরনের প্রচেষ্টাটি কি একদম রহস্যময়? একদম

গুপ্ত বিষয়? একদম মারফতি বিষয়? যদি মেনে নেই তা হলে মারফতকে অস্বীকার করা যায় না। আর যদি মেনে না নেই তা হলে তকদিরেই নেই। তাই যা তকদিরে লিখাই নেই উহা মানবে কী করে? দোষ দেওয়া যায় না। কারণ যাহা তকদিরে নেই উহা বরং আশা করাটাই দোষনীয়। সুতরাং সব কিছুতেই তকদিরের লীলাখেলা চলছে। যতই লাফালাফি করি না কেন, পুতলের সূতাটি যার হাতে আছে সে যেমনটি করে নাচাবে আপনাকে মনের অজান্তে এই ভবের নাট্যশালায় তিক তেমন নাচটিই দেখিয়ে যেতে হবে। তকদিরের সূতোটা বাতাসের চেয়েও চিকন। বাতাস অনুভব করা যায় কিন্তু তকদিরের খেলী অনুভব করার উপায় থাকে না।

ধরে নিলাম যে, লালন ফকির কোরান বুঝার মত আরবি ভাষা জানতেন না। তা হলে কোরানের অনেক রহস্যময় গোপন কথাগুলো অকের হিসাবের মত কী করে কেমনভাবে মিলিয়ে দিতে পারলেন? মুরশিদ, রসুল এবং আল্লাহ যে একই বিষয় এবং ইহা যারা মানে না তারা যে খাটি কাফের এই কথাগুলো যে কোরানের সূরা নিসাতে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে তা যারা পড়েছেন এবং জেনেছেন তারা লালনের বহু পূর্বের ঘোষণায় অবাক হবারই কথা। আবার আরো অবাক হবার কথা, যারা কোরান পড়েও লালনের কথার সত্যতা অস্বীকার করার বহু দলিল দাঙ করতে চায়, তা গোজামিলই হোক আর যেন তেন মারকা একটা মোটা বুঝই হোক, তাদেরকে কেমন করে দোষ দেবে? তকদিরে নেই তাই গোজামিল দিয়ে অস্বীকার। পৃথিবীর বৃক্কে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও অনেক বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা করে একদম নতুন নতুন জিনিস তৈরি করছেন, আবার অনেকে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও হা করে তাকিয়ে দেখে। যারা হা করে তাকিয়ে দেখছে তাদের কোন দোষ নেই। কারণ তাদের তকদিরে লিখা ছিল যে, তোমরা হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। সুতরাং দোহাই দোষ দিতে যাবেন না।

আত্মার বিজ্ঞানী বাবা লালন ফকিরের ঘোষণাটি হতে কয়টি লাইন হবহ তলে ধরলাম এবং তারপর চলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখাবো যে, লালনের কথাগুলো কোরানে আছে কিনা। লালনের কথাগুলো হল, নবী না মানে যারা, মোয়াহেদ কাফের তারা এই দুনিয়ায়। ভজনে তার নাই মজুরী দলিলে সাফ লিখা হয়। যে মুরশিদ, সেই তো রসুল, তাহাতে নাই কোন ভুলী, খোদাও সে হয়। এ কথা লালন বলে নাকো, কোরানে কয়, কোরানে কয়, কোরানে কয়। লালনের এই কথা কয়টি কোরানের চার নম্বর সূরা আল নিসার একশত পঞ্চাশ এবং একান্ন নম্বর আয়াতের সবটুকু না নিয়ে দুটি বাক্য নিয়েছেন। একশত পঞ্চাশ নম্বর আয়াত তথা বাক্যটিতে চারটি অংশ আছে এবং একান্ন আয়াতে আছে দুটি অংশ। লালন এই ছয়টি অংশ হতে দুটোকে নিয়ে রচনা করেছেন। একশত পঞ্চাশ নম্বর আয়াতের মোট চারটি অংশকে ভাগ করলে প্রথমে পাই : (১) যারা অস্বীকার

করে অথবা মেনে নিতে চায় না যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসুলদেরকে, (২) এবং ইচ্ছা করে অথবা এরাদা করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসুলদের মধ্যে পার্থক্য করে, (৩) এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস অথবা অস্বীকার করি,' (৪) এবং এই দুয়ের মধ্যবর্তী একটি পথ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে। তারপর একশত একান্ন আয়াতের মোট দুটি অংশ পাই : (১) তারাই খাটি কাফের, (২) এবং আমরা ('আমি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি) কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি।

এখন লালন যে দুটি অংশ নিয়েছেন সেই দুটি অংশের প্রথমটি হল, (১) ওয়া ইউরুদুনা আইয়ুফারিরকু বাইনাল্লাহি ওয়া রসুলিহি এবং (২) উলাইকা হমুল কাফিরুনা হাক্ক।

প্রথমটির হুবহু বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে ইউরুদুনার মূল শব্দটি হল এরাদা এবং এরাদার বাংলা শব্দটি হল ইচ্ছা করা এবং আইয়ুফারিরকুর মূল শব্দটি হল ফারকুন এবং ফারকনের বাংলা শব্দটি হল পার্থক্য। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, এটা আকাশ-পাতাল ফারাক, অর্থাৎ এই কথাটি বলে বুঝাই যে দুটো এক ও অভিন্ন নয় বরং দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এখন প্রশ্ন হল যে, এই পার্থক্য করা, এই দুটোকে এক বলে মেনে না নেওয়া, এক ও অভিন্ন জানাকে অস্বীকার করাটা কী কী বিষয়ের উপর কোরান ঘোষণা করেছে? কার মধ্যে পার্থক্য করতে বারণ করা হয়েছে? আলাদা করে দেখতে মানা করা হয়েছে? উভয়টিকে এক ও অভিন্ন বলে মেনে নিতে বলা হয়েছে। সেই উভয়টি কে কে? সেই দুটো বিষয় কার কার মধ্যে সম্ভাব্য? একটি হল স্বয়ং আল্লাহ এবং অপরটি হল রসুলেরা। একটু ভাল করে লক্ষ করে দেখুন, এখানে একজন রসুলের কথা বলা হয়নি বলা হয়েছে বহুবচনে তথা অনেক রসুলদের নিয়ে। একবচনে বলা হয়নি। আবার তার পরের বাক্যটি হল, 'তারাই খাটি কাফের' এবং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি।' এখানেও ভাল করে দেখুন, আল্লাহ নিজেকে একবচনে ব্যবহার করছেন না। বরং আল্লাহ নিজেকে আমি না বলে 'আমরা কাফেরদের' বলে বহুবচনটিকে ব্যবহার করেছেন। যদিও অনেকেই হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা শব্দটির উপর ছরি চালিয়ে দিয়ে আমি অনুবাদ করেন। কারণ আমরা লিখলে সাধারণ মানুষেরা শেরেক করতে পারে, তাই এই মহান কণ্ঠ্যটি পালন করা। এই রকম অনুবাদ করে করেই বাইবেলের অবস্থা হয়েছে বেদনাদায়ক। কারণ বাইবেলের মূল ভাষাটি যদি হুবহু থাকতো তা হলে অনুবাদের আসল চেহারা ধরা যেত। কোরান দেড় হাজার বছর ধরে হুবহু আছে বলেই চলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ এবং গবেষণা যে কেউ করতে পারেন। গবেষণা যদি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তাতে মূল কোরানের কিছুই যায় আসে না। কোরান কার কার মাঝে পার্থক্য করতে মানা করে দিয়েছে? 'বাইনাল্লাহি' তথা আল্লাহর মধ্যে 'ওয়া রসুলিহি' তথা এবং রসুলদের। এক কথায় আল্লাহ এবং রসুলদের মধ্যে

পার্থক্য করতে মানা করা হয়েছে। কারণ নামে বহু হলেও আসলে এক এবং অভিন্ন। যদি আল্লাহ এবং তার রসুলদের ভাগ করে ফেলি অথবা আলাদা করে দেখি অথবা পৃথক করার ইচ্ছা প্রকাশ করি তা হলেই কাফের হয়ে যাব। আবার বলা হয়েছে কী রকম কাফের বলা হবে? একটি বিশেষণ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বিশেষণ তথা খেতাবটি তথা টাইটেলটির নাম কী? হাককা অর্থাৎ প্রকৃত, খাটি, কোন ডেজালের বিকৃতমাত্র সন্ধেহের অবকাশ নেই। অর্থাৎ খাটি সরিষার তেলের মত একদম খাটি কাফের বলে কোরান ঘোষণা করেছে।

এবার আর একটি তলিয়ে দেখা যাক যে, এখানে রসুলদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নবীদের কথা বলা হয়নি। কেন নবীদের কথা বলা হয়নি? রসুলদের কথা কেন বলা হল? এর কারণ হল, মহানবী ইমাম্মে কেবলাতাইনের পর আর কোন নবী আসবেন না। মহানবীই হলেন শেষ নবী। তিনিই হলেন খাতামান নবী। খাতামান নবী বলতে বুঝায় যে তিনিই শেষ নবী। তার পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। নবুয়ত খতম তথা শেষ। এবার আরো একটি লক্ষ করে দেখি যে, কোরানের প্রথম সূরা ফাতেহা হতে শুরু করে নাস পর্যন্ত একশত চৌদ্দটি সূরার ভেতর প্রতিটি আয়াতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটিবারও বলা হয়নি এই বুলে যে, খাতামান রসুল। অর্থাৎ রসুল শেষ। রসুলের আগমন আর হবে না, এই কথা কোরানের কোথাও নেই। খাতামান রসুল শব্দটি তথা রসুলের আগমন শেষ হয়ে গেছে বলে একবারও বলা হয়নি। অথচ যতবার খাতামান শব্দটি কোরানে পাওয়া যায় সেখানে নবীর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রসুলের কথা নয়। যদি ধরে নেই যে, রসুলের আগে খাতামান শব্দটি ব্যবহার করা হত তা হলে বাবা লালন ফকিরের কথাগুলো ভুলের বাড়িতে পরিণত হত এবং উহা পচা ডোবাতে নিরপেক্ষ দৃষ্টির দ্বানদণ্ডে বিচার করে ফেলে দেওয়া হত। কিন্তু অরাক হই, বিশ্বয়ে অভিজ্ঞত হয়ে পড়ি এই ভেবে যে, বাবা লালন ফকির কত উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন। কোরানের উপর এত উচ্চ দর্শনে তার কথাগুলো দাঁড়িয়ে আছে যে, নিম্নমানের গবেষকদের তো প্রশ্নই উঠে না, বড় বড় গবেষকেরা পর্যন্ত হিম্মাসিম্ম খায়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রশ্নে বড়ে গোলাম আলী, নাজাকাত ও সালামাত আলীকে দেখে ভাল ভাল গায়কেরা শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেন। আবার আর একটি সামান্য তলিয়ে দেখা যাক। এখানে একজন রসুলের কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে রসুলেরা। একবচন নয় বরং বহুবচন। এখানে একটি কথা বলতে চাই যে, প্রত্যেক নবী অবশ্যই একজন রসুল, কিন্তু প্রত্যেক রসুল একজন নবী নন। কারণ রেসালত খতম হয় না। খতম হয় নবুয়ত। যেহেতু রেসালত খতম হয় না সেই হেতু রেসালত শেষ হয়ে যাবার প্রশ্নই উঠে না। রেসালত চলছে এবং চলবে ততদিন, যতদিন এই ধরার বুকে মানবের আগমন বন্ধ না হবে।

আবার এ বিষয়ে আর একটি তলিয়ে দেখতে চাই যে, কোরান আল্লাহ এবং রসুলদের মধ্যে আলাদা করতে মানা করেছে, কিন্তু লালন ফকির এই দুটো

বিষয়ের মধ্যে না থেকে বরং মুরশিদকেও টেনে এনেছেন। তিনি মুরশিদকেও এদের মধ্যে একাকার করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যিনি রসুল তিনিই মুরশিদ অর্থাৎ মুরশিদ, রসুল এবং আল্লাহ মোটেই আলাদা নন বরং নামে তিন হলেও আসলে এক ও অভিন্ন। প্রশ্ন আসে, লালন এরকম কথা কেন বললেন? তিনি ভাল করেই জানেন যে, একজন ফানাফিল্লাহ পারে কাম্মেলকেই রসুল বলা হয়। কারণ হেদায়েতের তথা পথ দেখানোর পূর্ণ যোগ্যতা এই জাতীয় পীরদের আছে। যারা হেদায়েত করার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন তথা ইনসানে কাম্মেল, তাঁরাই রেসালতপ্রাপ্ত এবং এই রেসালতের ধারা চলতেই থাকবে। তাই যারা সত্যিকার অর্থে কাম্মেল মুরশিদ তাঁরা প্রত্যেকে এক একজন রসুল এবং রসুলকে আল্লাহ হতে সামান্যতম আলাদা করার অবকাশ কোরান দেয় নাই। তাই কোরানে এরাদা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাকুল তথা বলার কথা ব্যবহার করা হয়নি। বলা তো দূরে থাক বরং আল্লাহ এবং তাঁর রসুলদের মধ্যে ভাগ করে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলেই সোজা কাকের বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাও আবার কাকের শব্দটির সঙ্গে হাক্ক নামক বিশেষণ-মার্কা একটি শব্দ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন ধরনের কাকের যে খাটি সোনার মত। এক রতি খাদও নেই। যাকে আমরা সলিড গোল্ড বলে থাকি। সেরকম এরা সলিড কাকের অর্থাৎ এক রতি মূলমান বলার সুযোগও দেওয়া হয়নি কোরানে। তাই লালন এদেরকে তার ভাষায় 'মোয়াহেদ কাকের তারা' বলছেন। মানে সম্পূর্ণরূপে তারা কাকের। আবার লালন বলছেন, এই জাতীয় কাকেরদের ভঞ্জে তথা ইবাদত-বন্দেগিতে কোন প্রকার ফল পাবার আশা একদম বুখা এবং এটা কোরানেরই কথা। কারণ কাকেরদের ইবাদত-বন্দেগিতে যে কোন লাভ হয় না সে কথা কোরান বহুবার বহু রকম ভাষায় বলেছে। এটা একটা সাধারণ মানুষও ভাল করেই জানে।

এবার আমরা আর একটু তালিয়ে দেখি যে, আমাদের মুসলিম সমাজে এত বড় কোরানের সত্য কথাটিকে কেন লুকিয়ে রাখি? অবশ্য সবাইকে বলা হচ্ছে না। বিশেষ করে কিছু আরাবি ভাষা জানা আল্লেম ও পীর (?) নামের কুলান্কারেরা কোরানের এই কথার ঠিক সম্পূর্ণ উল্টা অর্থটি বুঝিয়ে থাকে। এর ফলে সাধারণ মানুষেরা বাধ্য হয়ে বিভ্রান্ত হয়। সাধারণ মানুষেরা এই মৃতপার্থক্যের যাতা কলে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিভ্রান্তির অভিশাপ এভাবেই সমাজের বুকে নেমে আসে। গবেষকদের কথাগুলো যাচাই করার মানসিকতা আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি। সহনশীলতা, পরমত সহ্য করার মনু মানসিকতা যে জাতি একবার হারিয়ে ফেলে সে জাতি তার মূল চরিত্রের ভিত্তিটাই আর খুঁজে পায় না। খ্রিস্টান জাতি হতে শুরু করে ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে আজও প্রভু যিশু, প্রভু মুসা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ গুনতে পাই। অথচ মুসলমানেরা মহাপ্রভু মোহাম্মদ (দঃ)-কে কোথায় যে নামিয়ে ফেলেছে তার সামান্যতম নমুনা আজানের দোয়ার মধ্যেই পরিষ্কার বুঝা যায়। হিঃ হিঃ একবার এক মুহূর্ত আমরা

আমাদের বিবেক আর সত্তাকে প্রশ্নও করতে শিখিনি যে, এই আজানের দোয়াটি তো কোরানের কোথাও নেই। তবে এটা এল কেমন করে? কারা প্রচলন করলো? এটা আমির মোয়াবিয়া হতে চালু হয়েছে, যে আমির মোয়াবিয়া মহানবীর বংশের উপর জঘন্য ভাষায় গালাগালি করতেন। তাও আবার রাজধানী দামেস্কের জামে মসজিদে জুম্মা নামাজের খোতবা দেবার সময়। মুসলমানদের ভাগ্য কতই না সুন্দর যে, আজও আসল আর নকলের লাভভা পাকিয়ে বিভ্রান্তির বড় বড় পাহাড় বানিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই লাভভা কী কী তরকারি দিয়ে পাকানো হয়েছিল তা গবেষণার মাধ্যমেই ধরা পড়তে শুরু করেছে। কারণ মূল কোরানুখানি ঠিকই আছে, যদিও ব্যাখ্যা যা ইচ্ছা তাই হোক না কেন। তাতে কোরানের কিছুই যায় আসে না। কোরানের আসল রূপখানা বেরিয়ে পড়বেই এবং কিছুটা ধরা পড়া শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কোরান গবেষক তার সমস্ত জীবনটাই নিরপেক্ষ গবেষণা চালিয়ে কোরানের তফসির লিখেছেন। সেই গবেষকের নাম হল সুফি সুদর উদ্দিন আহমদ চিশতী সাহেব।

আর একটি তলিয়ে দেখি, আমাদের মধ্যে অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরানের কথা, আল্লাহ এবং তার রসুলদের মধ্যে পার্থক্য করি না এবং লালনের কথা, যে মুরশিদ, সেই তো রসুল, খোদাও সে হয়, লালন বলে নাকো, কোরানে কয় কয়জন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছি? এই কথাটি কোরানে থাকা সত্ত্বেও আমরা এর বহুসংখ্যক বারবার চেষ্টা কয়জন করেছি? আমরা ভাবের আদান-প্রদান করার মানসিক বৈয় এবং সহনশীলতার পরিবর্তে গালাগালি হতে শুরু করে হাতাহাতি করতে পর্যন্ত লজ্জা পাই না।

আবার আর একটি না হয় তলিয়ে দেখি যে, কেবল লালন ফকিরই কি কোরানের এই মহাসত্য কথাটি তুলে ধরেছেন? না। এই কথাটি লালনের বহু আগেই অনেক কামেল পীর-মুরশিদেরা তুলে ধরছেন। কোন অলিয়ে কামেল একদম সোজাসুজি তুলে ধরছেন, আবার কেউ ভাষায় শৈলীতে একটু অবগুণ্ঠন দিয়ে প্রকাশ করেছে। যেমন হজরত বু আলী শাহ কলন্ডর বলেছেন, বা শাকলে শায়েখে দিদাম মোস্তফারা, না দিদাম মোস্তফারা বালকে খোদারা। বাংলায় অনুবাদ করলে অর্থটি হয়, পীরের চেহারার মধ্যে মোস্তফাকে দেখলাম এবং উহা কেবল মোস্তফাকে দেখা নয় বরং আল্লাহকেই দেখলাম। এখানে সর্বপ্রথম আপন পীর ও মুরশিদের রূপে মহানবীকে দেখলেন এবং সেই মহানবীকে নবীরূপে না দেখে আল্লাহকে দেখার কথা ঘোষণা করলেন বু আলী শাহ কলন্ডর। মুরশিদ, রসুল আর আল্লাহ নামে তিনজন হলেও আসলে যে এক ও অভিন্ন কোরানের সেই ঘোষণাটি হবই মিলে গেল। সত্যের দর্শন হলে, সাধকেরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, কথার মূল বক্তব্যটি এক রকম হতে বাধ্য। যদিও জাতিগত ভাষার বিভিন্নতায় প্রকাশভঙ্গির রূপ ও ঢং অনেক রকম হতে পারে। এই জ্ঞান সাধকেরা বাহির হতে অর্জন করেন না। কারণ বাহির হতে এই মহাসত্যের জ্ঞান অর্জন

করার বিধান নেই। এই জ্ঞান আপন অস্তিত্বের যখন পূর্ণ বিকাশ ঘটে তখনই সাধক কোরানের বাণী যে মহাসত্য তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারেন। আপন অস্তিত্ব বলতে এখানে সাধকের আপন দেহ ও মনের কথা বুঝায়। প্রতিটি দেহের মধ্যে সাতটি নিম্ন স্তরের ধাপ এবং সাতটি উচ্চ স্তরের ধাপ এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয় অবস্থান করে এবং সব মিলে হল ঊনিশ। এই ঊনিশের দেয়াল ভাঙতে গেলেই সাধককে তিলে তিলে জ্বলতে হয়। মনোবিজ্ঞানের প্রতিটি দেয়াল সাধনা এবং আপন রবের রহমতে যখন ভেঙে ফেলতে পারবেন, তখন সাধকের কাছে কোরানের বাণীগুলো যে এক একটি মহাসত্য তা আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠে। সূরা মোদাশশেরে উনত্রিশ এবং ত্রিশ আয়াতটির গোপন রহস্য সাধক তখনই বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন যে, কত নিখুঁত কত নিপুণ কোরানের বাণী। সাধক তার আপন অস্তিত্বের মাঝে ঊনিশের খেলী শেষ করে কেবল মুরশিদ, রসুল আর আল্লাহকে এক ও অভিন্ন দেখতে পান না, বরং সৃষ্টি ও সৃষ্টা নান্দিক যে দুইটি রূপের কথা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে সেই দ্বৈতবাদের দর্শনটিকেও চিৎকার করে ঘোষণা করেন যে, দ্বৈতবাদের যে দর্শন উহা নিছক একটি মায়ার দর্শন, উহা মরুভূমির বালিতে জলের ঢেউ দেখার একটি মেকি প্রত্নতাত্ত্বিক দর্শন। দ্বৈতবাদকে তখন বিদায় করে দিতে হয় না, বরং নিজে নিজেই বিদায় গ্রহণ করে এবং অদ্বৈতবাদের মহাসাগরে সাধকের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। স্বাভাব্য আপনিই যায় হারিয়ে। এখানেই মহামিলন। এখানেই চিরস্থায়ী প্রেমরাজ্যের অবস্থান। এখানে বলপ্রয়োগ নেই। এখানে বিনিময় নেই। কারণ বলপ্রয়োগ আর বিনিময় হল মেকি। তাই টিকে না। যোন ভালবাসায় বিনিময়ে যদি ভোগ হয় তা হলে সেই ভালবাসা টেকে না। কারণ বলপ্রয়োগ আর বিনিময়ের কেন্দ্রীয় দর্শন হল ভোগ। এই ভোগের দর্শনে যারা ডুবে আছে তারা দুদিন আগে না হয় দুদিন পরে বিবেকের কাঠগড়ায় আসামীর ভূমিকায় বোবা ফ্রাসট্রেশন তথা নেরাশ্যের বোবা জ্বালায় জ্বলতে থাকে। সূরা মোদাশশেরে ছাব্বিশ হতে আটশ নম্বর আয়াতে দেড় হাজার বছর আগেই তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যত সূক্ষ্ম করেই বুঝানো হোক না কেন, অকুণ্ঠ যন্ত্রির দর্শন দাঙ করিয়ে বুঝাতে চাইলেও বুঝা যায় না। কারণ ইহা যে বাহির হতে বুঝবার কোন বিধান দেওয়া হয়নি। আপনিকে দেহ ও মনের অস্তিত্বের মধ্যে চুপি চুপি প্রশ্নবাণে আহত করে সাধনার পথে এগিয়ে নিতে পারলেই আপন রবের রহমত নাজেল হতে থাকে ধাপে ধাপে। আর প্রতিটি ধাপে সাধক রূপের লাবণ্যদর্শনে অভিভূত হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। বৈভবের ঠমক দেওয়া সোনার সিংহাসনে বসেও তখন সাধক নীরব। সাথীদের জলুসায় হাজার আলাপনের মাঝে থেকেও একা। বাহিরের মানুষেরা কেবল বাহিরটাই দেখতে পায় আর কত রকম কথা বলাবলি করে, কিন্তু সাধকের অস্তিত্বের মাঝে যে অনেক আগেই বাহিরের ভাল-মন্দের আপেক্ষিক সমালোচনাগুলো একাকার হয়ে গেছে।

এবার দেখি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মণ্ডলানা জালাল উদ্দিন রুমী কী বলছেন :
 পীরের জাতি খোদা, এক নাদিদ, নাই মরিদ, নাই মরিদ, নাই মরিদ। বাংলায়
 অনুবাদ করলে হয়, 'পীরের জাতি (নূর) আল্লাহরই জাতি (নূর)। উভয়কে একরূপে
 দেখতে না পারলে সে মরিদ হয়নি (৩)' মণ্ডলানা রুমী সাহেব এখানে রসূলকে
 টেনে না এনে সরাসরি আল্লাহর কথা বলেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে কীমেল
 মুরশিদই হলেন রসূল তাই সরাসরি বলেছেন। ভাষার শৈলীটি একটু আলাদা
 ধরনের। কারণ পীরের জাতি এবং আল্লাহর জাতি যে এক, অভিন্ন এবং অখণ্ড এই
 রহস্যের দর্শন এবং মিলন যাদের হয়নি তারা মরিদ হতে পারেনি বলে তিনবার
 ঘোষণা করেছেন। নামে মরিদ হওয়া, মরিদের খাতায় নাম লিখানো হয়েছে,
 আমন্ত্রণে মরিদ হয়েছে, কিন্তু এই রকম নামে মাত্র মরিদানদেরকে রুমী
 সাংঘাতিক জোরের সাথে ঘোষণা করেছেন যে, এরা মরিদ হয়নি কারণ এরা পীর
 এবং আল্লাহর জাতি যে এক ও অখণ্ড এই দর্শন লাভ করতে পারেনি। অর্থাৎ এক ও
 অভিন্ন রূপে দর্শন করার জন্যই মরিদ হতে হয়। অথচ যদি তা না হয়ে থাকে তা
 হলে মরিদ হলেও মরিদ নামের কোন যোগ্যতাই বহন করে না এবং যোগ্যতা বহন
 না করলে এরা মরিদ নামের কলঙ্ক। যদিও এই কলঙ্কটি জঘন্য ধরনের নয় বরং
 ভালবাসার দাগ-লাগা কলঙ্ক। এই শ্রমের আচড়-লাগা কলঙ্কের অবসান কেমন
 করে এবং কখন হতে পারে? যখন পীর এবং আল্লাহর জাতিকে এক ও অভিন্ন রূপে
 দর্শন লাভ করার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে। এখানে একটি বিষয় বলে
 রাখতে চাই যে, মণ্ডলানা জালাল উদ্দিন রুমীর রচিত মসনভী শরীফটিকে তিনি
 নিজেই ফারসি ভাষায় মানুষের রচিত কোরান বলে ঘোষণা করে গেছেন এবং
 একমাত্র ওহাবিরা ছাড়া পৃথিবীর সব মুসলমানেরা বিনাবাক্যে মাথা নিচু করে
 মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইহা একটি বিরাট গ্রন্থ। ইহার কিছুটা বাংলা ভাষায়
 অনুবাদ পাওয়া যায়, তাও অনুবাদের নামে মনগড়া কথার ভাগটা বেশি হওয়াতে
 আসল বিষয়টা ফুটে উঠতে পারেনি। কারণ অনুবাদের আর এক নাম হল
 বিশ্বাসঘাতক। নিরপেক্ষ না থেকে কেমন করে নিজের কথা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়
 সেই ফিকিরে থাকলে উহা অনুবাদ হয় না। বরং মূল লেখককে করা হয় কলঙ্কিত।
 ওহাবিরা যে চারজনকে কাফিরে আকবর তথা সবচেয়ে বড় কাফির ফতোয়া
 দিয়েছে, সেই চারজনের মধ্যে মণ্ডলানা জালাল উদ্দিন রুমীও একজন। অন্য
 তিনজনের নামটাও পাঠকদের জন্য জানিয়ে দিলাম। আমাদের বড়পীর গাউসুল
 আজম আবদুল কাদের জিলানী, ইমাম গাজ্বালী এবং মহিউদ্দিন ইব্রাহীম আরাবী।
 বিখ্যাত সুফি বাবা ফরিদ উদ্দিন আত্তারের কয়টি কথা ফকিরি লাইনের মানুষের
 জন্য খুবই মূল্যবান এবং মনে রাখার মত এবং মুখস্থ করে রাখা ভাল। তিনি
 গালবাতির হালে তথা মোরাকাবার হালে নিজেই নিজেকে বলছেন এই বলে যে
 'আসলে তুমিই সমস্ত জগতের জীবন! তুমিই বাহির এবং ভেতর। তোমার রূহ
 "লাওহে মাহফুজ" যেখানে আল্লাহর কলিম লিখা থাকে। তুমিই আসলে পবিত্র

কোরান।' মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবীর মূল কথাটি হল এই যে, 'আল্লাহ নিজেই অবিরাম প্রকাশ করে চলছেন। যা কিছু আল্লাহর মধ্যে লুকিয়ে থাকে সেটাই প্রকাশ হয়ে চলেছে এবং এই প্রকাশ হওয়াটাই হল বিরাট অনুষ্ঠান। আসলে আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি করেন না।' (দ্বি ফিলোসফি অব ইবনুল আরাবী-পৃষ্ঠা নং উনত্রিশ)। ইবনুল আরাবীর দর্শনের বিচারে নাস্তিক্যবাদ বলে কিছুই থাকে না। নাস্তিক্যবাদটি এখানে আত্মবিরোধ এবং এর অনুসারী নাস্তিকেরা এক একটি মায়াদাদের মদ পান করে বদ্ধ মাতাল। এই নাস্তিক নামক মাতালেরা সংশয়ের ধামায় ফেলে দেয়। সর্বনাশ ডেকে আনে। অবশ্য তকদিরের দোষে এরা নাস্তিক। সপক্ষে জন্মগ্রহণ করলে ব্যাঙই তো প্রধান খাদ্য হতে হবে।

বাংলাদেশের বিখ্যাত এবং শুদ্ধেয় আকরাম খা সাহেব ওহাবি দলের একজন নেতা ছিলেন। উনার রচিত মৌস্তফা চরিত এবং ছয়খণ্ডে রচিত কোরান তফসির পড়লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। অবশ্য আমরা তাকে শ্রদ্ধা এজন্যই করি যে, তকদিরে যা লিখা আছে তাই তো হবে।

আরো একটি অবাক হবেন এই কথা শুনে যে, বিখ্যাত মাওলানা রুমী য়ার কাছে মুরিদ হয়েছিলেন তিনি লিখা-পড়া জানতেন না। নিরুন্ধর ছিলেন। তার মুরশিদের নাম রাবা সামসেত্তারাজি। নিরুন্ধর পীর সামসেত্তারাজির কাছে কোন ধরনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য মুরিদ হতে গেলেন? কলমের জ্ঞান যার কাছে নেই তার কাছে কী ধরনের জ্ঞান থাকতে পারে? মহানবীকে বার বার চাপু দিয়ে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল সেই জ্ঞানের রহস্যটা আমাদের মত কলমওয়ালা বিদ্বানদের সত্যিই ভাবিয়ে তোলে। অথচ আজকের জামানায় এরকম আজব কথা চালু হয়ে গেছে যে, পীর হতে হলে কোরান, তফসির, হাদিস এবং ফেকা শাস্ত্রের উপর ভাল পড়াশুনা অবশ্যই থাকতে হবে। কথাটা কিন্তু একদম মিথ্যা নয়, কারণ এই জাতীয় পীরেরা হল শিক্ষক আর ছাত্রের মত। আমরা এই জাতীয় পীরদেরকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আবার এও বিশ্বাস করি যে, এই জাতীয় পীরদের থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। আমাদের তকদিরে আগেই লিখা হয়ে গেছে যে, এই জাতীয় পীরদের থেকে যত দূরে থাকতে পার ততই মঙ্গল হবে। তাই তকদিরের লিখা খণ্ডাবো কী করে! আর সেই সঙ্গে সুরা ফুরকানের সাতাশ নম্বর আয়াতটির কথা বার বার মনে পড়ছে, 'সেই সম্মুখ জ্বলন্ত নিজেই হাতের উপর কামড় দিয়ে বলবে, 'হায়! আমার দুঃখ, যদি আমি রসুলের সাথে পথ ধরতাম।'

এবার আমরা সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরীর কয়টি কথা তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেছেন, চু জুমলা ফানা গাসতে বত হে চুনামনদা, খাহে কে আনাল্লাহে বশু খাহে কে হআল্লাহী। অর্থাৎ 'যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে ফানাফিল্লাহ হয়ে যাও তখন ইচ্ছা হয় বল তুমি আল্লাহ অথবা সে আল্লাহ।' খাজা বাবার এরকম কথা অনেকগুলো তুলে ধরা যায় যা আরো বিশ্বাসকর এবং সব গোপন কথা একদম ফাস হয়ে পড়ে। বড় পীর সাহেবের পর এত বড় শক্তিমান পীরের

স্থান সবাই তাঁকেই দিয়ে থাকে। কারণ পাক-ভারতে মুসলমান বানাবার মহান তবলিগের বিরাট দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তিনি মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে দ্বানের দাওয়াত দেননি। বরং আপন পীর ও মুরশিদ বাবা উসমান হাকুনী বান্ধার দেওয়া রিয়াজত ও সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে নিজেই স্বয়ং জীবন্ত তবলিগ হয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ অন্য ধর্মের মানুষেরা তাঁর কাছে বহু দূর হতে আসতেন এবং মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন। এভাবে প্রায় হাজার বছর আগে বিরানবাই লক্ষ অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে মুসলমান বানিয়ে গেছেন। তবলিগের জন্য তিনি ঘরে বেড়ান নি বরং নিজেই হয়েছিলেন একটি জীবন্ত তবলিগ। যার স্পর্শে বড় বড় যোগীরা পর্যন্ত মুসলমান হয়েছেন। রাম সাধু, রাজীব সাধু, ত্রৈলোক্য সাধু, দেও সাধু এবং জয় পালের মত বহু সাধুরা মুসলমান হয়েছেন। কোথায় খাজা বাবার তবলিগের আদর্শ আর কোথায় বিংশ শতাব্দীর তবলিগ। বুকে হাত রেখে তাঁণ্ডা মাথায় পাচ মিনিট একদম নিরপেক্ষ বিচারক হয়ে বিচার করে দেখুন তো! সেই বিচারের রায়টি আপনাদের হাতেই তুলে দিলাম। তবে তকদিরে যা আপনার জন্মের আগেই লিখা হয়ে আছে সেই তকদির অনুসারেই তো বিচার করতে পারবেন।

খাজা বাবার পীরের একটি অতি গোপন কথা আজ তুলে ধরতে চাই। কারণ এত মতপার্থক্য আর এত ফতোয়ার ছড়াছড়ির সময় তুলে ধরতে বাধ্য হলাম। তিনি বলেছেন, খুশা রিনদি কে পামলাশ কুনাদ সাদ পার সায়েরা, সাহেবে তাকোয়াকে মান বা জুব্বা ও দাসতার মি রাকসীম। অর্থাৎ ‘শত ফরজ এবাদত হতেও পীরের পদতলে পড়ে থাকাকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ তাঁর তাকোয়ায় ডুবে কেবল আমিই নাচি না বরং আমার জুব্বা দাসতারও নাচে।’ খাজা বাবার প্রধান খলিফা এবং মুরিদ বাবা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী সব সময় সঙ্গীতে বিভোর হয়ে থাকতেন। যখন শেখ আইয়ুব জামের ফারসি ভাষায় রচিত ‘কোশতেগানে খনজরে তসলিমবা, হর জুমা আজ গায়বে জানে দাগারাস্ত।’ এই বাক্যটি যখন শুনতেন তখন তিনি কাটা মোরগের মত ছটফট করে নাচতে থাকতেন। এই জাতীয় নাচকে ফারসি ভাষায় ‘বিসুমিল’ বলা হয়। বাক্যটির অর্থ হল, ‘নিজেকে সপে দেবার তরবারিতে যারা শহিদ, সবসময় তারা গায়বে হতে নতুন প্রাপ্য পেয়ে থাকেন।’ হাফেজ সিরাজীর কথাগুলো এতই উলঙ্গ যে, তিনি তাঁর দিওয়ান রচনা করতে গিয়ে প্রথমেই ‘আপন পীরের নামে গুরু করলাম’ বলে ঘোষণা করেছেন এবং তারপরের লাইনগুলো এতই উলঙ্গ যে তথাকথিত মোল্লারা কেবল কাফের ফতোয়াটিই দান করেনি বরং সবচাইতে বেদনাদায়ক বিষয়টি হল তার জানাযা পর্যন্ত পড়েনি। সত্যিই, দুনিয়ার বিষয়টিতেও অনেক সময় দেখা যায় যে, খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং মুক্ত চিন্তাবিদেদেরা একদম অসহায় হয়ে পড়ে। কারণ তাদের অনুশীলনের ধাপ এত উচ্চতায় উঠে যায় যে, আর বুঝাবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যায় না। তাই হয়তো আইনস্টাইন দুঃখ করে বলেছিলেন যে, ‘এ

জ্ঞানের বোঝা সইতে পারছি না প্রভু। আর যারা পীরে কামেল (বাজারের সম্মুখ
পীর-ফকির নয়) তাদের জ্ঞানের সামনে আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিকেরা শিশুর
মত অবোধ। কারণ বস্তুর বিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞান যে আত্মার বিজ্ঞানীদের সামনে
বোবার মত তাকিয়ে থাকে। তাই দর্শনের ভাষায় যা বোঝা যায় না তা
অজ্ঞেয়বাদ। এই অজ্ঞেয়বাদের বিশেষণটি আত্মার বিজ্ঞানীদের কাছে চাপিয়ে না
দিলে বস্তু আর মনোবিজ্ঞানকে যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে হবে। কারণ
সিদ্ধান্ত গৌজামিনু আর গাজখুরি জাতীয় যা একটা হেকি না কেন নিতেই হবে।
কারণ মানবীয় চরিত্রের এটাই শেষ কথা বলে দর্শন লজ্জায় রায় দিতে বাধ্য হয়।

দ্বৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর জগদীশ বাবু বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বিষয়ের
গুরুতাকুর। তাদের উভয়ের ব্যাকরণ পড়লে ভাষাজ্ঞানের প্রশ্নে অবাক হতে হয়।
বাংলাভাষার দুই মহারাজা কি তাই বলে বড়মাপের সাহিত্যিক অথবা কবি? তারা
কি শরৎবাবু, মানিকবাবু, রবীন্দ্রাকুর আর নজরুলের ধারে কাছেও যেতে
পেরেছেন? পারেননি। এটা সবাই জানে। মাদ্রাসায় লিখাপড়া করে আরবি ভাষার
জাহাজ হাওয়া এক কথা, আর কোরানের গভীর রহস্য জানা সম্পূর্ণ অন্য কথা।
এই অতি সামান্য বিষয়টি নিয়ে আমরা অনেকেই বিরাট ভুল করে বুসি। আমরা
মনে করি যে, আরবি ভাষায় যখন মহাপণ্ডিত তা হলে কোরানের গভীর জ্ঞানটিও
আশা করি। এই আশা করাটা যে কত বড় বোকামির লক্ষণ তার জুলন্ত প্রমাণ হল,
যাদের মাতৃভাষাটাই আরবি এবং আরবি ব্যাকরণ ভালভাবে জানেন, তারা কেন
কোরানের উপর মূল্যবান তফসির দিতে পারছেন না? কারণ এরকম আশা
করাটাই পাগলামি। বিদ্যাসাগর ব্যাকরণেই সাগর, কবিতাতে ননু আর রবীন্দ্রাকুর
ও নজরুল কবিতারই সাগর, ব্যাকরণের নন। এই বিষয়টি যখন আমরা
পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো তখনই মূল্যায়নের আদর্শটি স্থান করে নিতে পারবে।
এর আগে নয়। আমরা কামারকে দিয়ে কুমারের কাজটা আশা করি, আমরা চক্ক
বিশেষজ্ঞকে দিয়ে স্তদ্রোগের চিকিৎসা আশা করি, অপারেশন যেখানে করতে
হবে সেখানে টেবলেট আর ক্যাপসুল নিয়ে মাথা ঘামাই। আর এরই দরুণ
শুক্লখলার রুমবিকাশের ধারাগুলো পড়ে পড়ে বাধা পায়। আর এই বহু বাধাগুলো
পরিণত হয় আত্মবিরোধের বাড়িতে। আর এই আত্মবিরোধের বাড়িগুলো উপহার
দেয় অবিশ্বাস, ঘৃণা, হালকাভাবে মেনে নেওয়া। জীবন এবং গতির মাঝে ফুটে উঠে
বিরাট ফাটলের বৈসাদৃশ্য। নাকি কান্না, সন্ধেহের প্রতারণা, মরা গাধার গালে
থান্ড মারা, অনেক পাখির অনেক রকম রেসুরো চিংকারগুলো প্রসারিত আলোর
উপর টুকরো টুকরো মেঘ হয়ে আলো-আধারের লুকোচুরির দোলনায় মানব
সমাজ তখন দুলতে থাকে। আলোর বন্যা স্বাধীনভাবে গড়িয়ে পড়তে পারে না
সবার মাঝে। তাই তো এত সুন্দর পাখিবাটা পাচশত কোটি মানুষকে আজো দিতে
পারল না একটা সুন্দরতম সমাধান, পারল না একটা প্রশান্তির সুখনিঃশ্বাস ফেলে
হাসতে।

আর একটু না হয় তুলিয়ে দেখি। পৃথিবীতে বাস করা পাঁচ ছয় শত কোটি মানুষগুলো ইচ্ছে করেই মনে হয় শান্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। সবাই দলগত সাইনবোর্ড কাধের উপর বালিয়ে চিৎকার করে এটা সেটা বলতে ভালবাসে। নিজেদের সাইনবোর্ডটা চমৎকার, অতুলনীয় বলে জাহির করতে বড় ভাল লাগে। শেঠের দাবী সবাই করে যায় তাদের নিজেদের বক্তব্যের যুক্তি দিয়ে। এরকম মনোবৃত্তি গণতন্ত্রের জন্ম দিতে পারে না, বরং গণতন্ত্রের নামে নিজেদের মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়। একমাত্র অবাধ গণতন্ত্রই যে মানবীয় মূল্যবোধের চ্যাবিকাঠি সেটা তেকে তেকে শিখছে। তবু আমিতু নামক বেহায়া পাঠাটা গণতন্ত্রের দড়ি ছিঁড়ে লাফাতে চায়। কারণ আমিতু নামক পাঠাটা মানব ইতিহাসের প্রথম হতে অমর হয়ে আছে। এ আমিতু নামক পাঠাটা মরে নাই, মরে না। তাই গণতন্ত্রের লাগাম দিতে হয়। এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এই গণতন্ত্রের লাগাম অসহ্য। ছেড়ে দেওয়া পাঠারা কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত লাফায় আর আক্রমণ করতে ভালবাসে। আপন মতবাদকে গবেষণার লেবরেটরীতে নিয়ে যেতে হবে জোর করে। প্রমাণ করতে হবে কোনটা সঠিক। অনুভূতির দুর্বলতার এখানে তাই দিতে নাই, যদি পৃথিবীতে একটা সত্যিকার শান্তিময় পরিবেশ তৈরি করতে চাই। আমরা পিতা মূলমানু বলে আজ আমিও মূলমান। যদি আমার পিতার নাম হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী, আর পার্শী ধর্মের থাকতো, তা হলে আমাকে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সব ধর্মের মানুষরূপে পরিচিত হতে হত। এই বিষয়টিতে কি তকদির তথা ভাগ্যকে টেনে আনতে হবে? সমস্ত ধর্মের মূল দর্শন যে একই দর্শন, সমস্ত ধর্মই যে আসলে এক ইসলাম ধর্ম এটা আমরা কেউ মেনে নিতে পারছি না। মেনে নেবার আস্থান জানালে এক বোঝা গবেষণার অকাট্য দলিল সবাই হাজির করবেন। প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে অবশ্যই কমপক্ষে একজন রসুল পাঠানো হয়েছে এবং সেই রসুলকে সেই বিশেষ জাতির ভাষায় আল্লাহর নির্দেশন বর্ণনা করার কথা কোরান অনেকবার বলেছেন। তা হলে একটি অতি সামান্য প্রশ্ন আসে যে, পৃথিবীর সবগুলো জাতির মধ্যে রসুল পাঠানো হয়েছে এবং সেই অনেক রসুলেরা কি একটি মাত্র আল্লাহর ধর্ম ইসলাম তথা আত্মসমর্পন তথা শান্তির ধর্মের কথা প্রচার করে যাননি? বহু দেশের বহু জাতির বহু ভাষার বহু রসুলদের মাধ্যমে কি একই মূল বক্তব্যটি প্রচার করে যাননি? মূল বক্তব্যটির প্রকাশভঙ্গি অনেক রকম হওয়াতে মূলের সঙ্গে তাল মিলাতে পারছি না বলেই তো এত অশান্তি। তার উপর এক দল অপর দলকে ধর্মের অসারতা প্রমাণ করতে কোমর বেধে লেগে যায়। অনেকটা চালুনি সূচকে বলে যে তোর কেন ফুটো। নিজের যে হাজারো ফুটোগুলো হা করে আছে সেটা দেখবে না। দেখিয়ে দিতে গেলেই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ তুলে হে হে রে রে কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। আর এর ফলে যে কত মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে সেটা পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাস পড়লে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। বিশাল ইসলামের অনেক খণ্ডিত রূপ একে অপরকে অস্বীকার

করছে। আমরা মৌল্য দিয়ে মহাপ্রভু মোহানন্দ (দঃ)-কে বিচার করি, ইহাদিদের দিয়ে প্রভু মূসা (আঃ)-কে বিচার করি, যাজক দিয়ে যিগ্ম খ্রিস্টকে বিচার করে আড়াই হাজার ফেরকা তৈরি করি, খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে বিচার করি, পাণ্ডা পুরোহিত দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিচার করি, আর বৌদ্ধ ভিক্ষু দিয়ে প্রভু গৌতম বুদ্ধকে বিচার করি। এই বিচার যে কত বড় অবিচার, কত বড় জঘন্য অপবাদ, কত বড় নোংরামির দৃশ্যগুলো দেখতে হয়েছে, ইতিহাস সেই কথাটি বার বার বলে দিচ্ছে অথচ শিক্ষা গ্রহণ করছি না আমরা কেউ। মানুষের ভেতর আমিত্ব নামক ভয়ানক পাঠাটাই, ভয়ানক খান্নাসটি, ভয়ানক অসুরটি, ভয়ানক মায়োটি পৃথিবীতে শান্তি এনে দিতে পারেনি। কিন্তু বিংশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এর একটা সমাধান অবশ্যই করতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে উদার মনে, এগিয়ে আসতে হবে সাইনবোর্ড ফেলে, এগিয়ে আসতে হবে একটা সম্মোচার মাধ্যমে। কিন্তু ভয় হয় এ আমিত্ব নামক পাঠাটার চেহারা দেখে, খান্নাসটার সুরতের বাহার দেখে। কারণ এ পাঠাটা, এ খান্নাসটা মরে নাই এবং মরবে কিনা জানি না।

এখানে মহাপ্রভু মোহানন্দ (দঃ)-এর একটি বাণীর কিছুটা নিজের ভাষায় তুলে ধরলাম, 'যার মধ্যে এক বিদ্ধ ঈমান আছে সে নরকে যাবে না এবং যার মধ্যে এক বিদ্ধ অহঙ্কার আছে সে স্বর্গে যেতে পারবে না।' হাদিসটির ভাষা এবং বাক্যগঠন অতি চমৎকার। যদি সামান্য ব্যাখ্যা করি, তা হলে এই দাঁড়ায় যে, একবিদ্ধ অহঙ্কার থাকলে একবিদ্ধ ঈমান থাকছে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আবার একবিদ্ধ ঈমান থাকলে একবিদ্ধ অহঙ্কার থাকছে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একবিদ্ধ ঈমান আর একবিদ্ধ অহঙ্কার দুটো সম্পূর্ণরূপে দুই মেরুতে অবস্থান করার কথা মহাপ্রভু মোহানন্দ (দঃ) আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন। মাওলা আলী একবার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে আঘাত হানতে যাচ্ছেন, তিক সেই মুহূর্তে সেই শত্রু মাওলা আলীর উপর খত নিক্ষেপ করলেন এবং ইহাতে মাওলা আলী তাকে ছেড়ে দিলেন। শত্রু নিশ্চিত মৃত্যু হতে বেচে গিয়ে মাওলাকে প্রশু করতে মাওলা বললেন যে, ব্যক্তিগত শত্রুতার করণে যুদ্ধ করতে আসিনি, কিন্তু যখন খত নিক্ষেপ করেছিল তখন আমার খুব রাগি হয়েছিল বলে ছেড়ে দিলাম। সত্যিই মহাপ্রভু মোহানন্দ (দঃ) বলেছিলেন যে, 'আমি এবং আলী একই নুরের দুই টুকরো। আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার একমাত্র দরজা।' অন্য কোন সাহাবাকে একমাত্র জ্ঞানের দরজা বলা হয়েছে বলে অধম লেখকের জানা নেই। আলীই হচ্ছেন মহানবীর জ্ঞানের একমাত্র দরজা। পাঠক, চিন্তা করতে অনুরোধ করছি। নিরপেক্ষ মন নিয়ে এই হাদিসটির গবেষণা চালিয়ে যান। দেখবেন কত গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে অথচ অনুভব করে যেতে হবে, কারণ খলতে গেলেই আপনাকে শিয়া বলতে চাইবে। আবার মহানবী বলছেন, 'আমি যার প্রভু আলীও তার প্রভু।' অন্য কোন সাহাবার কথা এখানেও বলা হল না। তা তিনি যত বড় সাহাবাই হোক

না কেন। পাঠক, চিন্তা করতে অনুরোধ করছি। গবেষণা করতে গেলে অনেক গোপন রহস্যের পরিচয় পাবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন মাটির তলে গবেষণা করেই তেলজাতীয় অনেক রকম ধাতব পদার্থ আবিষ্কার করা হয়েছে। মহানবী বলেন, 'আলীর বিরুদ্ধে যে অশ্ব তুলবে সে আমার বিরুদ্ধে অশ্ব তুলবে এবং আমার বিরুদ্ধে যে অশ্ব তুলবে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে অশ্ব তুলবে।' এই হাদিসটি যদি তুল তুল করে গবেষণা করতে চাই তা হলে এমন সব গোপন এবং খুবই অপ্রিয় সত্য কথা গবেষণা নামক খলি হতে বেড়িয়ে আসবে যে তখন মাথাটা ঠিক রাখা কষ্ট হবে। এক সাহাবা দুটি যুদ্ধে গাজী হয়েও আত্মহত্যা করার দরুন সব কিছু কেবল শেষ হয়ে গেল বললে ভুল বলা হবে বরং জাহান্নাম হতে হল। কারণ? কারণ যত ভাল কাজই করা হোক না কেন কিছু শেষটাই যদি মহানবীর বিরুদ্ধে চলে যায় তা হলে গাজী সাহাবার আত্মহত্যার মত শেষ পরিণতি কী হতে পারে গবেষণা করুন। এই মহামূল্যবান হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা যদি চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকের কাছে তলে ধরতে চাই তাহলে অনেক অপ্রিয় কথার ইতিহাস তলে ধরতে হয়। আর তাতে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ), হজরত তালহা (রাঃ), হজরত জুবায়ের (রাঃ) এবং মোমিনদের মাতা আয়েশার কথা এসে পড়ে। এখানে অধম লিখকের মত মানুষটিরও স্বাধীনতা নেই যে, কিছু বলবো, কিছু ব্যাখ্যা করবো, কিছু অকাট্য দার্শনিক যুক্তি দাড করাবো। আমার প্রজন্মের কাছে ক্রমা চেষ্টে নিলাম এবং তোমরাই একদিন সত্য তলে ধরে দাদুকে অপমান করে মন্তব্য করো। সেই অপমানে দুঃখ পাবার বদলে রইলো আমার আত্মরিক দোয়া।

ভগবান গৌতম বুদ্ধের দু একটি বাণীর একটি আলোচনা করা যাক। 'নির্বানেই মুক্তি' মাত্র দুটো শব্দ। ফার্সিতেই মুক্তি। এই নির্বান তথা ফার্সি কার উপর বলা হয়েছে। নিজের 'আমি-আমি' স্বকীয়তার নির্বান তথা আমিত্বের কুবানিতেই মুক্তির কথা বলা হয়েছে। আরবি ভাষায় এটাকেই বলা হয় এই বলে যে, খান্নাসের ধোকাবাজি হতে আশ্রয়গ্রহণ কর। আল্লাহর কথাটি তথা আল্লাহ শব্দটি তিনি ব্যবহার না কুরাতেই যত ভুল ব্যাবহারি আগমন হয়েছে। এজন্য শূন্যবাদের খাসা অপবাদটি ছড়িয়ে অনেক ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিজের মধ্যে অস্থিরমতি চকুল অহমের নির্বানেই মুক্তি, ভগবান বুদ্ধের এই বাণীটি যে ইসলামেরই মূল বাণীর আদর্শটি বহন করছে তা দলীয় সাইনবোর্ডের অভিশাপে চাপা দেওয়া হয়েছে। মহামিলনের ভূমিটাকে টুকরো টুকরো করে আলাদা করা হয়েছে। মনগড়া কথার জটলা পার্কিয়ে পাকানো হয়েছে বিভ্রান্ততা। একেবারে সুরটি সমর্থন পায় না এত সাইনবোর্ডের এত স্টাইলের রচিত লিখা দেখে। হিংসা আর স্বার্থের নামে আবার সেই সাইনবোর্ডগুলো হচ্ছে খণ্ড বিখণ্ড।

আওলাদে রসুল মহানবীর কলিজার টুকরো ইমাম হোসেনের শিশুপুত্র ইমাম আলী আসগরকে পানির বদলে এজিদের সৈন্য হরমলার তীর দিয়ে গলা কাটা হয়েছিল তখন একটি অবাক ঘটনা ঘটে গেল। সেই ঘটনাটি হল এজিদের

বেতনভুখ এবং অনুগত অনেক সৈন্য এই করুন দৃশ্য দেখে বোবার মত দাঁড়িয়ে কেবল কেঁদেছে। এর বেশি কিছু করতে পারেনি। কারণ সাইনবোর্ড ফেলতে গেলেই দলত্যাগী হর এবং তার ছেলে ও কুতদাসসহ কিছু সংখ্যক সৈন্যদের ভাগ্যে জুটেছিল শাহাদাত বরণ। সত্যিই নিরপেক্ষ থাকাটা কত কঠিন কাজ।

নির্বাণ তথা ফানাতে 'নেই' হয়ে যায় না। কারণ ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপী হল, যখন নিজের বলে আর কিছুই থাকবে না তখনই তুমি সম্পূর্ণ থাকবে। 'নির্বাণে মুক্তি' কথাটির মুক্তির অর্থই হল সম্পূর্ণরূপে থাকা। অনিত্যের স্পর্শ আর থাকে না। কারণ অনিত্য অসত্য। আপেক্ষিকতারি প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু মুক্তির স্থানে আপেক্ষিকতার মূল্য শূন্য। মুক্তিই পুরুষ, কিন্তু বন্ধন হল নারী। প্রকৃতির লীলা বন্ধন, তাই প্রকৃতিকে নারী বলা হয়। এই বন্ধন হতে মুক্তি দিতে পারে কেবল নির্বাণ। নির্বাণের স্থানে স্বর্গ থাকে না। কারণ স্বর্গও নারী। কারণ সুখ হলেই ওটা ভোগ বলা হয়। ভোগ আনন্দদায়ক হলেও নারী, আর বেদনাদায়ক হলে তো প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং নির্বাণ স্বর্গকে ডিঙিয়ে যাবার দর্শন। নির্বাণ আত্মপরিচয় দান করে। নির্বাণকে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয় লাহতের মোকামে প্রবেশ করা। প্রেমিকেরা যখন আলম্বে লাহতে পৌছায় তখন দেখতে পায় একটি চমৎকার অবাক করা দৃশ্য। আর সেই দৃশ্যটি হল, প্রভু এবং দাস উভয়ের একুটিও আর দেখতে পায় না। বাবা হজরত নাদির শাহ বলছেন : উহা পৌছতে হ্যায় উশাকু আলম্বে লাহত-কে জিস মোকাম ম্বে আকা নাহি গোলাম নাহি। ভগবান বুদ্ধ এই নির্বাণের দেশে আগমন করার পর এরকম কথাটিই অন্যরকম ভাষায় বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু অনেকেই এই কথাটির আসল রূপটি আবিষ্কার করতে না পেরে ভিন্ন মতবাদের জনক বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

হজরত বাবা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রধান মুরিদ বাবা আমির খসরু বলছেন : খোদা খোদ মেরে মজলিশ বদ আন্দার লামোকা খসরু, মোহাম্মদ শাম্মায়ে মাহফিল বদ অর্থাৎ 'সেই মজলিশের প্রধান স্বয়ং খোদা, খসরু সৃষ্টিরাজ্যের উর্ধ্বে ছিলেন, সেই মাহফিলের প্রদীপটি হলেন স্বয়ং মোহাম্মদ।'

হজরত হাজি বাবা মেলান্দ শাহ বিসমিল বলেছেন : খবরদার বিসমিল, মোসাম্মাকা মতলব, না আল্লাহ হ্যায় না বান্দা হ্যায় না হা হ্যায় না হ হ্যায়। এখানে বাবা বিসমিল ভগবান বুদ্ধ হতেও এক ধাপ উঁচুতে উঠে বলেছেন। শূন্যবাদের অপবাদটি যদি ভগবান বুদ্ধকে জোর করেই দিতে চান তাহলে মুসলিম সাধকদের অরুহাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? মুসলিম সাধকেরা যেখানে সাধনার চরম পর্যায়ে গিয়ে আল্লাহ এবং বান্দাকে পাচ্ছে না সেখানে ভগবান বুদ্ধের যদি বলি ভগবান আছে তাতে তোমাদের কী লাভ আর যদি বলি ভগবান নেই তাতে তোমাদের কী ক্ষতি' বলার মধ্যে শূন্যবাদের আবিষ্কারটাই একটা নিছক হাস্যকর ব্যাপার। যদিও ভগবান বুদ্ধ যে একজন নবী অথবা রসুল ছিলেন বলে কোরানে নামটি বলা হয়নি, তবে কোরান এও বলেছে যে, অনেক নবী এবং রসুলদের নাম

উল্লেখ করা না হলেও অনেক নবী-রসুলের আগমন হয়েছে। তবে ভগবান বুদ্ধ যে একজন রসুল ছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই বলে মনে করতে চাই এবং সেটা আমার গবেষণার সূক্ষ্ম বিশেষণেই বুঝাতে চেষ্টা করবো। অথচ এত বড় একজন রসুলকে আমরা রসুলরূপে আজও পরিষ্কার প্রমাণের মধ্যম্বে তলে ধরতে পারিনি। এটা একটা লজ্জার বিষয় বটে। কারণ, মনে হয় তার উক্তির সংখ্যাই পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি।

এবার ভগবান কক্ষের দু একটি বাণীর একটি আলোচনা করা যাক। ‘তুমি বুদ্ধকে নিজের আত্মাতে দেখতে পাবে।’ উপদেশটি সহজ এবং পরিচিত। মহাপ্রভু মোহানন্দ (আঃ)-র অতি পরিচিত উপদেশ, যে তার নফসকে (নফস আসলে নারী এবং রূহ আসলে পুরুষ এবং ইহা আরবি ভাষার ব্যাকরণের উক্তি, আমরা বানানো কথা নয়) চিনতে পেরেছে সে অবশ্যই রবকে (আল্লাহ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়নি) চিনতে পেরেছে। একই ভাব ও দর্শন বহন করে, যদিও ভাষার দিক দিয়ে একটি আরবি এবং অপরটি হল সংস্কৃত। প্রত্যেক জাতির নিজের ভাষায় রসুল পাঠানো হয়েছে বলে কোরান যে ঘোষণা করেছে, এই বাণীটি হল তারই একটি সুন্দর নমুনা। একই কথা, একই উপদেশ, একই দর্শন, একই আত্মাকে জানবার বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা অথচ ভাষার বেলায় আলাদা হবার দরুন আমরা এক করে দেখার মন মানসিকতা হারিয়ে ফেলি। বিশেষ করে অনুষ্ঠানের প্রশ্নে আরো জটিল যাতনায় ভুগতে হয়। পানিকে জল বললেই বিপদ আর ঔষাটার বুললে তো আরো বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে একে অপরকে বিজাতীয় চিন্তাধারার অপবাদ দিয়ে গালাগাল শুরু করে দেই। এমনকি অনেক সময় দিশেহারা হয়ে পৌত্তলিক অপবাদ চাপিয়ে দেই। এমনকি কাবাঘরে যে তিনশত ঘাটটি মূর্তির পূজা করা হত সেই পূজার ভাষাটি কী ছিল বলে প্রশ্ন করলে উত্তরখান্না দেবেন কি? আমরা বুঝেও ইচ্ছা করে বুঝতে চাই না যে, একই পদার্থের তিনটি আলাদা নাম। অসীম আল্লাহর রূপটি কী করে সীমার মধ্যে আনতে চান? অসীম যিনি তার রূপও অসীম হতে বাধ্য। সুতরাং অসীমের অনুষ্ঠান সীমায় আবদ্ধ করাটাই অসীমকে অপমান করা। অসীমকে পুরোক্তভাবে অস্বীকার করা। যার দেয়াল নেই, যার সীমা নেই, যার বন্ধন নেই তাকে দেয়াল, সীমা আর বন্ধনে তারাই বাধতে চাইবে যারা গণ্ডির সীমিত স্থানে অবস্থান করে। সুতরাং অসীমের অনুষ্ঠানগুলোও অসীম। পৃথিবীর বহু দেশের জীবনযাত্রা হতে শুরু করে আচার-ব্যবহার, চলা-ফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, শরীরের গঠন প্রকৃতি, এমনকি জলবায়ুর যে কত শত প্রকারের অনুষ্ঠানের লীলা খেলা চলছে এবং এই অনেক অনুষ্ঠান আছে বলেই তো আল্লাহ অসীম। এই অসীম অনুষ্ঠানের বন্ধন কোরানের কোথাও নেই। তাই কোরান হল বিশ্বমানবের মুক্তির পরিপূর্ণ গ্রন্থ। অথচ আমরা এই মুহূর্তে অসীমকে সীমার বিভিন্ন দেয়াল দেবার কারণে বিশ্বজনীন ভাবধারাটিকে ঘোঁটিয়ে বিদায় করে দিতে চাই। আর এরই ফলে অনেক রকম আত্মকলহ বিদ্ধ বিদ্ধ হয়ে জন্মে উঠে একদিন

বিস্ফোরিত হয় অ্যাটোম বোম্বার চেয়েও মারাত্মক হিংসা আর ঘণার ভয়াবহতায়। যার আঘাতে পৃথিবীর মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে দিনের পর দিন। আমরা একে অপরকে পানিকে জল বলার জন্য বলপ্রয়োগ করি। অথচ একই বিষয়। ভাষার বিভিন্নতায় এরকমটি হওয়া যে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এটা ভেবে দেখার চিন্তাও করতে চাই না। সবাই যেন অন্ধগতিতে হাটতে ভালবাসি। সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে অপরকে ঘণা করে পাই আত্মতৃপ্তি। ঘণার বিকৃতি দিনে দিনে পরিণত হয় ঘণার বিশাল বৃত্তে। কচ কাটতে কাটতে পরিণত হই আমরা বিরাট ডাকাতে। বিশ্বমানবতার কাতর কন্ঠার শব্দ তখন বিশ্বের কিছু বিবেকবান মানুষের মনকে আহত করে তোলে। এ কয়টি বিবেকবান মানুষ তখন নেমে আসে উৎসর্গের বেদীতে আপনাকে তিলে তিলে বিলিয়ে দেবার প্রবল প্রতিজ্ঞা নিয়ে। আর এরাই হলেন মহামানব। এদের জাত নেই, এদের সীমা নেই। এদের কাছে পৃথিবীটাই জন্মভূমি। এদের কাছে পৃথিবীর মানুষগুলো হল আপনজন আর মঙ্গল কামনাই হল এদের ধর্ম। যুগে যুগে এই মহাপুরুষেরা এগিয়ে আসার পথে বহু বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। বহু নির্যাতন, বহু অপমান এরা হাসি মুখে সহ্য করেছেন। প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে বাধা দিতে গিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে। অশুভ শক্তিকে বারবার বুঝাতে চেয়েছেন। এমনকি অবশেষে এমন কথাটি পর্যন্ত বলতে হয়েছে যে, তোমারটা নিয়ে তুমি থাক আর আমারটা নিয়ে আমি থাকি। আমার আদর্শের প্রচারে বাধা দিও না এবং আমিও তোমার মতবাদে বাধা দেব না। কিন্তু তবু মেনে নেয়নি এই মহাগণতন্ত্রের পবিত্রতম বাণী। স্বৈরাচারের দানবীয় চেহারা নিয়ে এরা যুগে যুগে বাধা দিয়ে গেছে। এরা জোর করে নিজেদের মতবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এদের মতবাদ চাপাতে গিয়ে কত সরল-সহজ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া মতবাদ পৃথিবীর ইতিহাসের শুরু হতে আজ পর্যন্ত ঢেকেনি, ঢিকতে পারে না। তাই কোরানের কোথাও পাচবার নামাজ পড়ার প্রয়োগের কথা বলা হয়নি। কেন বলা হয়নি? কারণ কোরান বিশ্বের সবার জন্য। বিশ্বের সবাইকে আশ্বাস করা হয়েছে ‘ওয়াকুমস সালাতা’ তথা আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ কাসেম করতে। হে বিশ্বের মানবজাতি, তোমরা যে অবস্থাতেই থাক না কেন, আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ কাসেম করার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য হাদিসে পাই সালাতের প্রয়োগপদ্ধতি। হাদিসে পাই সালাতের প্রয়োগ ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা এবং অনুশীলনের উপদেশ। যে কোন আদর্শই প্রচারিত হোক না কেন, সেই আদর্শের মূল ভিত্তিটা যদি গণতান্ত্রিক না হয় তা হলে কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। কিছু দিনের জন্য চাপিয়ে দেওয়া মতবাদ হয়তো চলতে পারে, কিন্তু সর্বকালের জন্য নয়। এই মহান উপদেশটি কোরান বারবার ঘোষণা করছে। অন্যের ধর্মের উপর হাত বাড়ানো একদম নিষেধ, কোরানের এই চিরন্তন বাণীর বুকে মুসলমান নামধারীরাই অনেকবার হেনেছে আঘাত। এটা ইসলামের ইতিহাসের একটি

বেদনাদায়ক কলঙ্ক। কারবালার অন্যায় যুদ্ধে ইমাম হোসায়েনকে এবং মহানবীর আওলাদদেরকে কী অসহ্য যাতনার মাধ্যমে শহিদ করেছিল, কিন্তু কারা এই জঘন্য অপকর্মটি করেছিল? কোন হিন্দু, কোন বৌদ্ধ, কোন খ্রিস্টান, কোন ইহুদি করেনি। করেছিল তারাই যারা রীতিমত পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে কেবল মুসলমান নামেই পরিচিত নয় বরং মহানবীর দর্শনপ্রাপ্ত অনেক সাহাবাও ছিল। জানি না ইসলামের ইতিহাস এদেরকে সাহাবার মর্যাদা দিয়েছে কিনা। যেখানে ইমাম হোসায়েন বলেছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কি একজনও মুসলমান নেই? সাহাবার প্রশ্ন তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানরূপেও কি এত হাজার হাজার মুসলমান নামধারীদের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই? এজিদের স্বৈরাচার ইসলামের লেবেল এটে দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মোকি ধোকা দিতে পারে কিছু দিনের জন্য। কিন্তু পরে যখন আসল রূপখানা ফটে উঠে তখনই আর টেকে না। তাই জোর করে যে কোন মতবাদ যে কোন রূপের লেবেলেই চালু করা হয়েছে তা টিকে থাকতে পারেনি—এটাই ইতিহাসের শেষ রায়, শেষ ঘোষণা।

লোভ-মোহ মনের অজান্তে নিজের বিবেকের যে ধ্বংস ডেকে আনে এটা বুঝতে পারে না। কারণ কতগুলো খোড়া যুক্তি পেছন থেকে উৎসাহ যোগায়। সে তখন বুঝতেই পারে না যে, উৎসাহ দেবার যুক্তিগুলো ধারালো মনে হলেও আসলে দাঁড়াবার পা নেই। এই মনোবিজ্ঞানের গবেষণার লেবরেটরিতেও অনেক সময় আসল রোগ নির্ণয় করতে না পেরে ভুল চিকিৎসার নামে ডেকে আনে স্বৈরাচার নামক ক্যানসার। তাই আমরা মনোবিজ্ঞান আর দর্শন পড়ে হই দিশেহারা। নৈরাজ্যের যাতনা বোবার মত সয়ে যেতে হয়। কারণ এতে তৈরি হয় নানা রকম সিদ্ধান্ত। গুণতন্ত্রের গলায় যদি এর যে কোন একটি সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন তৈরি হয় মৃদু মানবতাবিরোধী কুস্পন। তারপর ধীরে ধীরে যখন প্রচণ্ড রূপধারণ করে তখন বিশ্ববিবেক অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেভাবে এগিয়ে চলেছে সেই ভাবে যদি আমাদের মন-মানসিকতার বিকাশ ঘটে, এবং পরমুখ সহ্য করার এবং শুদ্ধা প্রদর্শন করার ইসলামের শিক্ষাটি গ্রহণ করতে পারি তাহলে উমাইয়া এরং আব্বাসীয়দের রাজতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া শাসনকে ইসলামের শাসন বলে ধোকা দেবার আর কোন অশুভ শক্তি প্রশ্রয় পেতে পারে না। উমাইয়া আর আব্বাসীয় রাজতন্ত্র খাসির মাথা সামনে রেখে ডেড়ার মাংস বিক্রি করেছে। যাদের কাছে এই চালাকি ধরা পড়েছে তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মৃত্যু। আওলাদে রসুলের বার ইমাম হতে শুরু করে কত মনসুর হালাজের মত মহামনীষীদের প্রাণ দিতে হয়েছে সেটা ইসলামের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে পড়ে দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। সব যুগেই সব দেশেই সব ধর্মের মাঝেই কিছু পা-চাটা জ্ঞানপাপী থাকে, যারা বেভবের দ্বোহে বিবেকের গলায় ছুরি চালিয়ে এই সমস্ত স্বৈরাচারীদেরকে মহানরূপে দাড় করিয়েছে এবং এর ফলে অনেক সরল জনতা সত্য-সুন্দর রূপটি

খাঁজতে যেয়ে মনের অজান্তে এদের মরণফাঁদে পা রেখে নতুন বংশধরদের জন্য তৈরি করে গেছে জগাখিচুড়ি। এরা বিলিয়ে দেবার বদলে দুহাতে টেনে এনেছে ভোগবিলাস। এরা যেন ভ্রমরের মত। ফলে ফলে মধু পান করার তকদির নিয়ে এসেছে, অথচ পৃথিবীর নিরীহ জনতা ফলের মত বিলিয়ে গেছে মধু দেবার তকদির। অথচ ঐ কোরানই বারবার সার্বধান করে দিয়েছে সবাইকে পরিবর্তন করার সাধনা ও সংগ্রাম করতে। গণতন্ত্রের মহামন্ত্র কোরানে বার বার ঘোষণা করা হল, অথচ মুসলমান সমাজে তাকে সুবচাইতে বেশি অবমাননা করা হয়েছে। যার দরুণ পৃথিবীর প্রায় উনচলিশটি মুসলিম দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্নে কোথায় নেমে এসেছি! আত্মতৃপ্তি আর নিজেদেরকে বড় বলে এখনো ঘোষণা করতে ভালবাসি। মানুষের শেষ কান্নার নামটি যদি সঙ্গীত দেওয়া যেত, কবরে যাবার আগের শেষ কথাগুলো যদি কবিতা হত, তাহলে আমরা যে আত্মতৃপ্তি পাওয়া শ্রেষ্ঠ জাতি এতে হয়তো অনেকেই সন্দেহ করবেন না। কোরান যেখানে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে জ্ঞানদান করার কথা, মানুষকে সুপথ দেখাবার পরিব্র দায়িত্ব অর্পণ করার কথা ঘোষণা করেছে সে কথা কবে কখন বাস্তবে পরিণত হবে? কবে আমাদের নিজেদের মধ্যে সামান্য মতভেদ নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধানো বন্ধু করে এক পাটফরমে দাঁড়াতে পারবো? নিশ্চয়ই একদিন পারবো, কারণ কোরানের বাণী তো মহাসত্য; এই মহাসত্যের যেদিন বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলন ও গবেষণা করতে পারবো এবং প্রকৃত রূপটি জনতার সামনে তুলে ধরতে পারবো। আমরা জানি, গবেষণা এবং অনুশীলনের পথে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকবেই। তাই বলে আতুড় ঘুরেই যদি গবেষণাকে গলা টিপে মারতে চাই তাহলে যে পেছনে পড়ে আছি সেই পেছনেই পড়ে থাকবো। কারণ বিজ্ঞানের এই সর্বাধুনিক জয়যাত্রা গবেষণার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে এবং আসছে। এই অগ্রযাত্রার পেছনে কি অনেক ভুল-ত্রুটি ছিল না? ছিল এবং থাকবে। সাধনার পথে হোচট খেতে হয়। হিমালয়ের উচ্চ শিখর হোচট খেতে খেতেই একদিন জয় করতে পেরেছে। বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয় হোচট খেতে খেতে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং গবেষণার মাথায় আঘাত করে তারা নতুন কিছু আশা করতে পারে না। তাই মহানবী এই গবেষণাকে উৎসাহ দিতে গিয়ে সেই দিনের সভ্য চীন নামক দূর্গম দেশেও যেতে উপদেশ দিয়েছেন। ‘শতফল ফুটতে দাও’। এই মন নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। দু’চারটে ফলে যদি সৌরভ না থাকে তাতে গবেষণা বন্ধ করে দিতে নেই। তাই ইসলাম দিয়েছে স্বাধীনতা। সবাইকে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে। কিন্তু এই স্বাধীনতাই যখন ধীরে ধীরে স্বৈরাচারের রূপ ধারণ করে এবং তা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন ধীরে ধীরে ভাঙন আর প্রতিরোধের শক্তি জন্মাট বেধে উঠে এবং বাধে সংঘাত। হয়তো প্রথমে মার খায় এই সংঘাত, কিন্তু তার বাধভাঙা জ্বলের মত প্রবল সোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মার্কসবাদের কলঙ্গির চস্কে আর এলেনার মত শয়তানদের। ইতিহাস কখনোই একটি সরলরেখা নয়। ইতিহাস হল একটি পূর্ণ

বুঝ। ইতিহাস যদি সরলরেখা হত তাহলে পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস হতে কিছুই শিখতে পারতাম না। যেহেতু ইতিহাস একটি পূর্ণ বৃত্ত তাই দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি। একটিই আদিম অসীম দেহ, কিন্তু পোশাকের বেলায় কত বিচিত্র অসীম পোশাক এ অসীম দেহে ক্রমে ক্রমে বদলাচ্ছে—যেন বিংশশতাব্দীর সভ্যদেশের একটি অসীম নারীদেহে অসীম পোশাকের চোখ ধাধানো ফ্যাশন। একই অসীম উপদেশ দুটি পোশাকের ভাষায় লিখা আছে। একটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ‘তুমি ব্রহ্মাকে নিজের আত্মাতে দেখতে পাবে।’ আর অপরটি মহাপ্রভু মোহানন্দের ‘মানি আরাফা নাফসাহ ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ’ তথা ‘যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে অবশ্যই তার রবকে চিনতে পেরেছে।’

সেজদায়ে তাজিম্বি সম্পর্কে আলোচনা

এবার মহাপ্রভু মহানবীর (আঃ) একটি খণ্ডিত বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যাক। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের মাঝে খুব বেশি ভুল বুঝাবুঝি হয়। অবশ্য গবেষণার আলোকে যদি চুলচেরা বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও ধারালো যুক্তির মানদণ্ডে দাঁড় করানো যায় তাহলে অনেকের কাছেই এ অখণ্ড বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে এবং তকদিরের লিখন অনেকের হয়তো বদলিয়ে যেতে পারে। বিষয়টি সামান্য মনে হলেও মোটেই সামান্য নয়। আমরা ভাল করেই জানি যে, একমাত্র মানুষ

এবং জিন জাতি (অবশ্য আমাদের জানা মতে) ছাড়া সৃষ্টিরাজ্যের কেহই শেরেক করতে পারে না। অর্থাৎ শেরেক করার কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। তাই আসমান এবং জমিনের যা কিছু আছে সবাই তৌহিদে বাস করে এবং তৌহিদ সাগরে ডুবে আছে। সুতরাং যেখানে আসমান জমিনের সবকিছু তৌহিদে বাস করছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে শেরেক করার প্রশ্নই উঠে না। কারণ শেরেক করার অধিকারই দেওয়া হয়নি। যেখানে অধিকারই নেই সেখানে অধিকারের প্রশ্ন তোলাই অবান্তর। মহাপ্রভু মহানবীর কতটুকু চরম মর্যাদা তারই আলোচনা করছি। মারফতের গোপন কথায় তিনি কে এবং তাঁর আসল রহস্য কী, অনেকে পরিষ্কার বুঝতে পেরেও সাধারণ মানুষ যেন সাধারণ বুদ্ধিতে ভুল না করে তার জন্য শরিয়তের বিধান দেবার ব্যবস্থা। সাধারণ মানুষ প্রাচীন কাল হতে আজ এই আধুনিক যুগেও প্রায় একই রকম চরিত্র বহন করেছে। সমাজের পরিবর্তন, যুগের বিবর্তন এবং বিজ্ঞানের বিকাশের দরুন হয়তো সেকালের সাধারণ মানুষ আজকের দিনে কিছুটা উন্নত হতে পারে, কিন্তু মূলত সাধারণেরা চিরদিনই সাধারণ। তবুক নামক যুদ্ধের ব্যয়ভারের অধিকাংশ দান করেছিলেন মহানবীর জামাতা হযরত উসমান গণি (রাঃ)। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক উট এবং গরুও দান করা হয়। যখন হযরত উসমান (রাঃ) উট এবং গরুগুলো মহানবীকে দান করছেন তখন এক অবাক কাণ্ড ঘটে গেল। যে সকল মহান সাহাবারা তখন সেখানে হাজির ছিলেন তারা সবাই অবাক বিস্ময়ে একটি অদ্ভুত কাণ্ড দেখলেন। সেই অদ্ভুত কাণ্ডটি কী? সেই অদ্ভুত কাণ্ডটি হল, উট এবং গরুগুলো মহানবীর পদতলে সেজদা করলো। সাহাবারা মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন যে, এই দুটো প্রাণী কেন মহানবীকে চরম বিনয় দেখিয়ে সেজদা করেছে? আরো

মজার কথা হলো যে, কেবলমাত্র তবুকের যুদ্ধেই এরকম আঙ্গব ঘটনা ঘটেনি। বরং সাহাবা আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, মদিনার কোন একটি আনসার সম্প্রদায়ে একটা পাগলা উট ছিল এবং এই উটের পিঠে কেউ উঠতে পারতো না এবং কোন কাজও করানো যেত না। মহানবীকে জানানোর পর মহানবী সেই পাগলা উটের কাছে যাওয়ামাত্র উটটি মহানবীকে দেখামাত্র সঙ্গে সঙ্গে মহানবীর পায়ে সেজদা দিল। (দালাঃ ১৩৯ পৃষ্ঠায় এবং মাতিয়াঃ ৩৬৬ পৃষ্ঠায়)। এরকম অনেক ঘটনাই তুলে ধরা যায় এবং রীতিমত দলিল প্রমাণ দিয়ে। কিন্তু যত সুন্দর দলিলই দেওয়া হোক না কেন, আবু জাহেলের মত তকদিরে যদি অন্যকিছু আগেই লিখা হয়ে থাকে তাহলে ঈমান আসতে পারে না। কারণ যা তকদিরে নেই তা জোর করাটাও একটা বোকামি। ঐ তকদিরে শয়তান বহু যুক্তি-প্রমাণ আগেই শিখিয়ে রেখেছে। সুতরাং শয়তান যার ওস্তাদ তার সঙ্গে অনেক প্রকার টাল বাহানার কথা থাকবেই। এতে অবাক হবারও কিছু নেই এবং বলারও কিছু নেই। কারণ ওর চিন্তা ওর কাছেই থাক আর আমারটা আমার কাছেই থাক। ডেকে বুঝাতে চেষ্টা করা যায় মাত্র, তাতে সাড়া না পেলে একলা চলতে হয়।

না হয় আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরছি। একদিন মহানবী বেশ কয়জন সাহাবা নিয়ে এক আনসারের বাগানে গেলেন। সেই বাগানে কতগুলো বকরি ছিল। মহানবীকে দেখামাত্র বকরিগুলো ছুটে এসে পদতলে সেজদায় পড়ে গেল। (খাসাঃ ৬০ পৃষ্ঠা, মাতিয়াঃ ৬৬৭ পৃষ্ঠা, দালাঃ ১৬৫ পৃষ্ঠা)। এরকম বহু ঘটনার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। হাদীসে দারেমী, হাদীসে আহমদ এবং হযরত

জাবের (রাঃ) হতে এরকম বহু অলৌকিক ঘটনা তুলে ধরা যায়। কিন্তু আমরা বেশি কথা না তুলে এই সব ঘটনার বিশদ গবেষণা করতে চাই।

মানুষ এবং জিন ছাড়া আর সবাই তৌহিদে বাস করছে এবং তসবিহ পাঠ করছে তথা গুণগান করছে। এটা কোরানের কথা। যারা তৌহিদে সব সময় বাস করছে, যারা তৌহিদ সাগরে সব সময় ডুবে আছে তাদের পক্ষে শেরেক করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ তৌহিদে শেরেক নাই। আর শেরেকের মাঝে তৌহিদ নেই। মানুষ আর জিন তৌহিদে বাস করে না। তাই শেরেক করা নিতান্ত স্বাভাবিক। ইচ্ছাশক্তি, স্বাধিকার, আমিত্ব, ‘আমি আমি’, ‘আমার আমার’ এই ভাবগুলো কেবল মানুষ এবং জিনকেই কিছুদিনের জন্য দেওয়া হয়েছে এবং এইরূপ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আল্লাহ সহজে হস্তক্ষেপ করেন না। এখন প্রশ্ন হল, যারা সব সময় তৌহিদে বাস করছে তারা কোনমতেই শেরেক করতে পারে না। যেহেতু পশু প্রাণীরা তৌহিদে বাস করছে সেইহেতু তাদের পক্ষে শেরেক করার কথাটি অসম্ভব এবং অবাস্তব। আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে যদি সেজদা দেওয়া শেরেক বলে ধরে নেই তা হলে মহানবীকে পশু প্রাণীরা কেন সেজদা করলো? পশুরা কি জানতো যে, মহানবীই আল্লাহ পাকের গুণে গুণাবিত? পশুরা কি জানতো যে, আল্লাহ এবং মহানবীকে যারা ভাগ করে দেখে তারা খাঁটি কাফের? তারা কি কোরানের সূরা নিসার রহস্য আপনা হতেই জানতো? তাই হয়তো অনেক সুফি সাধক দুঃখ করে বলে গেছেন যে, বনের পশুরা মহানবীকে চিনতে পারলো আর আমরা মানুষ হয়েও চিনতে পারলাম না। পশুরা কি জানতো না যে, আল্লাহ ছাড়া মহানবীকে সেজদা দেওয়া শেরেক? আল্লাহকে ফেলে মহানবীকে কী করে পশুরা সেজদা দেয়,

যদি পশুরা তৌহিদে বাস করে? তাহলে তৌহিদের রহস্য এত হাল্কা-পাতলা নয় যে সহজেই বুঝা যায়। মহানবী যদি আল্লাহ হতে আলাদা হতেন তা হলে পশুরা কিছুতেই সেজদা দিতে পারে না। কারণ তৌহিদে শেরেক নেই। তাছাড়া আরো একটি প্রশ্ন উঠে যে, মহানবী যদি সত্যিই আল্লাহ হতে আলাদা হতেন তাহলে পশুদের সেজদা দিতে মানা করে দিতেন। পশুরা যখন মহানবীর পায়ে সেজদা দিতেছিল তখন মহানবী কেন পা সরিয়ে নেননি? কেন মহানবী পশুদেরকে বলে দিলেন না যে, আল্লাহকে সেজদা কর, আমাকে নয়? এরকম উপদেশ তো তিনি পশুদেরকে দেননি বরং সেজদা গ্রহণ করেছেন। মহানবী যত বড় নবীই হোন না কেন, তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবীই হোন না কেন, কিন্তু তিনি যদি আল্লাহ হতে আলাদা হতেন তাহলে পশুরা শেরেক করেছে বলে অবশ্যই ধরে নিতে হয়। কিন্তু আসল সত্য কথাটি হল, তিনি আল্লাহ হতে মোটেই আলাদা নন। আল্লাহর গুণাবলী হতে তিনি মোটেই পৃথক নন। আর এই গোপন রহস্যটি পশুরা ভাল করে জানে বলেই মহানবীকে সেজদা করেছে এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন। তিনি চিৎকার করে পশুদেরকে শেরেক করার কথা ঘোষণা করেননি। তৌহিদের দেশে যারা বাস করে তারা পশু হোক আর যাই হোক না কেন সবাই এককের মাঝে এক অদ্বৈত সত্তা। প্রশ্ন

উঠতে পারে যে, পশুরা কেন, মহানবীকে সেজদা করলো? প্রশ্ন উঠতে পারে, আল্লাহকে ছাড়া সেজদা যদি শেরেক হয় তবে তৌহিদে বাস করা পশুরা কেন মহানবীকে সেজদা করলো? এই গোপন রহস্যটুকু যাদের বুঝবার তকদির দেওয়া হয়নি তাদেরকে বলার কিছু নেই। শয়তান এরকম তকদিরওয়ালাদের অনেক

রকম বুদ্ধি দিয়ে আসল পথ হতে সরিয়ে নিতে পারে। কারণ শয়তান হল সব পণ্ডিতের চেয়েও বড় পণ্ডিত।

তারপর আরো একটি প্রশ্ন আসে যে, কিছু সাহাবা এরূপ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে মহানবীকে সেজদা করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি কেবল মানা করেছিলেন। মহানবী মানা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে সেজদা করাটা যে শেরেক করা হবে এমন কথাটি তো একবার ভুলেও (?) উচ্চারণ করেননি। এই মানা করার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল যে, সেজদার প্রচলন হয়ে যেত এবং এতে রাজা-বাদশারা সেজদা দেবার প্রথা চালু করে দিত। এজিদের মত শয়তান যদি মুমিনদের আমির বলে ঘোষণা দিতে পারে, আর সেই এজিদের আমিরুল মুমিনিনের টাইটেলখানা এজিদের পা-চাটা শত শত আলেম নামের কুলাস্তারেরা ফতোয়া দিয়েছিল, সেই ইতিহাস পড়লে লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। ধন-সম্পদের মোহে এজিদের পা-চাটা আলেম নামের কুলাস্তারদের যেমন মাওলা ইমাম হোসায়েনকে বাঘী ফতোয়া দিতে হাত আর কলম কেঁপে উঠেনি, তেমনি এজিদের পর হতে প্রতিটি যুগে এ ধরনের পা-চাটা কুলাস্তার আলেমের সংখ্যা আজও অনেক আছে এবং পরেও থাকবে কিনা সেটা ইতিহাসই একদিন বলে দেবে। কারণ ইতিহাস সরলরেখা নয়। সরলরেখা হলে হারিয়ে যেত। তাই ইতিহাস হল বৃত্ত। ঘুরে ঘুরে একই দর্শন অনেক রং-রূপ নিয়ে হাজির হয়। তাই রং-রূপের ডিজাইন আর চং দেখে দেখে ইতিহাস হতে অনেক কিছু শিখতে পারি না। ড. গুয়েবেলসের মত মিস্যাকে বার বার সত্য বলার প্রভাব আর নেশা কেটে উঠতে কষ্ট হয়। ডেজাল

দুধ পান করার অনেক দিনের অভ্যাসে পেটখানা ভেজাল প্রফ হয়ে যায়।
তখন আসল দুধটাই ভেজাল মনে হয়, কারণ আসলটা পেট খারাপ করে দেয়।

আমরা এই বিষয়টি নিয়ে না হয় আর একটু গবেষণা চালিয়ে যাই। গবেষণার পথ ধরে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেমন এগিয়ে চলছে তেমনি মহানবীর বাণীগুলোর উপর গবেষণা চালিয়ে অনেক গোপন রহস্য বাহির করা যায়। তবে গবেষণার প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। তাই বলে আমাদের সবাইকে হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যে এই গবেষণার অনেক রকম ফসল বাহির হওয়াতে একদল অপর দলকে কেবল কটু বাক্যই উচ্চারণ করেনি বরং খুনাখুনির অনেক বিশ্রী আর অপ্রিয় দৃশ্য দেখতে হয়েছে। যেখানে মহানবী গবেষণাকে বার বার উৎসাহ দিয়েছেন এবং গবেষণার জন্য দুর্গম দূর দেশে যাবার উপদেশ দিয়েছেন, সেখানে একজন ভাল অগবেষকের চেয়ে ভুল গবেষকের গবেষণাকে জ্ঞান অর্জনের পথে মারা গেছেন বলে ধরে নিতে চাই। যদি তা না হয় তাহলে যে কোন জ্ঞান স্থবিরতার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থেমে যাবে। ইসলামের ইতিহাসে যারা ইসলামকে নিয়ে গবেষণা করে গেছেন তাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে জুটেছে এক বোঝা অপমান, নির্যাতন এবং মৃত্যু। এটা শুনতে খুবই দুঃখজনক কিন্তু অপ্রিয় সত্যকথা। সামান্য মাত্র কয়টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরি। ফতুয়া এ মক্কী রচনা করার জন্য বিশ্ববিখ্যাত সুফি সাধক মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবীকে ‘শ্রেষ্ঠ কাফের’ টাইটেল দেওয়া হয়েছে। ইমাম গাজ্জালীর মত সুফির রচিত বিশাল কোরানের ব্যাখ্যার পাণ্ডুলিপিগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং ‘কাফের’ টাইটেল দিয়ে অনেক গালাগাল করা হয়েছে। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী, হাফেজ সিরাজী,

আল্লামা জামি সবাই গবেষণা করতে গিয়ে কল্প অপমান হননি। আবার যথেষ্ট প্রশংসাও পেয়েছেন। আবার যারা এইসব গবেষকদের প্রশংসা করেছেন তারা আবার অন্য ধরনের ইসলামের গবেষকদেরকে জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন। একদল অন্য দলকে ইসলামের দেওয়া মহাগণতন্ত্রের বাণী পরমত সত্য করাকে কেবল উপেক্ষাই করেননি বরং হিংস্র পশুর ভূমিকা পালন করতে দেখেছি ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। যার দরুন আজও এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে পৃথিবীকে কী দিতে পেরেছি তার বিচারের ভার আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। ইমাম আবু হানিফার মত মনীষীকে একেবারে মৃত্যু জেলখানার একটি ছোট কুঠুরিতে। ইমাম আহমদ হাম্বলের মত মনীষীকে মোতাজেলা ফেরকায় বিশ্বাসীরা কী নির্মম ভাবে শহীদ করেছেন! সুন্নি মুসলমানেরা যাকে কাফের ফতোয়া দিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে সেই মনীষী ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নূতন গবেষণার ফসলকে সত্য করে নেবার মন মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে। হোক না ইমাম তাইমিয়ার গবেষণার ফসল অগ্রহণযোগ্য, কিন্তু গবেষণার ফসলে আঘাত আসলে সেই গবেষণায় অগ্রহ আর থাকে না। আঘাতের পর যেমন আবার আঘাত আসে ঠিক তেমনি গবেষণার পর আবার গবেষণা আসছে। যেন প্রতিটি কাজের মাঝে সমান প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই। তখন গবেষণা চলে, কিন্তু গবেষকের আর সেরকম স্বাধীনতা থাকে না এবং মনোবল আর উৎসাহ অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। এই সেদিন মিশরে সাইয়েদ কুতুব নামক বিখ্যাত ইসলাম গবেষককে জামাল আবদুল নাসের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলেন। আর একজন ইসলাম গবেষক, যিনি তাঁর সমস্ত

জীবনটাই গবেষণায় উৎসর্গ করে গেলেন, সেই সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীকে সইতে হয়েছে বহু অপমান। তাঁর গবেষণার ফল যাই হোক না কেন, কিন্তু পরমত সহ্য করার চরিত্র মুসলিম জাতি হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। যার দরুন পৃথিবীতে এতগুলো মুসলিম দেশ থাকতেও অন্য মহাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। আমরা এমন প্রকৃতির হয়ে উঠেছি যে, আমাদের গবেষণার ফসলই একমাত্র ফসল। এর পরিণতিতে মুসলমানে মুসলমানে দলাদলি, ফতোয়াবাজি, মারামারি যেন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হতে চলেছে। বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কারের ফসল যেমন পাশাপাশি থেকে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে, দর্শনের বিচিত্র চিন্তাধারাগুলো পাশাপাশি থেকে নূতন নূতন চিন্তার দুয়ার খুলে দিচ্ছে, কিন্তু ধর্মের বেলায় ঠিক তার উল্টা পথ ও মত। ‘দরজা বন্ধ করে দাও’ নামক ধর্মক আর গর্জন শুনতে হয়। যার দরুন আমাদের নতুন প্রজন্ম ধর্ম হতে আপনিই সরে যায়। ‘তোমার চিন্তা তোমার আর আমার চিন্তা আমার’ এই গণতন্ত্রের মহাবাণী যেদিন সমাজে প্রতিটি ক্রেতে বিরাজ করবে সেদিন মুসলিম জাতির অগ্রযাত্রা কেউ থামিয়ে দিতে পারবে না। জোর করে চাপিয়ে দিতে গেলেই আর টিকে থাকে না। আপেক্ষিক অর্থে হয়তো থাকে, কিন্তু হালাকু আর চেন্সি খাঁর মত ভ্রুকম্পন যে হবে এটা অবধারিত। মুতাসিম বিল্লাহর মত বিলাসী আব্বাসীয় শেষ বাদশা যে কচুকাটা হবে, বাগদাদ নগরী যে গণ গোরস্থানে পরিণত হবে, বাগদাদের জাতীয় লাইব্রেরীর লক্ক লক্ক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো যে আগুন আর জলে ভাসবে, জাতীয় লাইব্রেরীর প্রধান শেখ করিম আলীকে মাছ কাটার মত টুকরো করে ঝুলিয়ে রাখা হবে, এটা আব্বাসীয় শাসকেরা কোনদিন

কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ আব্বাসীয়রা জানতো না যে, তাদের চাপিয়ে দেওয়া শত শত বছরের শাসন ক্রমটাটি নিছক একটি আপেক্ষিক সত্য মাত্র।

আমরা এখন মহানবীকে যে পণ্ডরা সেজদা করেছিল এবং তিনি সেই সেজদা নিয়েছিলেন এবং কয়জন সাহাবা মহানবীকে সেজদা করতে চাইলে মহানবী মানা করে দিলেন, কিন্তু মহানবী একথা বলেননি যে তাঁকে সেজদা করলে শেরেক হবে, আমরা গবেষণা করবো যে, এই মানা করাটি কি আপেক্ষিক না সার্বিক? যদি সার্বিক বলে ধরে নেই তাহলে মহানবী কিছুতেই পণ্ডদের সেজদা নিতেন না। পা সরিয়ে ফেলতেন। যেহেতু পণ্ডদের সেজদা মহানবী গ্রহণ করেছেন সেইহেতু কয়জন সাহাবাকে মানা করাটা একটা আপেক্ষিক সত্য। যেমন ‘দাসদের প্রতি তোমরা যা খাও ও পরো তাই দাও’ আবার ‘দাসদের মুক্ত করে দেবার আদেশ’ দুটোই মহানবীর বাণী। গবেষণার চুলচেরা বিশ্লেষণে মহানবীর দুটো উপদেশের মধ্যে একটি আপেক্ষিক এবং অপরটি সার্বিক। প্রথম উপদেশটি আপেক্ষিক কারণ যতদিন দাসপ্রথা চালু থাকবে ততদিন দাসদের প্রতি ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেদিন দাসপ্রথা আর থাকবে না সেদিন উপদেশটিও আর থাকছে না। সেইহেতু মহানবীর প্রথম উপদেশটি হল একটি নিরোট আপেক্ষিক সত্য। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদিসে পাই যে, ‘যারা মোহাম্মদের পূজা করতে তারা জেনে রাখ যে মোহাম্মদ আজ মৃত’। পুরো হাদিসটি না তুলে প্রথম লাইনটি তুলে ধরলাম দুটো কারণে। প্রথম কারণটি হল, এই হাদিস হতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে অনেক সাহাবা মহানবীকে পূজা করতেন। তাই এরকম উপদেশ দেওয়া হল। এখানে মহানবীকে পূজা করার কথাই উঠতো না

যদি বাস্তবে সাহাবারা পূজা না করতেন। যেহেতু মহানবীকে বহু সাহাবারা পূজা করতেন তাই হযরত আবু বকরকে এরকম উপদেশ দিতে হয়েছে। এতে কি গবেষণার দৃষ্টিতে স্পষ্ট পূজা করার কথাটির গোপন রহস্য ধরা পড়ছে না? দুই নম্বর কারণ হল, হযরত আবু বকর সিদ্ধিক ভাল করেই জানতেন যে নবীরা কখনোই মারা যান না। যেখানে একজন আল্লাহর অলীকে কোরান ‘মৃত বলিও না এবং মৃত চিন্তা করিও না’ বলা হয়েছে সেখানে অলীদের ইমাম মহানবী কী করে মারা যান? এখানেও গবেষণা করতে গেলে আবার দুটো প্রশ্ন সামনে আসে। প্রথম প্রশ্নটি আসে, মহানবীর এতেকালের পর যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, সাহাবাদের কান্না, মাতম আর খলিফা হযরত উমর ফারুকের খোলা তরবারি নিয়ে চিৎকার করা, এরকম নাজুক অবস্থায় হযরত আবু বকর এরকম কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। কতটুকু ভয়াবহ পরিস্থিতির সন্মুখীন হলে এরকম কথা বলতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। না হলে হয়তো সবকিছু আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। আবার যদি কোন কোন গবেষক এই কথাগুলো মেনে নিতে না চায় যে, নবীদের মারা যাবার প্রশ্নই তো উঠতেই পারে না, কারণ যেখানে নবীর উন্নত বলে পরিচিত বড় বড় অলীরা কোরান মতে মরে নাই কেবল বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, মৃত বলে চিন্তা করতে পারবে না এবং বলতেও পারবে না, সেখানে মহানবীর প্রধান সাহাবার মুখে একথা উচ্চারিত হতেই পারে না। বরং যারা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনায় সামান্য এদিক সেদিক হয়তো হতে পারে এবং সেটাই মহান সাহাবা হযরত আবু বকরের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে।

এখানে অধম লিখকের বলার কিছুই নেই। কারণ গবেষণার প্রশ্নে স্বাধীনতাকে মেনে নিতে হবে। তারপর যার যার ব্যক্তিগত গবেষণার ফল এক এক রকম হবে। সবাই একই রকম গবেষণা করবে এবং গবেষণার ফল একই রকম হবে, এরকম কথা বলতে চাই না। কারণ চিন্তার বিভিন্নতা থাকবেই এবং এই বিভিন্নতা আছে বলেই তো এত লীলা-খেলা এত বিচিত্র রং-ঢং-এর বাহার।

একটি নির্মম সত্য কথার উপর গবেষণা চালাতে চাই। আর সেটি হল ধৈর্যধারণের উপদেশ, অপরকে আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আঘাত না করার আদেশ, জুলুম, অত্যাচার, শোষণ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ, অন্যান্য মানুষের চিন্তাধারা গ্রহণযোগ্য মনে না করলে সহ্য করে থাকার অভ্যাস, যাকে আমরা গণতন্ত্র বলি এবং জ্ঞানীদের জন্য বুঝবার বিষয় অনেক কিছু আছে, এরকমভাবে কোরানে অনেক আদেশ-উপদেশ আছে। অথচ এত কিছুর উপর আদেশ উপদেশ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দলাদলি, মারামারি, একে অপরকে সহ্য না করা, প্রত্যেকের ব্যাখ্যা ও দর্শন কেবল শ্রেষ্ঠ বলেই চুপ করে থাকেনি বরং হংকার দিয়ে বলেছে যে, আর কোন ব্যাখ্যা, দর্শন এবং গবেষণা নেই, কারণ সবকিছু লিখা হয়ে গেছে সুতরাং সব শেষ। এই মারাত্মক স্লো পয়জন-মারকা চিন্তাধারা এত ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে যার দরুন প্রতিটি যুগে বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক বহু করুণ ঘটনার ছবি পাই। ঠিক কোরান যা বারবার বলছে তার ঠিক উল্টোটাঁই করা হয়েছে। আসুন, আলোচনা করা যাক, ইবনে সিনা, ফারাবী হতে নেমে এসে উমর খৈয়ামদের মত মনীষীরা কি কম অপমান এবং কানফের ফতোয়া পেয়েছে? আজ আমরা তাদের নাম গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করি, কিন্তু সেদিনের সেই

পরিবেশে তাদের গবেষণার উপর কম ফতোয়া পড়েনি। কেন এমন হল? বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে? অধম লিখক নিজেকে নিরপেক্ষ বলতে চেয়ে তুলসী পাতা ধোয়া জলের মত মনে করছি। কিন্তু আমারই মনের ভেতর ইসলামের উপর গবেষণা চালাতে গিয়ে কখন যে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তথা পরমত সহ্য করার বিরুদ্ধে বিষ ঢুকে গেছে সেটা বুঝতেই পারি না। যার দরুণ আমি নিজে ইমাম তাইমিয়া, মাওলানা মওদুদী আর মাওলানা আকরাম খাঁ-কে মোটেই সহ্য করতে পারছি না। তাদেরকে ইসলামের ঘোর শত্রু মনে করছি এবং তবলিগ জামাতকেও তাই মনে করছি। কেন এই মন মানসিকতা আমার মধ্যে প্রবেশ করলো? কেন তাদের গবেষণাকে পরমত সহ্য করার মত মনে নিতে পারছি না? আবার পক্ষান্তরে তাদের অনুসারীরা আমাদের গবেষণাকে একই রকমভাবে সহ্য করতে পারছেন না।

কোরানভিত্তিক গবেষণার প্রতি উৎসাহ প্রদান

এরই দরুন কি আজ আমরা পৃথিবীতে উনচল্লিশটি (?) মুসলিম দেশ হয়েও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য চাতক পাখির মত ইউরোপ আর আমেরিকার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকি? কোন পতন আর অপমানের বিবৃতি আমরা দাঁড়িয়ে আছি অথচ অনেক কিছু করে ফেললাম বলে বার বার তৃপ্তির আনন্দদায়ক ঢেকুর তুলি। যতদিন এই তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে থাকবো ততদিন আমরা পতনের কাদামাটি হতে

উঠে আসতে পারবো কি? এই পতনের কাদায় যে হাঁট গেড়ে আছে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন এ যুগের মহান ইসলাম গবেষক। মুসলমানদের মাঝে এক আনার জন্য যিনি সারাটি জীবন তিলে তিলে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন সেই মনীষীর কাছেই প্রথম ঘোষণাটি শুনতে পেলাম, ‘আমি শিয়াও নই, আমি সুন্নিও নই, আমি কেবলমাত্র একজন মুসলমান’। এই অবাক করে দেওয়া ঘোষণাটি যিনি করে গেছেন তিনিই ইরানের বিখ্যাত জাতীয় নেতা ইমাম খোমেনি। যার যার দলীয় শরিয়ত স্বাধীনভাবে পালন করে যাও, কিন্তু মুসলমান হিসাবে সবার পরিচয় হতে হবে এক। তোমার দলিল তোমার কাছে আর আমার দলিল আমার কাছে, কিন্তু সবাই আমরা মুসলমান—এই সুন্দর বাণীর বাহক হলেন ইমাম খোমেনি।

বিখ্যাত ইসলাম গবেষক বৈজ্ঞানিক মুরিস বুকাইলি তার রচিত বই বাইবেল, কোরান এন্ড সাইন্স-এ কোরানের বৈজ্ঞানিক সত্যতা কত সুন্দর আর নিখতভাবে তুলে ধরেছেন এবং বিশ্বে চিন্তার রাজ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনিই আব্বার ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের বিজ্ঞান ও চিকিৎসাভিত্তিক একটিও হাদিস গ্রহণ করতে পারেননি। মেনে নিতে পারেননি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করছেন। কারণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে তিনি একটি হাদিসকেও গ্রহণের যোগ্য পাননি বলে ঘোষণা করে গেছেন। যার দরুন লিবিয়ার মত মুসলিম দেশে ইমাম বুখারীর হাদিস গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে আমরা মাওলানা আকরাম খান ভাষায় বলতে চাই যে, যারা হাদিস সংগ্রহ করেছেন তাদের কী দোষ? তারা তো কেবল অনেকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে গেছেন। যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন তারা যদি ভুল করে থাকেন, অথবা লুকিয়ে এদিক সেদিক কিছুটা করে থাকেন, তাতে যিনি অথবা যারা হাদিস সংগ্রহ করে গেছেন তাদের কেন দোষারোপ করতে যাব? তারা তো কেবল সবগুলো হাদিস একত্র করে গেছেন। আব্বার শিয়া দলের মুসলমানেরা এই কথার বিরোধিতা করে বলেন যে, মেনে নিলাম তারা হাদিস সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইমাম বুখারী প্রায় ছয় সাত (?) লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু সব সংগ্রহীত হাদিসগুলো যদি রেখে যেতেন! কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং নিজের সাক্ষিত বুদ্ধি এবং জ্ঞানের মাধ্যমে বিচার বিশ্লেষণ করে কয়েক হাজার হাদিস রেখে সবগুলো কেন বাদ দিতে গেলেন? উনার বিচার বিশ্লেষণই কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে ধরে নেওয়া যায়? জ্ঞানের এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া কি তার মত বিজ্ঞ আলোচকের তিক হয়েছে? যদি তাই হত তাহলে মুরিস বুকাইলি কেন একটিও হাদিসকে গ্রহণ করে নিতে পারলেন না? তাহলে কি মুরিস বুকাইলির এরকম আচরণ সন্দেহমুক্ত নয়? শিয়া মুসলমানদের মূল বক্তব্য হল যে, সবগুলো সংগ্রহ করা হাদিস তিনি তুলে ধরতেন এবং জানিয়ে দিতেন এই বলে যে, ‘আমি কেবল হাদিস সংগ্রহই করে গেলাম এবং তুলে ধরলাম এবং এর মাঝে আমার কোন মন্তব্য নেই। বরং তোমরাই বেছে নিও যে, কোরানের সঙ্গে কোনটার মিল আছে আর কোনটার মিল নেই।

তাহলে ইমাম বুখারীর উপর আমাদের (শিয়া মুসলমানদের) কিছুই বলার থাকতো না এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতাম। এখন সুন্নিদের ইমাম বুখারীর বুখারী শরীফের উপর কী মত এটা প্রায় সবারই জানা থাকার কথা। তার উপর অধম লিখক নিজেই আহলে সুন্নাতুল জামাত নামক মুসলমান দলের একজন। সুতরাং সুন্নি আলেম হাকিমুল উল্লত মুফতি ইয়ার আহমাদ খান সাহেবের অনুসারী এই অধম লিখক। নামটা এজন্য উল্লেখ করলাম যে, সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে আবার দল, উপদল এবং উপদলের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। তাই মানুষের পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া যে কত বড় শক্ত বিষয় তা হাড়ে হাড়ে টের পাই। তাই আপনি যখন একটি ইসলামের উপর লিখা বই পড়তে যাবেন তখন সর্ব প্রথম ডেবে নিতে হবে যে, এই বইটি কোন দলের লিখকের লিখা বই পড়ছি? যদি তা ভুলে যান তাহলে কিছু বই পড়লেই সব তালগোল পাকিয়ে ফেলবেন এবং মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে থাকবে।

তবে একটা কথা বলে রাখতে চাই যে, যত স্বাধীন গবেষণাই করা হোক না কেন, সেই গবেষণাটি যেন কোরান-বিরোধী না হয়। আবার প্রশ্ন আসে, মূল কোরানের ব্যাখ্যা তো দুব্বের কথা, অনুবাদ পড়তে গেলে কেন এক এক রকম পাই? হবহ কোরানের অনুবাদ কেন আজ পর্যন্ত করা হল না বা হচ্ছে না? তারও আবার কারণ আছে, আর সেই কারণটি হল কোরানের বাণীর গভীরতা এত ব্যাপক, বিশাল এবং জটিল যে, বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের শক্ত ফর্মুলাগুলো হতে অনেক অনেক বেশি গভীর এবং বিশাল ব্যাখ্যা অনুধাবন করা রীতিমত হিমশিম খেতে হয়। ধরুন, কোরানের প্রথম বাণীটির যদি হবহ অনুবাদ করা হয় তার ব্যাখ্যা দিতে এক মহাসমস্যায় পড়তে হয়। প্রথমেই অনুবাদকি চোখে ধাধা দেখে এবং একেকজন একেক রকম ব্যাখ্যা করে যান। আবার অনেকে পারলাম না লিখতেও বাধ্য হয়েছেন। অনেকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পার-কুল না পেয়ে বলেছেন যে, এর ব্যাখ্যা এবং রহস্য একমাত্র আল্লাহই জানেন। আবার হয়তো আর একজন এর প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, যদি তাই হয় তাহলে আল্লাহ এমন কথা না জেল করলেন কেন? যেহেতু মানুষের জন্য না জেল করা হয়েছে সেইহেতু এর ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে বলে ঘোষণা করেন। আর একজন হয়তো এর ব্যাখ্যা লিখে ফেললে অপরজন কিছুই হয়নি বলে তখনই ঘোষণা করে দিলেন। যদি হবহ কোরানের অনুবাদ বাংলা ভাষায় করা যায় তাহলে সেটা যে কীরকম বুঝতে শক্ত হবে এবং সেটা করার ইচ্ছা রাখি এবং খোঁদা চাহে তো শুরু করবো। আবার এটাও বলতে চাই যে, আমার অনুবাদই হবহ হয়েছে বলায় কি ধর্ম্মতার লক্ষণ ফুটে উঠে না? আমি যদি কোরানের অনুবাদ আর ব্যাখ্যার গোজামিলগুলোর সম্মান্য কিছুটা তুলে ধরি তা হলে সেটা অনেক বড় হয়ে যাবে। কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কী রকম গোজামিল দেওয়া হয় তার অতি সামান্য নমুনা আমার রচিত বই মারফতের গোপন কথা-তে তুলে ধরেছিলাম। যার দরুন একটি বিশেষ দলের

কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়াতে অনেক হৈ চৈ করে বইটি বাজেয়াপ্ত করা এবং লেখকের শাস্তির দাবিনামা তুলে ধরা হয়েছিল। অবশেষে খবরের কাগজে এত লেখালেখি হয়েছিল যে, সরকারি বাধ্য হয়ে দশবছর ধরে চালু অবস্থার বইটিকে সাতাশি সালের পচিশে অক্টোবর বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করলেন এবং আমার বিরুদ্ধে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জজকোর্টে বিচারের দাবি তোলা হল। অবশেষে বেশ কিছুদিন দুই পক্ষের মতামত শুনবার পর মাননীয় জজ সাহেব উননবই সালের তেইশে নভেম্বর আমাকে বেকসুর খালাস রায় প্রদান করেন।

কোরানের উপর ভিত্তি করে গবেষণা করতে হয়। অনেকে সেই ভিত্তির দলিলটিকে মেনে নেয়, আবার অনেকে মেনে নেয় না। এখানেই যদি বিষয়টিকে রেখে দেওয়া যেত তাহলে আমাদের পরে যারা দুনিয়াতে আসবে তারা উভয়ের মতামত যাচাই করার সুক্কর সুযোগ পেত এবং এই পুরনো সত্য করার গণতান্ত্রিক অধিকারটিকে যদি সবাই সম্মান প্রদান করতে পারি তাহলে আমাদের প্রজন্ম অনেক কিছু নতুন নতুন জ্ঞান দান করে যেতে পারতো। ইউরোপ আর আমেরিকাতে এই গণতান্ত্রিক অধিকার আছে বলে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষাপ্তর হয়ে আছে। এটা শুনতে যতই খারাপ লাগুক না কেন, কিন্তু কথাটি অপ্রিয় সত্য।

কথার কথায় একটি সামান্য নমুনা এ বিষয়ে তুলে ধরতে চাই। ১৯৭৪ সালের ২২ হতে ২৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামিক সন্মেলন সংস্থা তথা ও আই সি-র ২য় শীর্ষ সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সন্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গিয়েছিলেন। সৌদি আরবের বাদশা ফয়সল একটি ঘরোয়া আলোচনায় শেখ মুজিবকে বললেন যে, বাংলাদেশকে তো আপনার মত নেতা যে কোন সময় মুসলিম দেশ বলে ঘোষণা করতে পারেন। ফয়সলের কথায় শেখ মুজিব বললেন যে, আমি যে মুসলিম দেশ বলে ঘোষণা দেব তার দলিল তো কোরানে নেই। কোরানের কেখাও তো বলা হয়নি ইয়া আইয়ুহাল মুসলিমুনা তথা হু মুসলমানেরা, বরং বলা হয়েছে ইয়া আইয়ুহান নাস তথা হু মানবজাতি এবং এই বলে বাদশাকে সুরা হুদের একটা অংশ মুখস্থ পড়ে শুনালেন। বাদশা ফয়সল তো একেবারে থ মেরে চুপ করে রইলেন। এবার বাদশা ফয়সলকে পাঁচটা প্রশ্ন করলেন এই বলে যে, ইসলামে রাজতন্ত্র কোথায় আছে আমাকে দেখিয়ে দেবেন কি?

এই বিষয়টির উপর অনেক কিছু হয়তো পক্ষে-বিপক্ষে আমরা বলতে পারি, কিন্তু এই সামান্য জ্ঞানগর্ভ কথাটি শেখ মুজিবের মুখ হতে বেরিয়ে পড়বে এটা হয়তো বাদশা ফয়সল কল্পনাও করতে পারেননি। বিশেষ করে ইসলামে রাজতন্ত্রের কথাটি তোলাতে নীরব থাকারটাই সমীচীন মনে করেছিলেন বাদশা ফয়সল।

আমরা সেই সেজদার বিষয়টি নিয়ে আরো সামান্য কিছু গবেষণা চালাতে চাই। ‘সুন্নাতুল্লাহি লা তাবদীলা’ তথা ‘আল্লাহর আইন বদলীয় না’ কোরানের এই

আয়াতটি খুবই চিত্তার বিষয়। কতগুলো আইন আছে যা আদম হতে আজ পর্যন্ত বদল হয় নাই এবং হবে না। যেমন মোম্বাহির তৈরি মধু। এ বিধান বদলায় না। যতদিন মোম্বাহি আছে এবং থাকবে ততদিন মধু তৈরি হবেই। মধুর বিশেষ একটি গুণ আছে আর তা হল, ইহা খুবই মিষ্টি। মধু পূর্বে মিষ্টি ছিল এখনও তাই আছে কিন্তু নিম্নের মত তেতো হবে না। কারণ নিম্নের গুণ যেমন তেতো তেমনি মধুর গুণ হল মিষ্টি। এটাকে মধু এবং নিম্নের নিজস্ব তকদিরও বলা যেতে পারে। সেরিকমভাবে যাহা শেরেক উহা আদম হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত শেরেক। শেরেক এক যুগে তৌহিদ হতে পারে না, আবার অন্যযুগে তৌহিদ শেরেক হতে পারে না। যদি মহানবীকে সেজদা দেওয়া শেরেক বলে ধরে নিতে যাই তাহলে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মত নবী কেবল শেরেকই করেন (?) নি বরং সুম্মাজের চাল আদবের বরখেলাপ (?) করেছেন বলে ধরে নিতে হয়। তার কারণটি হল, তিনি এত বড় নবী হয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মত নবীকে কেন প্রকাশ্যে সেজদা করলেন? তাছাড়া এটা সবারই জানা থাকার কথা যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যদিও বিখ্যাত নবী, কিন্তু উনার বাবা তথা জন্মদাতা কে ছিলেন? উনার বাবাই হলেন সেই বিখ্যাত নবী হযরত ইয়াকুব (আঃ)। নবীপুত্র হযরত ইউসুফের পায়ে নবী পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) কেন সেজদা দিলেন এবং তাও আবার সবার সামনে? পিতা কী করে পুত্রকে সেজদা দিলেন? এর রহস্য কী? এর মারেফতের গোপন কথাটি কী হতে পারে? গবেষণার বিষয়ই বটে। তাও আবার ছোট পুত্র নবী, বড় ছেলে নন। সুম্মাজের বিধি-বিধান অনুসারে আমরা বাবাকে সালাম করি, শুদ্ধা করি কিন্তু নবী ইয়াকুব (আঃ)-এর ব্যাপারে ঘটলো ঠিক তার সম্পূর্ণ উল্টা। পিতা সেজদা দিয়েছেন ছেলেকে। তাও আবার ছোট ছেলেকে। এই সেজদার ঘটনাটি ঘটেছিল মিশরে। যখন পিতা-পুত্রের মিলন হয়। আরো অবাক হবার কথাটি বলা হল না। সেই অবাক হবার কথাটি হল এই যে, নবী হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর মা, যিনি পেটে ধরেছেন, তিনি পর্যন্ত ছেলেকে প্রকাশ্যে সেজদা করলেন। যেখানে মায়ের পদতলে বেহেশ্ত, সেখানে মা কী করে ছেলেকে সেজদা করলেন? কথাটি চিত্তার বিষয়। ভ্রম্যনকভাবে অবাক হবার কথা। কিন্তু আসলে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ তারা আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। এখানে নবুয়তের মর্যাদার প্রশ্ন। মর্যাদায় পুত্র নবী হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতা নবী হযরত ইয়াকুব হতে উচুতে অবস্থান করছেন, তাই এখানে নবুয়তের মর্যাদাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। পুত্রের প্রশ্নটি এখানে গোণ এবং নবুয়তের মর্যাদার প্রশ্নটিই এখানে মুখ্য। তা না হলে বাবা এবং মা ছোট ছেলেকে সেজদা দিতেন না। দেবার প্রশ্নই উঠতো না। নবুয়তের মর্যাদার সামনে আপনজনের বড়-ছোট হওয়া, এমনকি বাবা, মা এবং অন্যান্য বড় ভাই হওয়াটা কোন বিষয় বলেই আল্লাহর কাছে গণ্য হয় না। কারণ আল্লাহ মুমিনদের শানে ধারাবাহিকতার প্রশ্নে সফল বিচারক এবং এখানে কলুষিত আম্মিতের মৃত্যু অনেক আগেই হয়ে গেছে। আম্মি

আমি' ভাবটি যেখানে নেই সেখানে মিলন-মিলন আর শান্তি ছাড়া আর কী থাকতে পারে? যত আকাম-কুকামের নেতা হল আমাদের এই 'আমি আমি' ভাবখানা। এই 'আমি আমি' ভাবনার অনেক নাম আছে। যেমন, আমি, অহম, ইগো, হান্সি, খুদি, খান্নাস ইত্যাদি। এই খান্নাস হতে মুক্তি পেলেই মানুষ মোমিনে পরিণত হয়। এর আগে নয়। তাই কোরান এই খান্নাস হতে মুক্তি চাইবার প্রার্থনা শিখিয়েছেন বহুবার বহু ভাষার শৈলিতে। যেমন, মিন শারীরল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস।

আমরা এবার সেজদার বিষয়টির আর একটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সেই বিষয়টি হল, পশুদের মহানবীকে সেজদা দেবার জন্য দৃশ্য দেখে কয়জন সাহাবাও সেজদা করার অনুমতি চাইলে মহানবী মানা করে দিলেন। এখানে কেবল মানা করলেন, কিন্তু সেজদা করলে শেরেক হবে সেই উপদেশ মহানবী দেননি। আবার এই যে মানা করলেন, এই মানা করাটি কি চিরদিনের জন্য না কিছুদিনের জন্য? এই মানা করাটা কি সার্বিক না আপেক্ষিক? এ প্রশ্নটি এজন্যই তোলা হল যে, মহানবীর আদেশ ক্বের বিশেষ এবং সময়ের চাহিদার দিকে চেয়ে নিষেধে পরিণত করা হয়েছে, এর প্রমাণ আমরা ইসলামের ইতিহাসে পাই। অবশ্য গবেষণার প্রশ্নে গবেষকদের মতামত এ বিষয়ে এক হতে পারেনি। আগেই বলেছি যে, মুসলমানেরা পুরমত সহ্য করার মত গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেবল অস্বীকার করেনি, বরং এ নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বহু বাধিয়েছে, এবং পরিণতিতে খনাখনিতে গিয়ে গড়িয়েছে। নিরপেক্ষতাকে মুসলমানেরা প্রায় ভণ্ডামির কাছাকাছি মনে করতো। আর মনে করতো যে, 'আমার গবেষণা এবং ব্যাখ্যা শেষ এবং চূড়ান্ত।' এরপর আর কোন ব্যাখ্যা এবং গবেষণা চলবে না। হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত বিখ্যাত মনীষী প্রকাশ্যে হযরত উমর ফারুকের অনেক ভুল ধরেছেন। যার দরুণ আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীরা এই রকম মন্তব্যকে সহ্য করতে না পেরে তাকে নিম্নমণ্ডাবে হত্যা করেছে এবং ওহাবি মতবাদের আদি গুরুঠাকুর বলে ফতোয়া দিয়েছে। আবার ওহাবিরাও একদিন সুযোগ পেয়ে সুন্নিদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করেছে। অথচ সব দলই ভাল করে জানে যে, জেনে শুনে একজন মুসলমানকে হত্যা করলে সে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে যায়। কিন্তু এত বড় অকাট্য সত্য কথাটি জেনে শুনেও একে অপরকে হত্যা করেছে ফতোয়ার মাধ্যমে। প্রথমে ফতোয়া দেওয়া হয় কাফের, তারপর হত্যা। এভাবে সব কয়টি দল একে অপরকে কাফের ফতোয়া দেবার ফলে মুসলমান আর একটিও থাকছে না। ফতোয়াবাজির ইতিহাস বড়ই করুণ এবং বন্য পশুর চেয়েও হিংস্রতা প্রকাশ পেয়েছে। একটা পুরনো বাসি কথা শুনালাম।

একটি সামান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। যেমন মোতা বিবাহ। এই মোতা বিবাহের আইনটি মহানবী চালু করেছিলেন, এটা সবারই জানা থাকার কথা। এই মোতা বিবাহের প্রথা মহানবী হতে প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর

(রাঃ)-এর সময় পর্যন্ত চালু ছিল। এমন কি হযরত উমর (রাঃ) এর যুগেও চালু ছিল। কিন্তু পরে এই মোতা বিবাহটি একটি সমস্যার বিষয়ে পরিণত হয়ে যাওয়াতে তিনি নিষেধ করে দিলেন এবং সরল মনে ঘোষণা করলেন যে, মোতা বিবাহ যাহা মহানবী এবং হযরত আবু বকরের যুগে চালু ছিল উহা আমি হারাম বলে ঘোষণা করলাম এবং এটি যদি কেউ করে তাহলে আমি শাস্তি দেব। (আহকামুল কুরআন ১৫২/২), (ফাতহুল বারী ১৪১/৯), (উমদাতুল কারী আলি আইনী ৩১০/৮)।

হযরত উমরের ঘোষণাকে সর্বপ্রথম শিয়া দলের মুসলমানেরা মেনে নিতে পারেননি। তাদের কথা হল যে, হযরত উমর (রাঃ) কে যে মহানবীর দেওয়া আইনকে হারাম বলে ঘোষণা করবেন? শিয়াদের মতে এই ঘোষণাটা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ বিষয়ে তারা অনেক প্রকার যুক্তি ও গবেষণামূলক বই রচনা করে গেছেন। পরবর্তীকালে শিয়া ও সুন্নি উভয় দলের ঘোর বিরোধী হলেও ইমাম ইবনে তাইমিয়া হযরত উমর (রাঃ)-এর অনেক ভুল ধরেছেন এবং অন্যায় করেছেন বলে মন্তব্য করে গেছেন। (মুসলিম মনীষা)। কিন্তু আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীদের বক্তব্য হল, কোন হালাল প্রয়োগ ব্যবস্থাকে বাদ দেওয়া যায় তখনই, যখন সমাজের ভারসাম্য ঠিক রাখার প্রশ্ন দেখা দেবে। এমনকি যাহা হারাম বলে পরিচিত উহাও সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রশ্ন দেখা দিলে হালাল করা যায়। আবার মহানবীর বিখ্যাত সাহাবা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বিরোধিতা করে বলেছেন যে, হযরত উমর (রাঃ) যদি মোতা বিবাহকে হারাম না করতেন তাহলে জঘন্য চরিত্রের কিছু মানুষ ছাড়া কেউ জিনা করার তথা অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজনই অনুভব করতো না। (আহকামুল কুরআন ১৪৭/২)।

আসলে মতভেদ, গবেষণার বিভিন্নতা, দর্শনের বিচিত্রতা এবং চিন্তার উচ্চ-নিচ ধাপগুলোর দরজা বন্ধ করে দিলে বিশ্বের দরবারে একদম পিছিয়ে পড়ে থাকতে হয়। এখন পিছনে পড়ে থেকে যদি আনন্দ পাওয়া যায়, তাতে অধম লিখকের কিছু বলার নেই। কেবল এটুকুই বলতে চাই, যা তকদিরে আছে তা তো হবেই। কেউ যদি বিরোধিতা করে বলে যে, এ ধরনের তকদির সহজেই বদলানো যেত এবং যায়, তাহলে সেই মাননীয় বিরোধিতার সঙ্গেও আমি সম্পূর্ণ একমত। সুতরাং এসব মতবিরোধের বিষয় নিয়ে আলোচনা এই বইতে যত কম করা যায় ততই ভাল মনে করি। কারণ আলোচ্য বিষয় এটা নয়। এসব বিষয়ের বিস্তারিত মতভেদ কোরান তফসির লিখার সময় তুলে ধরবো বলে আশা করি। সুতরাং সেজদার বিষয়টি শেরেক করা মোটেই নয়, আশা করি পাঠক এটুকু আলোচনাতেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। পছন্দ না হয়, মানা করে দিন। কিন্তু খবরদার, ভুলেও শেরেক বলতে যাবেন না। কারণ জ্ঞান অসম্মি। সুতরাং সসম্মি হয়ে অসম্মির সবটুকু জেনে ফেলেছেন বলাটা অন্যায়। কারণ বস্তুর বিজ্ঞানীরা যেখানে পার-কূল বুঝতে

পারেন না, সেখানে যারা সত্যিকার অর্থে কাম্বল তাঁদের কথার উপর নকতা ধরতে যাবেন না। বড় পীর সাহেবের রচিত দিওয়ান পড়লে মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে। আবার তিনিই সাধারণের বোঝার জন্য সাধারণভাবেও লিখে গেছেন। শিশুকে পোলাও-কোরুমা খেতে দিলে পাতলা পায়খানা হবে। বড় পীর সাহেবের দেওয়ানের দুটো লাইন মনে পড়লে অধম লিখকের মাথা ঘুরায়। সেই দুটো লাইনে বড় পীর সাহেব বলেছেন যে, 'সমস্ত সৃষ্টির বিকাশ একমাত্র আল্লাহর, কিন্তু হুকুম চলে আমারই।' মসনভার বুঢ়ায়িতা বিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমার পীর বাবা শামসেস্তারীজের তিনটি বাক্য আজও অধম লেখক বুঝে না। অনুবাদ করা যায় কিন্তু বুঝা যায় না। যেমন তিনি বলেছেন, 'আদম না বুদে মান বুদাম। হাওয়া না বুদে মান বুদাম। ওয়া জাতে সজা না বুদে মান বুদাম।' অনুবাদ হল, 'আদম যখন ছিল না, তখন আমি ছিলাম। হাওয়া যখন ছিল না, তখন আমি ছিলাম এবং খোদার জাত যখন ছিল না, তখনও আমি ছিলাম।' জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কতদূর অসীম তার নমুনা কি সুরা কাহাফে বর্ণিত হয়রত মুসা (আঃ) এবং হয়রত খিজির (?) দিয়েও বুঝতে পারি না? একজন অতি উচ্চ মর্যাদার নবী মুসা (আঃ) সেই জ্ঞানের বিন্দু-বিসর্গ বুঝা তো দূরে থাক, ধৈর্যই রাখতে পারলেন না। তবে এটা সত্য যে, অধম লিখকই বলছি, এই বিজ্ঞানই একদিন অনেক কিছুর রহস্য খুলে দেবে। তাই আসুন, দলাদলি না করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় এগিয়ে যাই। মহান আল্লাহ পাকের খাস রহমত তখন নিশ্চয়ই নাজেল হবে।

আমরা আর একটি বিষয় নিয়ে এখানে সামান্য আলোচনা করতে চাই। কারণ এ বিষয়টি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ খুব একটা না থাকলেও কিছুটা ভুল বঝাবুঝি হয়। তাই বিষয়টা পরিষ্কার করে দিতে চাই। সেই বিষয়টি হল, মহানবীকে আমরা কী রূপে গ্রহণ করবো? কেবল নবী এবং রসুল রূপেই কি মানবো, না আরো কিছু? কোরান ও হাদিসে পাই যে মহানবীকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় জানতে হবে। যতদিন পর্যন্ত মহানবী একজন আশেকের কাছে তার জীবনের চেয়ে প্রিয় না হতে পারবে, ততদিন সে মোমিনের দলে ঢুকতে পারবে না। ততদিন সেই আশেক আমানুর দলের একজন সদস্য, কিন্তু মোমিন নয়। কিন্তু ওহাবি মতের অনুসারীদের মত হল ঠিক এর উল্টা তথা বিপরীত। তাদের মতে মহানবী হলেন আমাদেরই মত মানুষ, তবে মান-সম্মানের প্রশ্নে মহানবীকে বড় ভাইকে যে ইজ্জত করা হয় সেরকম ইজ্জত করতে হবে। যদি মনগড়া না করে নিরপেক্ষ বিচারে ওহাবিদের এরকম মতামতকে সত্য বলে ধরে নিতে যাই তাহলে অতি সাধারণ চিন্তাতেও ইহা সম্পূর্ণ কোরান বিরোধী কথা। কারণ কোরানের সুরা আহযাবের ছয় নম্বর অয়াতে মহানবীর স্বগণকে বিশ্বাসীদের মা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, যেখানে মহানবীর স্বগণকে বিশ্বাসীদের মাতা বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে মহানবীকে বড় ভাইয়ের মত ইজ্জত করতে উপদেশ মেনে নিলে মাতার ইজ্জত থাকে কোথায়?

তাহলে তো মহানবীর স্ত্রীরা বিশ্বাসীদের বড় ভাবী হয়ে যায়। কারণ আর যাই হোক না কেন, বড় ভাইয়ের স্ত্রীরা মা হতে পারে না। হয়ে যায় বড় ভাবী। অথচ কোরান বলেছে মাতা আর ওহাবিরা বলেছে বড় ভাবী। মতের কত বড় জঘন্য গড়মিল। মনগড়া কথার রূপ দিয়ে কোরানের ঘোষণাকে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা। যদি ওহাবিদের উপদেশকে গ্রহণ করা হয় তাহলে আরো কিছু বলা যায়। যেমন বড় ভাই মারা গেলে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করার বিধান শরিয়তের আছে। অথচ এখানেও ওহাবিদের চিন্তার ভুলটা দেখুন যে, মহানবীর স্ত্রীরা যেহেতু বিশ্বাসীদের মাতা সেই হেতু বিবাহ সম্পূর্ণ হারাম। ইহাও কোরানেরই কথা। অথচ এই ওহাবিরা কোরানের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে এবং ব্যাপক প্রচার করে ইসলামের মূল ভিত্তিটাকেই ভেঙ্গে দিয়েছে। তাদের কথায় তারাই বহু ভুল করে কোরানের যা-তা তফসির রচনা করে বাজারে ছেড়ে সরল মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে চলছে। এই ওহাবিদের প্রচার শক্তি এত বেশি যে সেই তুলনায় আমাদের প্রচার নদী আর এক বালতি পানির মত। ওহাবিরা ভুল মেনে নিয়ে তওবা করুক। কারণ একজন বুড়ো পায়খানা করে দিলে আমাদের কী করতে হবে? পায়খানা পরিষ্কার করতে হবে। আমরা পায়খানা ফেলে না দিয়ে বুড়োটাকে ফেলে দিতে পারি না। যদি বুড়োকেই ফেলে দেই তাহলে মানবতার অপমান করা হবে।

কোরানের সূরা আহজাবের হয় নব্বুর আয়াতে কিন্তু প্রথমেই বলা হয়েছে যে, মহানবী বিশ্বাসীদের কাছে তাদের জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় এবং তারপর বলা হয়েছে যে, নবীর স্ত্রীরা বিশ্বাসীদের মাতা।

আর একটি গবেষণামূলক প্রশ্ন ওঠে যে মহানবীর স্ত্রীদেরকে মাতারূপে কেমন করে গ্রহণ করা যায়? পিতার ইজ্জতের দরুনই মোমিনদের মা বলে বিশেষ সম্মান কোরান দিয়েছে। মহানবীর নব্বুর পুত্ররূপে, আলোর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য আমানদেরকে মোমিন হতে বার বার উপদেশ দিচ্ছেন। অথচ কোরান ঘোষণা করছে যে, 'মোহাম্মদ তোমাদের কোন মানুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসুল।' অথচ বাস্তবে দেখতে পাই যে, মহানবীর ঔরশে দুই দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। তার প্রথম পুত্রের নাম কাশেম। যার দরুন মহানবীর আর এক নাম আবুল কাশেম তথা কাশেমের বাবা। মহানবীর অন্তিম অবস্থায় তার শেষ পুত্র হযরত ইব্রাহীম দেহত্যাগ করেন। এই শেষ পুত্র হযরত ইব্রাহীম জীবিত থাকাকালীন কোরান ঘোষণা করছে, 'মোহাম্মদ তোমাদের কোন রেজালের বাবা নহেন।' এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন যে, রেজাল অর্থ মানুষ বা মানবজাতি। এখানে রেজাল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু মোমিন শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। কারণ মানুষ আর মোমিন দেখতে এক রকম মনে হলেও মোমিন হল মহানবীর নব্বুর সন্তান। মোমিন কখনো দৈহিক সন্তান নয়। তাই যিশুখ্রিস্ট সবসময় আল্লাহকে পিতা বলে ডেকেছেন। এই পিতার সম্পর্ক নব্বুর সম্পর্ক। কারণ আল্লাহ দৈহিকভাবে কোন সন্তানগ্রহণ করেন না। 'মহানবীকে ভালবাসতে

পারলেই আল্লাহকে ভালবাসা হল', এই বাক্যটির গোপনীয়তার রহস্য যিনি আন্তরিকভাবে গবেষণায় লেগে থাকবেন তিনি সুফিবাদকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন, এ কথাটি জোর দিয়েই অধম লিখক বলতে চায়।

আল ইয়াউম্মা আকম্মালতু লাকুম্ব দীনা কুম্ব ওয়া আত্মামতু আলাইকুম্ব নিয়াম্মাতি ওয়া রাহিতলুকুম্ব ইসলামী দীনী।

আজ আমি তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের ধর্মকে এবং আমার অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম ধর্ম।

আমরা কোরানের এই আয়াতটির জটিল, সূক্ষ্ম এবং নিরপেক্ষ গবেষণা করতে চাই। সাইনবোর্ডের দুর্বলতা লাগি মেরে ফেলে দিয়ে আলোচনা করা হবে। দুর্লভ দুর্বলতা নিজের সন্তানদের চেয়েও মারাত্মক দুর্বলতা বলতে চাই। এই দুর্বলতার অভিধানে পৃথিবীর মানুষগুলো সত্যকে দূরে সরিয়ে অনুষ্ঠানের নানা রং-চং এর নাচনাচি করেছে। আর তারই পরিণাম যে বিশ্বশান্তির জন্য কত মারাত্মক, বার্লিন প্রাচীরের মত কত প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছে, যার দরুন মানবতার শাস্ত্রবাণী চিৎকার করে কাদছে। এই সব নোংরা দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার মহাবাণীই হল কোরানের এই বাক্যটি। আরো একটু ভাল করে জেনে রাখুন যে, এই বাক্যটিই ছিল কোরানের শেষ বাক্য। অথচ কোরান বোর্ড কোরানের এই শেষ বাক্যটিকে সুরা মাইদার তিন নম্বর আয়াতের শেষের একটু আগে বসিয়ে দিয়েছে। কেন কোরানের শেষে না রেখে এমন একটি স্থানে ঢুকানো হল বলে যদি প্রশ্ন করেন, তাহলে অনেক কিছু বলার থাকলেও পারব না। যদি বলেন, খুলে বলুন, এর রহস্য কী, তাহলে অধম লিখক সবকিছু জেনেও বোবা। যদি বলেন এটাও এক প্রকার ভণ্ডামি করছেন, তাহলে চোখের জলে মাথা নত করে চুপ করে থাকুন। আমাদের আর কোন উপায় নেই। তবে এটুকু বুদ্ধিমান পাঠকদের অবগতির জন্য বলে রাখতে চাই যে, কোরান বোর্ডে যে কয়জন সাহাবাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে মাওলা আলীর মত বিখ্যাত সাহাবাকে রাখা হয়নি। যদি প্রশ্ন করেন যে, মহানবী বলে গেছেন যে, তিনি জ্ঞানের শহর এবং আলী সেই জ্ঞানের একমাত্র দরজা, আর সেই একমাত্র জ্ঞানের দরজাকেই বোর্ডে বাদ দিলেন কেন? বহু কথা জানা থাকলেও অধম লিখক বলতে পারবে না। কারণ মুসলমানেরা গবেষণাকে ঘৃণা করে, অনেক রকম ফতোয়া মারে, যার দরুন উনচল্লিশটি (?) মুসলিম দেশ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্নে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? সুতরাং এই মরা কান্নার বিলাপ না করে এখন এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করছি।

প্রথমেই খুব ভাল করে লক্ষ্য করুন যে, কোরান বলেছে, 'আজ আমি তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম ধর্মকে।' ধর্মটিকে সম্পূর্ণ করে দিলেন বলা হল। সম্পূর্ণ বলতে কী বুঝায়? সম্পূর্ণর অর্থ কী? যাহা পূর্ণ নয়, যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় এতদিন ছিল, সেটাকেই পূর্ণ করে দেবার কথা বলা হয়েছে। কারণ অপূর্ণকেই পূর্ণ করা

যায়। অসম্পূর্ণকেই সম্পূর্ণ করার কথা বলা যায়। সুতরাং এতকাল ধর্মটি ঠিকই ছিল, কিন্তু একটু অসম্পূর্ণ ছিল, একটু অপূর্ণ ছিল বলেই আজ সম্পূর্ণ করার কথা, পূর্ণ করে দেবার সুসংবাদ দেওয়া হল। আরো লক্ষ্য করুন, ইহা কিন্তু কোরানের কথা তথা আল্লাহর কথা। ইহা কিন্তু হাদিস নয়। যদিও আল্লাহ মানুষ মহানবীর ছোট্টেই এই বাণী ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এতদিন ধর্মটি পূর্ণ ছিল না, এতদিন ধর্মটি ছিল অসম্পূর্ণ। প্রশ্ন উঠে, কতদিন ধরে ধর্মটি পূর্ণ ছিল না, কত কাল ধরে ধর্মটি ছিল অসম্পূর্ণ? উত্তর হল, হযরত আদম হতে মহানবীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর ধর্মটি ছিল অপূর্ণ তথা অসম্পূর্ণ। মহানবীর মাধ্যমেই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, আজ তোমাদের ধর্মটিকে সম্পূর্ণ করে দেওয়া হল। আমরা ভাল করেই জানি যে, যে কোন বিষয় যাহা অপূর্ণ অবস্থায় আছে বা থাকে তাকেই কেবল পূর্ণ করা যায়। যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে যায় সেটাকেই সম্পূর্ণ করা হয়। যেমন ধরুন, একটা ইটের দালান অথবা টিনের ঘর যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে সেটাকে সম্পূর্ণ করার আয়োজন চলে। একটা ইটের দালান বানানো হল কিন্তু দরজা জানালটুকু যদি না লাগানো হয় তাহলে সব কিছু করা সত্ত্বেও সামান্য দরজা-জানালার জন্য দালানটিকে অসম্পূর্ণ বলা হয়। দরজা-জানালার যেই লাগিয়ে দেওয়া হল তখনই দালানটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল। অর্থাৎ যে কোন কাজের কিছুটা বাকি থেকে যায় এবং সেই বাকি অংশটির কাজ করে দিলেই বলা হয় সম্পূর্ণ করা হল। সুতরাং এখন আমরা একদম নিশ্চিত বলতে পারছি যে, যাহা অপূর্ণ, যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে বা থাকে কেবল সেটাকেই পূর্ণ করার তথা সম্পূর্ণ করার কথা উঠে। বিদায় হজ্জের ভাষণে, হাদিসে, মহানবীর বাণী আমরা আরো বিস্তারিতভাবে পাই।

এখন পাঠকদেরকে বলতে চাই যে, যাহা একেবারেই বাদ তথা বাতিল হয়ে যায়, অথবা যাহাকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় সেখানে সম্পূর্ণ করা, পূর্ণ করার কথাগুলোই আসতে পারে না। যাহা বাতিল উহা ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু যাহা অসম্পূর্ণ উহা সম্পূর্ণ করা হয়। সুতরাং কোরান যেখানে সম্পূর্ণ করার কথাটি ঘোষণা করছে সেখানে বাতিলের কথা আসতেই পারে না। তাহলে আদম হতে মহানবীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর ধর্মটি অসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু বাতিল ছিল না। কারণ যাহা বাতিল উহা ফেলে দিতে হয়। মহানবীর আগে যত নবীর আগমন হয়েছে তাদের কাহারও উপর আল্লাহর পাঠানো বাণীগুলোর একটিও বাতিল হয় নাই বলেই কিছু অংশ বাকি ছিল এবং সেই বাকি অংশটুকু কেবল মহানবীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ করার কথা কোরানে ঘোষণা করা হল। তাই বাতিল বলে যেন ভুল করে না ফেলি তার জন্য কোরানে বেশ কয়েকবার বলা হয়েছে, আল্লাহর আইন কখনোই বাতিল হয় না বা বদলায় না। অথচ খুবই দুঃখের বিষয় যে, অনেকেই মহানবীর আগের সকল নবীদের উপর পাঠানো বাণীগুলোকে বাতিল হয়ে গেছে বলে প্রচার করে দলীয় সাইনবোর্ডখানাকে তুলে ধরি। অথচ কোরান যেখানে

অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করার কথা ঘোষণা করছে সেখানে কিছু আলেম নামের কুলাংগারেরা বাতিল বলে ঘোষণা করে। তারা 'লিউজহিরাই'-কে তথা প্রকাশিত হওয়াকে উল্টা অর্থ করে এই বলে যে, আগের সব নবীদের বাণীগুলো একদম বাতিল হয়ে গেছে। কত বড় সাংঘাতিক আত্মবিরোধী কথা। একবার ভেবে দেখার দরকার মনে করে না যে, কোরানের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলা কোরানের নামে চালিয়ে দিয়ে মানুষের কাছে কোরানের সুন্দরতম ভাবমূর্তিটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে। এরকম আকাম-কুকাম করা হবে জেনেই মহানবী আগের বলে গেছেন যে, আলেম নামের বেশ কিছু কুলাংগারেরা পশুর চেয়েও জঘন্য হবে এবং ইসলামের মেরুদণ্ডটিকে ভেঙ্গে ফেলবে। আজ ইসলামের নামে হয়েছে তাই। সেজন্যই তো একই কথা বার বার বলছি যে, মৌল্য দিয়ে মোহাম্মদকে বিচার করতে গেলেই ভুল করবেন, যেমন ভুল করা হয় যাজক দিয়ে খ্রিস্টকে বিচার করে এবং অন্যান্যদের বেলাতেও এই একই কথা সম্মানভাবে বলা যেতে পারে। যে জিনিসটি বা যে বিষয়টি বাদ হয়ে যায় অথবা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় সেখানে অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করে দেবার কোরানের ঘোষণাটি একদম উল্টাপাল্টা হয়ে পড়ে। বাতিলকে ফেলে দেওয়া হয়, যাহা আর নেওয়া যায় না উহাকেই বাতিল বলা হয়। সুতরাং যেখানে কোরানের সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী নবীদের দ্বারা অসম্পূর্ণ ধর্মটি মহানবী মোহাম্মদ (আঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হল, তাহলে পূর্ববর্তী নবীদের সংখ্যা কত? প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী পাঠানো হয়েছে বলে কোরান বার বার ঘোষণা করেছে। তাহলে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর আগমন হওয়াটাই একান্ত স্বাভাবিক এবং এই এত সংখ্যক নবীদের দ্বারা আল্লাহর একটি মাত্র ধর্ম ইসলামকে ধাপে ধাপে তথা বিবর্তনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতায় আনা হল মহানবী মোহাম্মদের (আঃ) দ্বারা। তাহলে দুটো প্রশ্ন এখানে দাঁড়ায়। একটি হল মহানবীর আগের নবীদের বাণীগুলো বাতিল হয়নি। যদিও আলেম নামের কুলাংগারেরা 'লিউজহিরাই' শব্দটির অর্থ করে নিয়েছে বাতিল এবং এই বাতিল শব্দটি ব্যবহার করে মহানবীর আগের সকল নবীদের বাণীগুলোকে বাতিল তথা অচল বলে ঘোষণা করে দিয়েই শেষ করে দেওয়া হয়নি বরং নতুন বংশধরদের চোখে সংকীর্ণতার ধূলি পড়িয়ে দেবার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে গেছে, যাতে প্রকৃত সত্যটি যে বিশ্বজনীন উহা না বঝতে দিয়ে একটা দলগত সংকীর্ণ স্বার্থবাদকে বিশ্বজনীনতার সুন্দর লেবেল মেরে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্নে মুসলমান দেশগুলো যে শুধু পেছনে পড়ে আছে তাই নয়, বরং নিজেরাই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবার ইতিহাস দিয়ে ইসলামের ইতিহাসটি পরিপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাসের যে কোন একটি পাতা খুলে পড়ুন, দেখতে পাবেন এক মুসলমান ভাইয়ের আর এক মুসলমান ভাইয়ের উপর যুদ্ধ ঘোষণার করুণ কাহিনী। হুমায়ুন, ইব্রাহিম লোদী, শেরশাহ এরকম কত যুদ্ধের বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাবেন।

আর একটি প্রশ্ন হল, এই দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসূল পৃথিবীতে বাস করা প্রত্যেক জাতির মধ্য হতে পাঠানো হয়েছে, তাহলে কি প্রত্যেক জাতিতে পাঠানো নবী-রসূলেরা কি আলাদা ধর্ম প্রচার করে গেছেন? না কি এই প্রত্যেক জাতিতে পাঠানো নবী-রসূলেরা একটি মাত্র ধর্ম প্রচার করে গেছেন? আরবি ভাষায় আল্লাহর সেই একটি মাত্র ধর্মটির নাম ইসলাম। কিন্তু পৃথিবীতে তো বহু জাতি বাস করছে এবং বহু জাতির ভাষার প্রচলন আছে। তাহলে ইসলাম শব্দটির অর্থ বহু ভাষায় বহু নাম হতে পারে। তাহলে ইসলাম শব্দটির অন্য জাতির অন্য ভাষায় প্রতিশব্দটি যদি গুলতে অন্য রকম হয় তাহলে কি উহা আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম বলে বিবেচিত হবে না? যদি তাই হয় তাহলে ধর্মের তথাকথিত আলেম নামের কুলাংগারেরা যেমন কিছু মৌলানা, যাজক, পাণ্ডা, পুরোহিত, সেনেগগ, ডিকুরাই কি আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ইসলাম ধর্মটির উপর বিকৃতির আঘাত হেনে চলেছে না? মানুষে মানুষে ধর্মের নামে কত জঘন্য ধরনের যুদ্ধ হয়েছে আর তাতে অসহায় নারী শিশু হতে শুরু করে বহু সরল-সহজ মানুষকে অকাতরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

যেহেতু অসম্পূর্ণটিকে পূর্ণতাদানের কথা কোরান ঘোষণা করছে, সেই হেতু কোন নবী রসূলের বাণীসমূহ বাতিল হতেই পারে না। বাতিল বলে ধুরে নিতে গেলে কোরানের এই ঘোষণার কী অর্থ হতে পারে তা আমাদের জ্ঞানা নেই। যেহেতু মহানবীর আগমনের আগের সকল নবীর বাণীসমূহ বাতিল হয়নি, তাই কোরান বার বার আমাদের সাবধান করে দিয়েছে এই বলে যে, খবরদার নবীদের মধ্যে তোমরা ছোট বড় করতে যেও না। যদি অন্যান্য নবীদের বাতিল বলে কোরানে ঘোষণা করা হত তাহলে এরকম উপদেশটি বার বার কোরানে ঘোষণা দেবার প্রস্তুতি উঠতো না। কোরান বার বার ঘোষণা করছে যে, এমন কোন জাতি নেই যে-জাতির মধ্যে একজন রসূল পাঠানো হয়নি এবং এটুকুই বলে শেষ করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে সেই জাতির নিজের ভাষায় রসূল পাঠানো হয়েছে। আবার এটাও পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যাতে সেই জাতি তার নিজের ভাষায় আল্লাহর নিদর্শন এবং বাণীসমূহ বুঝতে পারে। তাহলে প্রশ্ন আসে, এই পৃথিবীতে কতটি জাতি আছে? তা যত জাতিই থাক না কেন, কিন্তু প্রত্যেক জাতির মাঝে সেই জাতির ভাষায় রসূল তথা অবতার পাঠানো হয়েছে আল্লাহর উপদেশ সমূহ প্রচার এবং গ্রহণের জন্য (সূরা ইব্রাহীম ছয় নম্বর আয়াতটি পড়ুন।)

‘নবীদের মাঝে তোমরা পার্থক্য করতে যেও না’ কোরানের এই শাস্ত বাণী বিশ্বমানবতাকে চমকিয়ে দেয়, বিমোহিত করে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রশ্নে নবী-রসূলদের মাঝে অবশ্যই ছোট বড় থাকবে এবং এটা একান্ত স্বাভাবিক কথা, কিন্তু আমরা যাতে সবাই মিলে মিশে পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে পারি তারই জন্য পার্থক্য না করার উপদেশটি ঘোষণা করা হয়েছে। সূতরাং সব শেষে একটি কথাই বলতে চাই যে, যাহা বাতিল তাহা ফেলে দেওয়া হয় এবং যাহা অপূর্ণ

তাহাকেই পূর্ণতায় আনার উপদেশটি আসে। কারণ অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করা যায়, কিন্তু বাতিলকে ফেলে দিতে হয়। তাই সাইনবোর্ড কাঁধে ঝুলতে থাকলে নিরপেক্ষ দর্শন আশা করা যায় না। বরং আশা করা যায় দলীয় দর্শন যাতে কেবল দলের কাছেই বাহবা পাওয়া যায়। সুতরাং আলোর মত পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ছে যে, মহানবীর আগমনের আগে যে সকল নবী রসুলেরা এসেছেন তাদের বাণীগুলো বাতিল হয়নি বরং সেগুলো ছিল অসম্পূর্ণ, অপূর্ণ। যাহা কোরানের শেষ বাণীটিতে পরিষ্কার বুঝা যায়। যদি ‘নিউজহিরাই’-কে বাতিল বলে ধরে নিতে হয় তাহলে কোরানের শেষ আয়াতটির অর্থের সাথে কোন মিলই থাকছে না। তাহলে দুইটি আয়াতের অর্থ হয় উল্টাপাল্টা তথা দুই রকম এবং সম্পূর্ণ আত্মবিরোধী।

এবার আমরা অন্য আর একটি বিষয় নিয়ে সামান্য গবেষণা করতে চাই। সেই বিষয়টি হল আমাদের মহানবী মোহাম্মদ (দঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যৎ-বাণীসমূহ। মহানবীর প্রকাশিত আগমনের পূর্বে অনেক নবী-রসুল মনি-খাম্বরা হাজার হাজার বছর আগেই বলে গেছেন। মহানবীর আগমনের মহান বাতী বহনকারী অনেক বই-পুস্তক আমরা দেখতে পাই। তাই বেশি আলোচনা না করে কয়েকটি বাণী তুলে ধরতে চাই। তোরাত, জবুর, এবং ইঞ্জিলে মহানবীর আগমনের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া বেদ, পুরাণ, দিঘা নিকায়, জেহু-আবেস্মা এবং দাসাতি নামক পবিত্র গ্রন্থেও মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) আগমনের বাণীগুলো পাওয়া যায়। পবিত্র অথব বেদে ঘোষণা করা হয়েছে ‘আল্লাহর রসুল মোহাম্মদরকং’। এই পবিত্র বাক্যটির অর্থ হল, ‘আল্লাহর রসুল (হযরত) মোহাম্মদ আসবেন।’ আমরা এটা ভাল করেই জানি যে, ভবিষ্যৎ-বাণীসমূহ বলতে এই বুঝায় যে, সেই সকল বাণীগুলো মহানবীর জাহেরী জন্মের কয়েক হাজার বছর আগের। আমরা আমাদের নাতি-পুত্রদের বিয়ে কোথায় হবে তাই বলতে পারি না, অথচ এই বাণীগুলো হাজার হাজার বছর আগের কথা অথচ সব মহানবীর আগমনের কথা বলেছিলেন। যারা এরকম গায়েবের কথা বলতে পারেন তারা নিশ্চয়ই অবতার ছিলেন। অবতার না হলে কেমন করে এরকম কথা বলতে পারেন? তারা কেমন করে জানতে পারলেন যে, মহানবীর আগমন হবে? আর যাই হোক, একদম নিরপেক্ষ হয়ে বলতে গেলে বলতেই হয় যে, তারা অবতার ছিলেন বলেই মহানবীর কথাটি বলতে পেরেছেন। সাধারণ মানুষের কথা বাদই দিলাম। এমন কি অসাধারণ বিদ্বান ব্যক্তিও কি এরকম আগাম ঘোষণা দিতে পেরেছেন? না পারেননি। তাহলে? যারা এরকম আগাম ঘোষণা দিতে পারেন তারা অবতার। অবতার না হলে মহানবীর নামটি পর্যন্ত কেমন করে বলে গেলেন? ইহা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। ভাবিয়ে তোলে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বহু রসুলের আগমন হয়েছে বহু জাতির মাঝে এবং সেই সব জাতির প্রতিটি নিজের ভাষায়। কারণ প্রতিটি জাতির মধ্যে রসুল পাঠানো হয়েছে সেই জাতির নিজস্ব ভাষায়, কোরানের এই মহান বাণী কতই না সুন্দর এবং সার্বজনীন। অথচ আমরা সকল ধর্মের অনুসারীরাই মেনে নিতে পারছি না। একে অপরকে কেমন করে উপহাসের পাত্র বানানো যায় সেই গবেষণায় মেনে থাকি। নিজেকে বড় মনে করে নিজের দলের

কাছে বাহবা কড়াই। মহানবীর আগমনের পূর্বে যে সকল নবী এবং রসুলদের বাণী এবং উপদেশগুলো বাতিল হয়ে গেছে বলে এক শ্রেণীর আরবি-জানা পণ্ডিতেরা প্রচার করে গেছেন এবং এখনো প্রচার করছেন তারা যে কত বড় মারাত্মক কোরান-বিরোধী কথা বলছে এবং কোরানের বিশ্বজনীন ভাবমূর্তিটিকে নোংরা গলির মধ্যে ধরে রাখছে। এই আরবি ভাষা জানা পণ্ডিতেরা কোরানের শব্দগুলোর বিকৃত মনগড়া বানোয়াট শাব্দিক অর্থ আবিষ্কার করে। সাধারণ মানুষগুলোর তলিয়ে দেখার সুযোগ নেই। তাই মনের বিরুদ্ধে গেলেও কোরানের কথা যখন এরকম বলা হয়েছে তাই মনে নিতে বাধ্য করে। এ যে কত বড় ধোকাবাজি! এ ধোকাবাজি চোর-ডাকাত আর পকেটমারের ধোকাবাজির চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ এরা মানুষের মাঝে তৈরি করে মারামারি কাটাকাটির ছেয়াল। অথচ ধরার উপায় থাকে না। একবার চিন্তা করুন তো, এরা কত বড় চিকন বাটপার। এই সব চিকন বাটপারেরা সনুতি (?) লেবাস পড়ে কথায় কথায় এরা ভুণ্ড ওরা ভুণ্ড বলে চিংকার করে এবং ইসলামের আগে একটি বিশেষণ লাগিয়ে দিয়ে বলে যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হচ্ছে। আগে শুনতাম যে, সমাজতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য কিছু বাটপার নেতা বৈজ্ঞানিক শব্দটি লাগিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে যাদুর খেলা দেখাতো। অবশ্য সাধারণ মানুষ পরে বুঝতে পারতো যে, এই বাটপার নেতারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে বড় বড় ঘোড়ার ডিম্ব উপহার দিয়েছেন। পূর্ব ইউরোপের সাধারণ মানুষেরা এতদিন পর ঘোড়ার ডিম্বের কেরামতি বুঝতে পেরে মুইড়া পিছা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই এরকম আরবি-জানা পণ্ডিতদের এহেন বৈজ্ঞানিক (?) মারকা ইসলামের সুরত দেখে দেখে যখন ঘোড়ার ডিম্বখানা দেখিতে পাইবে সেইদিন তাহাদের হাল হকিকত কেমন হইবে-আগামীর ইতিহাসই বলে দেবে। কোরানের নামে আল্লাহ ও রসুলের নামে এত উল্টাপাল্টা কথা লিখা হয়েছে যে, এখন আসলটাকেই মনে হবে নকল। কোরান তফসির করার সময় ধারাবাহিকভাবে তলে ধরবো বলে আশা করি, কিন্তু এই রুইতে দুই একটি কোরানের আয়াতের ব্যাখ্যা তলে ধরলাম এজন্য যে, কত গোজামিল, উল্টাপাল্টা কথা বলা হয়েছে এবং আরো দুঃখের বিষয় হল, এই মিথ্যা কথাগুলোর বই দিয়ে সমস্ত বাজুর ছেয়ে গেছে। সুতরাং একজন মানুষ ইচ্ছা থাকলেও ইসলামের সত্য-সুন্দর রূপটি কেমন করে জানবে? তাছাড়া অনুবাদ করতে দিলে অনুবাদক হবহ অনুবাদ না করে নিজের মনগড়া কথাগুলো সেই মহাপুরুষের নামে চালিয়ে দেয়। ইমাম গাজালি সাহেবের বিখ্যাত একটি বিরাট গ্রন্থের অনুবাদ করতে গিয়ে জনৈক আরবি-জানা পণ্ডিত কী কলেংকারাটাই না করলেন। এখন আপনিই বলুন, সাধারণ মানুষ কী করে বুঝতে পারবে যে, অনুবাদের মধ্যেও করা হয়েছে জঘন্য বাটপারি। এরকমভাবে ম্যাণ্ডলানা জালাল উদ্দিন রুমা, ফরিদউদ্দিন আত্তারের বিখ্যাত বইগুলোর বাটপারি অনুবাদ যে করা হয়েছে তা কি সাধারণ পাঠক ধরতে পারবে? না, পারবে না।

কোরানের সার্বজনীন আস্থান

এবার আমরা কোরানের চল্লিশ নম্বর সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতের একটি অংশের বিশদ ব্যাখ্যা ও হবহ অনুবাদটি তুলে ধরতে চাই। এই আয়াতটি এতই স্পষ্ট ভাষায় সোজাসুজি বলা হয়েছে যে রীতিমত অবাক হতে হয়। আয়াতটির প্রথম অংশটি হল, ‘ওয়া কালা রাব্বুকুম উদউনি আসতাজ্জিব লাকুম।’ এই অংশটি হবহ বাংলায় অনুবাদ করছি, ওয়া=এবং, কালা=বলিল, রাব্বুকুম=রব, প্রতিপালক (আল্লাহ অথবা অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, যদিও আরো অনেক শব্দ ব্যবহার করার মত ছিল), কুম= তোমাদের (বহুবচন), উদউনি শব্দটির মূল শব্দটি হল দাউন এবং দাউনের অর্থ হল ডাকা (ডাকল)। তা হলে উদউনি যদিও একটি শব্দ, কিন্তু মিশ্র। তাই এই মিশ্র শব্দটির হবহ অর্থ হল, আম্মাকে ডাক। আসতাজ্জিব শব্দটির মূলটি হল আল এজাবা এবং এই আল এজাবার হবহ অর্থ হল, ডাকে সাড়া দেওয়া, উত্তর দেওয়া। তাহলে আসতাজ্জিব শব্দটিও একটি মিশ্র শব্দ যার হবহ অর্থ হল, আমি সাড়া দিব। লাকুম শব্দটিও একটি মিশ্র শব্দ যার হবহ অর্থ হল, তোমাদের জন্য। তাহলে পুরো বাক্যটিকে হবহ সাজানো হল, ‘এবং তোমাদের রব বলেন, আম্মাকে ডাকো আমি সাড়া দেব, তোমাদের জন্য।’ এখন বাংলা ভাষায় আমরা যেভাবে বলি সেইভাবে সাজানো হল, ‘এবং তোমাদের রব বলেন, আম্মাকে ডাকো, তোমাদের জন্য আমি ডাকে সাড়া দেব।’

কোরানের এই বাক্যটির মধ্যে প্রথমেই একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝা যায়। সেই বিষয়টি হল, রবরূপী আল্লাহ যে ডাকতে বলেছেন সেই ডাকটি কি বিশেষ কোন

শ্রেণী বা দলের নাম বলা হয়েছে? না, একদম হয়নি। রবরূপী আল্লাহর এই ডাক দেবার আস্থান কোন আমানু, মুসলমানের নাম উল্লেখ করা হয়নি। মোমিন তথা কোন সিদ্ধ পুরুষ তথা কামেল বুজুর্গের ডাকার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ মোমিন তখনই বলা হয় যখন উপদেশের সীমা পার হয়ে যায়। তাহলে কাদেরকে ডাকার জন্য রব আস্থান করছেন? পৃথিবীর সব মানুষ এবং জিনদেরকে সম্মানভাবে ডাকতে বলেছেন। এখানে জিনদের কথা ইচ্ছা করেই বাদ দিলাম। তাহলে রইল কেবল পৃথিবীতে বাস করা যত মানুষ সবার জন্য। নারী এবং পুরুষ সবার জন্য। এই ডাকের মধ্যে কোন শর্ত নেই, কোন দল নেই, নেই কোন নির্দিষ্ট দেশের মানুষের কথা। সবাইকে ডাকতে বলছেন প্রতিপালক। যে যত খারাপই হোক না কেন, সে সাদা, কালো, বেঁটে, লম্বা তা যে ধরনেরই হোক না কেন, সবাইকে বলা হয়েছে যে, ‘আমাকে ডাকো।’ তাহলে এই ডাকা সবার জন্য বলে প্রমাণিত হল। আবার সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হল যে, যারা আল্লাহকে পায়নি কেবল তাদেরকেই ডাকতে বলা হয়েছে। কারণ না পেলেই ডাকের প্রশ্ন আসে। অভাবে শিশুও চিৎকার দেয়। বিরহে মিলনের ঢেউ জাগে। সুতরাং ডাকার প্রশ্ন তখনই উঠে যখন দূরে থাকে। কাছে থাকলে কেউ ডাকে না। বন্ধু দূরে থাকলেই ডাক দেওয়া হয় এবং কাছে পেলেই ডাকা খেমে যায় প্রকৃতির নিয়মে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ বলছেন, ডাকো, যে পর্যন্ত ঈমানের পূর্ণতা না আসে। অর্থাৎ পূর্ণতার পর আর ডাক নেই। ডাক আপন নিয়মেই যাবে খেমে। তারপরও যদি ডাকে, অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণতা অর্জনের পরেও ডাকে সেই ডাক অপরকে শিক্ষা দেবার জন্য ডাকা। নিজের জন্য নয়। কারণ শিশুকে শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষককে বার বার শিশুর পাঠটি পড়তে হয় এবং এই বার বার পড়াটা নিজের জন্য নয় বরং শিশুকে

শিক্ষা দেবার জন্য। যেমন মহানবী সাহাবাদের শিক্ষা দেবার জন্য ইবাদত করতেন এবং এই ইবাদত কখনোই মহানবীর নিজের জন্য নয় বরং সাহাবাদের শিক্ষার জন্য। কারণ মহানবী ইবাদতের উর্ধ্বে, যদিও তাঁকে ইবাদত করতে হয়েছে। শিক্ষককে যেমন শিশুর বইটি পড়তে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই পড়া শিশুর জন্য, কারণ শিক্ষক এরকম পড়ার বহু উর্ধ্বে। কোরানে বলা হয়েছে, ‘ওয়াবুদু রাব্বাকা হাঠা ইয়াতিলকাল ইয়াকিন’ অর্থাৎ ‘ইবাদত কর সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত না তোমার রবের একিন অর্জিত হয়।’ তাছাড়া এরফান ছাড়া আরেফদের জন্য আর কোন এবাদত নেই। আরেফের (সিদ্ধ পুরুষ) যে কোন কাজ-কর্ম দেখতে এবাদত মনে হলেও আসলে উহা হল তৌহিদ। আর তৌহিদ অর্জন করার পর এবাদত করা কুফুরী। (নাউজুবিল্লাহ মিনহা)। আর এজন্যই গাউসুল আজম বলেন, ‘মান আরাদাল ইবাদাতা বাদাল বিসালি ফাহয়া কাফিরুন।’ অর্থাৎ আবেদদের এবাদতের লক্ষ্য হল অজানা খোদা। এজন্য আবেদদের নাম জাহেল বা মূর্খ। (সিররে হক জামে নূর, প্রথম খণ্ডের সাতাশ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

আরো লক্ষ করুন, এই ডাকার মধ্যে কোন প্রকার শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়নি। এভাবে ডাকতে হবে, ওভাবে ডাকলে চলবে না, ডাকার মত করে ডাক দিতে হবে, অন্তর দিয়ে ডাকতে হবে, লোক দেখানো ডাকলে চলবে না, কেঁদে কেঁদে ডাকতে হবে, হাঁ হতাশ করে ডাকতে হবে, বিলাপের চিৎকারে ডাকতে হবে, হাসতে হাসতে ডাকতে হবে, নেচে নেচে ডাকতে হবে, গানের সুরে ডাকতে হবে, ওস্তাদি গানের উঠা-নামা সুরে ডাকতে হবে, দিল খোলাসা করে ডাকতে হবে, নির্জনে বসে ডাকতে হবে, সংসার ছেড়ে দিয়ে ডাকতে হবে, সংসারে থেকে ডাকতে

হবে, শরীরে দামি পোশাক পড়ে ডাকতে হবে, গরিবি পোশাকে ডাকতে হবে, স্যুট-প্যান্ট-টাই পরে ডাকতে হবে, লম্বা জুতা পরে মাথায় পাগড়ি লাগিয়ে ডাকতে হবে, উলঙ্গ হয়ে ডাকতে হবে, শরীরে ছাই মেখে ডাকতে হবে, এবং আরো ইত্যাদি রকমে ডাকার কোন প্রশ্নই, কোন শর্তই কোরান দেয়নি। কেবলমাত্র সোজা বলা হয়েছে, ‘আম্মাকে ডাকো।’ ‘আম্মাকে ডাকো’-এর মাঝে কোন প্রকার ধানাই পানাইর নাম-গন্ধটুকুও নেই। তারপর কোরান কী বলছে? কোরান বলছে, ‘আম্মি সাড়া দিব’, ‘আম্মি ডাকের জবাব দেব’ এখানেও লক্ষ করুন, এই ডাকের জবাব দেবার মাঝেও বিন্দুমাত্র শর্ত দেওয়া হয়নি। একদম সোজাসুজি বলা হয়েছে, একদম ক্লিয়ারকাট ঘোষণা করা হয়েছে যে, ‘আম্মাকে ডাকো (উদইনি) আম্মি ডাকের জবাব দেব (আসতাজেব)।’

আধুনিক বিজ্ঞান আজও বলতে পারে না যে, বিজ্ঞানের উন্নতির কতটুকু উঁচুতে এগিয়ে এলাম। বিজ্ঞান কি প্রথম সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে আছে না কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে, না অনেক উঁচুতে উঠে গেছে সে কথা পৃথিবীর যে কোন বৈজ্ঞানিককে প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় ‘জানি না কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।’ পক্ষান্তরে যিনি সবকিছুর মালিক, যিনি সর্বশক্তিমান আহাদরূপী আল্লাহ, সেই সর্বজ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল শক্তির মালিকের কথা হল, এই সেই কোরানুল হাকিম তথা বিজ্ঞানময় কোরান। আর কী আমাদের ভাগ্যের অসহায় পরিহাস, সেই বিজ্ঞানময় কোরানের অনুবাদ ও তফসির লিখার কত বড় ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছি আম্মি অধম জাহান্নামীর, একটা মামুলী বিদ্বান নামের কলঙ্ক। আমাদের মত অনেকেই কোরানের নামে বহু উল্টাপাল্টা কথা না জেনে না বুঝে সবকিছু বুঝে গেছি মার্কাস ডেমাক আর অহঙ্কার

নিষে তফসির করে গেছি। ভাবখানা যেন, আল্লাহর কোরানের ব্যাখ্যা, আরবি ভাষা, ব্যাকরণ সবই তো জানি। কিন্তু একবারও ভেবে দেখলাম না যে, ভাষা আর ব্যাকরণে বিশারদ হলেই কবি-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। জগদীশ বাবু আর ঈশ্বরচন্দ্র হওয়া যায় ভাষা আর ব্যাকরণ শিখে, কিন্তু কবি রবীন্দ্রাকুর আর নজরুল ইসলাম হওয়া যায় না। কবি বানানো যায় না বরং হয়ে যায় এবং এটাই কবির তকদির। প্রেম করা যায় না, বরং হয়ে যায়। বৃষ্টি বানানো যায় না, বরং হয়ে যায়। আর যদি বৃষ্টি বানানোই যেত তাহলে মরুভূমির দেশ থাকতো না। কৃত্রিম বৃষ্টি কৃত্রিম প্রেমের মত। টেকে না। বিনিময়ের প্রশ্ন ও শর্ত যেখানে থাকে সেখানে প্রেম-ভালবাসটাও শর্তের গণ্ডিতে বাধ্য। যে কোন সময় ভেঙে যেতে পারে। নিঃশর্তই প্রেমের ধর্ম। প্রেম কোন শর্তও যেমন মানে না তেমনি ভয়ও করে না। কারণ ভয় দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রেম জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়। তাই প্রেম এবং ভয় দুটো সম্পূর্ণ আত্মবিরোধী। যদিও প্রথমত তা মনে হয় না, কিন্তু চূড়ান্ত পর্বে এই আত্মবিরোধের আসল রূপখানা ধরা পড়বেই। তাই প্রেমের মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে এতেআদ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করার মনোভাব। যেখানে এতেআদ থাকবে না সেখানেই দেখা দেবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় আর হাজারটা উল্টাপাল্টা প্রশ্ন। তাই হজরত জিগার মুরাদাবাদী বলেন, ‘সেজদা ভি কারে শেকোয়া ভি কারে বান্দে কা ইয়ে দাসতুর নাহি হ্যায়।’ অর্থাৎ এটা প্রেমের ধর্ম নয় যে, অভিযোগও করব আবার ভালোও বাসব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন, প্রেমিকেরা কাজ করে যায়, কর্মফল কী হবে তা দেখে না।

ভগবান গৌতম বুদ্ধদেব বলেন, মোহই দুঃখ এবং মুক্তিই প্রেম।

যিশুখ্রিস্ট বলেন, প্রেমের পিতাকে পাওয়া যায়।

এখন আমরা কোরানের কথা, ‘আমাকে ডাকো, আমি ডাকের জবাব দেব’-এর উপর একটু গবেষণা চালাই। গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই দেখতে পাই যে, আল্লাহ আমার ডাকের উত্তর দেবেন। তাহলে বুঝা গেল যে, তিনি ডাক দিলে চুপ করে থাকেন না, ডাক দিলে মরার পর জবাব পাবে বলেননি, ডাক দিলে কেয়ামতের দিন জবাব দেবার কথাও বলেননি বরং সোজাসুজি বলেছেন যে, আমি ডাক দিলেই জবাব দেব। এই কথাটিতে ইহাই প্রমাণিত হল যে, এই পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় (মারা গেলে কি ডাকা যায়?) ডাক দিলেই তিনি (রব) জবাব দেন। বাকির কথা বলা হয়নি। কোন একদিন জবাব পাবে, এরকম কথাও বলা হয়নি। তাহলে প্রশ্ন আসে আমরা কি আল্লাহকে ডাকি না? যদি বলি যে, আমরা অবশ্যই আল্লাহকে ডাকি। তাহলে, ডাকের জবাব পাই না কেন? কারণ আল্লাহ পাক তো মিথ্যা কথা বলতেই পারেন না। তা হলে কি আমাদের ডাকার মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি আছে? দোষ-ত্রুটি থাকলে তো কোরানে শর্ত লাগিয়ে দিত, কিন্তু এরকম কোন প্রকার শর্তই আমাদের ডাকার মধ্যে লাগানো হয়নি বরং সোজাসুজি বলেছেন, আমাকে ডাকো আমি ডাকের জবাব দেব। আমরা যে এত ডাকাডাকি করি বা করছি কিন্তু জবাবের তো কোন নমুনাই পাই না। তার কারণ কী? আসল বিষয়টা তবে কী হবে? এর মধ্যে এমন কী রহস্য লুকিয়ে আছে যে সেই রহস্যটা ধরতে পারছি না? গোঁজামিলের উত্তর তো বহু রকমে দেওয়া যায়, কিন্তু আসল বিষয়টা তাহলে কী হবে? এই ডাকের জবাব না পাবার আসল গলদটা তাহলে কোথায়? ডাকার মত ডাকতে হবে? ডাকার মত করে না ডাকলে শুনবে কেমন

করে? তাই অন্তর দিয়ে, দিল খোলাসা করে কি ডাক দিতে হবে? ধরে নিলাম, ডাকার মত করে ডাক না দিলে আল্লাহ জবাব দেবেন না। কিন্তু প্রশ্ন আসে, এরকম বাক্যটি তো এখানে বলা হয়নি। যদি এরকম বাক্যটি বলা হত তাহলে আরবি ভাষায় কোরানে এইভাবে থাকতো, কিন্তু এভাবে তো কোরান বলেনি অথবা এরকম বাক্যটি তো এখানে পাওয়া যায় না। সেই বাক্যটি কী রকম হত আরবি ভাষায়? অন্তর দিয়ে ডাকার তথা ডাকার মত ডাক দেবার কথাটি যদি কোরানের এই বাক্যে থাকতো তাহলে আরবি ভাষাটি হত, ‘উদউনি বেখালেসে কালবেকুম’। কিন্তু এরকম বাক্যটি না বলে একদম সোজাসুজি বলছে, ‘উদউনি আসতাজেব লাকুম’। অর্থাৎ ‘আমাকে ডাকো আমি ডাকে সাড়া দেব’। এখানে অন্তর দিয়ে অথবা হৃদয় দিয়ে ডাকার আরবি ভাষাটি হল, ‘বেখালেসে কালবেকুম’। কিন্তু এরকম শব্দ তো এখানে ব্যবহার করা হয়নি। এরকম শব্দ তো কোরানের এই আয়াতে পাওয়া যায় না। তাহলে এরকম কথা যা কোরান বলেনি অথচ এরকমই অর্থ করে মানুষকে চিকন ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে এবং এই রকম হাজারো চিকন ধোঁকাগুলো সরল মনের

(মুসলমান, আমানুদেহেরকে বলা হয়নি এবং সবাইকে বলা হয়েছে তাই মানুষ শব্দটি ব্যবহার করা হল) মানুষদের কয়জনের মগজে ধরা পড়বে? কয়জন এরকম কথার আসল এবং গোপন কথাটি ধরতে পারবে? না পারারই কথা এবং এই না পারার দরুনই কোরানের নামে অনেক বানোয়াট কথা, মনগড়া অনুবাদ এবং উল্টা-পাল্টা ব্যাখ্যার বস্তা সুন্দর সুন্দর ঝকঝকে মলাটে বাঁধাই করে খাদ্যের নামে অখাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। উপরের ঢাকনাটি, উপরের খোলসটির নকশা

নমুনা এমনই চমৎকার, এমনই আকর্ষণীয় যে, না জানি এর ভেতর কত অমৃত রাখা হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্ভুর পরিহাস! পাঠক আর অমৃতের নাম গন্ধটুকুও খুঁজে পায় না, যা পায় তা হল বিষ, ভয়ঙ্কর বিষ, সংকীর্ণতার বিষ, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের কত ডিজাইনের দেয়াল বানাবার কৌশল নামক বিষে ভরপুর। যার করুণ পরিণতিতে পৃথিবীর উনচল্লিশটি (?) মুসলিম দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্নে কত পেছনে পড়ে আছি। যার করুণ পরিণতিতে আমরা অপরের মতামতের মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, বরং হিংসার আগুনে জ্বলে উঠি। গণতন্ত্র, অন্যের ধর্মের উপর কোন প্রকার জোর জবরদস্তি নেই, তোমার ধর্ম তোমার কাছে আর আমার ধর্ম আমার কাছে, এরকম পরমতসহিষ্ণুতার বাণীগুলো আমরা ভুলতে বসেছি। এর জন্য আমাদের মনগড়া কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাটি অনেকটা দায়ী বলে মনে করতে চাই।

আসল কথায় আসা যাক। কোরান ‘বেখালেসে কালবেকুম’ বলেনি যে আমরা এর ব্যাখ্যা করে বলবো, ডাকার মত ডাকতে হবে। বরং কোরান বলছে, আমাকে ডাকো, আমি ডাকের জবাব দেব। এখন কোরানের এই আয়াতের আসল এবং গোপন রহস্যটি তুলে ধরতে চাই। তবে এর আগে এটাও জানিয়ে দিলাম যে, আমার দেওয়া ব্যাখ্যাই যে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা—এরকম কথা ধৃষ্টতারই সাক্ষ্য। আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাই লিখে যাচ্ছি। এখানে প্রতিপালক রবরুপী আল্লাহ বলছেন যে, আমাকে ডাকো। ডাক করে লক্ষ্য করুন, কেবল আমাকেই ডাকতে বলা হয়েছে। ডাক দেবার শর্তটি কেবল আমি। কেবলমাত্র আমি ডাক দিলেই ডাকের জবাব পাবো—এটাই আল্লাহর শর্ত। এখন সবচাইতে বড় প্রশ্নটি হল যে, আমি কি কেবলই আমি একা? না, কখনোই আমি একা নই। এর কারণ? কারণ

আমি একজন্যই একা নই যেহেতু আমার সঙ্গে আর একজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাকে আমার সঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে চোখে দেখা যায় না। তাই আমাকে দেখতে একা মনে হয়। আসলে আমি একা নই। দুইজন মিলে আমি। একজন অদৃশ্য। বাতাসের মত। দেখা যায় না কিন্তু বুঝা যায়। ঠিক সেরকম একজনকে দেখা না গেলেও সে যে আমার সঙ্গে বহাল তব্বিতে বিরাজ করছে তাতে বিদ্বদ্ভ্রম সন্দেহ নেই। আবার আমি যে কেবলই একা নই একথা আমার কথাও নয় এবং কোন মহাপণ্ডিতের বচনও নয়। আমি যে দুইজন তথা আমার মধ্যে যে আর একজন চুপি চুপি আরামসে বাস করছে সেই কথাটি স্বয়ং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ পাক কোরানেই বারবার ঘোষণা করেছেন। হাঁ, এই কথা কোরানের কথা, একটু চিন্তা করলেই ধরা যায়। যেমন কোরান বলছে, ‘মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস’ অর্থাৎ ‘খান্নাসের ওয়াসওয়াসা (ধোঁকাবাজি) হতে আশ্রয় চাওয়া’। খান্নাস কী এবং কে? খান্নাস কোথায় বাস করে? শয়তান মানবদেহের পরতে পরতে যখন

বাস করে, সেই শয়তানের রূপটিকে বলা হয় খান্নাস। এমন সূক্ষ্মভাবে এই খান্নাস আমার সঙ্গে বাস করছে যে, মনে হবে, আমি তো একাই আছি। আসলে আমি মোটেও একা নই। আমি ও খান্নাস উভয়ে একত্রে বাস করছি তাই খালি চোখে একা মনে হলেও আসলে আমার মাঝে দুইজন বাস করছি। তাই তো কোরান এরকম খান্নাস নামক শয়তানের ধোঁকাবাজি হতে আশ্রয় চাইতে বলছে। আমার সঙ্গে যদি নাই থাকতো তাহলে এরকম উপদেশ কেন দেওয়া হল? সুতরাং কোরান কেবলমাত্র আমাকেই ডাকতে বলছে, অথচ আমি একা নই, বরং খান্নাস আমার সঙ্গে বাস করছে এবং এ খান্নাসের দরুন আমি দেখতে একা মনে হলেও আসলে

একা নই বরং দুইজন। এখন আমার মধ্যে একজন খান্নাস বাস করছে, তাই কী করে একা ডাক দেই। একা ডাকাটি কেমন করে সম্ভব যদি আমারই সঙ্গে খান্নাস থাকে। যদি আমার সঙ্গে বাস করা এই খান্নাসটিকে বেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে পারি তবে তো একা হব। আর যেদিন সত্যিই একা হতে পারবো সেদিন আর ডাক দিতেও হয় না এবং জবাব নিজের ভেতরই পাওয়া যায়। কেবল জবাবই কি পাওয়া যায়? না কি আরো কিছুর পরিচয় পাওয়া যায়? মুরগীর ডিম্বের মধ্যেই বাচ্চাটি লুকিয়ে আছে। যারা ডিম্বের মধ্যে বাচ্চা থাকে না বলে বিশ্বাস করে তারা ভয়ঙ্কর, তাদের থেকে সাবধান। কারণ তারা ডিম্ব আলাদা এবং বাচ্চা আলাদা করে ফেলে এবং এই আলাদা করাটাই হল শেরেক। তারা জানে না যে, ডিম্বের মধ্যেই বাচ্চাটি লুকিয়ে আছে এবং ডিম্বের একটি বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির সমন্বয় হলেই ডিম্বটি ফেটে যায় এবং ফেটে যাওয়া ডিম্ব হতে বেরিয়ে পড়ে একটি বাচ্চা। সুতরাং ডিম্ব এবং বাচ্চার সহ-অবস্থান। এই সহ-অবস্থানটিকে যারা অস্বীকার করে বাচ্চাটি আকাশ হতে নেমে আসবে বলে বিশ্বাস করে তাদের কথা এবং আকিদা যত সুন্দর ও ভদ্রই হোক না কেন আসলে তারা মোটেও তৌহিদবাদী নয়। যদিও তারা বড় গলায় নিজেদেরকে তৌহিদবাদী বলে ঘোষণা করে এবং পরক্লেণে যারা ডিম্বের মধ্যেই বাচ্চাটি আছে বলে বিশ্বাস করছে তাদের উপর শেরেক বেদাতের মিথ্যা বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বড় একটা কাজ করলাম বলে ভাবছে। এরকম চরিত্রের তৌহিদবাদীদের থেকে বড় বড় অলী-দরবেশ মুনি-খাম্বিরা বার বার সাবধান থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। কোরান এরকম তৌহিদবাদীদের নামাজ-রোজাকে লোক দেখানো নামাজ-রোজা বলে বার বার

সাবধান করে দিয়েছে (এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমার লিখিত কোরান তফসিরে পাবেন।)

আবার বলছি, কোরান আমাকে একা ডাকতে বলছে। দুইজন হলে চলবে না। কারণ আমাকে হতে হবে একা। সবাই ভাবছি যে, আমি তো একা। চিন্তার ভুল। ভুলটি এতই চিকন যে আমাদের চোখে ধরা পড়তে চায় না। বারবার প্রশ্ন জাগে, আমি তো একাই। দুইজন হলাম কী করে? আমার সঙ্গে চুপ করে লুকিয়ে আছে আরেকজন। তার নাম কী? তার নাম খান্নাস। এই খান্নাস আমার সঙ্গে চুপ করে লুকিয়ে থাকার দরুনই কোরানকে বারবার উপদেশ দিতে হয়েছে। সাবধান করে দিয়েছে। সেই উপদেশ আর সাবধান বাণীটি হল, খান্নাসের ধোঁকাবাজি হতে আশ্রয় চাও। বিস্মিল্লাহ পড়ার আগেও শয়তানের ধোঁকাবাজি হতে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। সেই শয়তানটি কেমন? রাজিম তথা পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান। সেই পাথর আবার কী? সংসার জীবনে চলার পথে বারবার ভুল করার পাথর। অদৃশ্য পাথর, কিন্তু আঘাত বড়ই নির্মম। সংসার জীবনে অনেক হেঁচট খেতে হয়। হেঁচট খেতে খেতে মনটি ক্লান্তবিক্লান্ত হতে থাকে। এত আঘাত আসছে অথচ বুঝতে পারছি না। তাই প্রথমেই উপদেশ-পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তানের ধোঁকাবাজি হতে আশ্রয় চাও। আবার প্রশ্ন আসতে পারে যে, আশ্রয় চাইলেই কি শয়তান হতে মুক্ত হওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তর পরে দেওয়া হবে। তবে এর উত্তরটা অনেকেই ধরতে পারেন। এই পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান, এই কুমন্ত্রণা দেওয়া খান্নাস কোথায় বাস করে? সে কি আলাদা বাস করে? না। এই খান্নাস আমারই সঙ্গে বাস করছে। আমার মধ্যে এমনভাবে মিলে মিশে আছে

যে আমি এই খান্নাসকে আলাদা করে ভাবতেই পারছি না। মনেই হয় না যে আমার সঙ্গে আর একজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনেই হয় না যে, আসলে আমি একা নই, আমি এবং খান্নাস একত্রে আছি। একের ভেতর দুই। অনেকটা উপমার ছলে বলছি, টু ইন ওয়ান, টেপরেকর্ডারের সঙ্গে রেডিওকে ঢুকিয়ে দেওয়া। মনে হয় কেবলই টেপ। রেডিওর কথা মনে হয় না। তোমনি মনে হয়, আমি তো একাই। সত্যিই যদি আমি একা হতাম তাহলে আমার ডাকের জবাব আল্লাহ দেবেন। আল্লাহর কথা, আল্লাহর ঘোষণা, আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করলে আল্লাহকেই অস্বীকার করা হয়। সুতরাং আল্লাহকে ডাকো, ডাকের জবাব পাবে। কিন্তু ডাকতে হবে একা। দুইজন হলে চলবে না। তুমি ডাকো। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে খান্নাস আছে তাকে সাথে নিয়ে ডাকলে জবাব পাবে না। কারণ খান্নাস থাকলে তুমি একা নও। দুইজন হয়ে আছ। তাই হও একা। তাড়াও খান্নাসকে বাঁটা ঘেঁরে তাড়িয়ে দাও তোমার মধ্যে চুপটি করে যে খান্নাসটি বসে আছে। তারপর ডাকো। জবাব সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। এই জবাব দেবার জন্য তোমার রব তোমাকে বার বার বলছেন।

কোরানের একটি বাক্য নয়, কোরানের একটি সুরাও নয় বরং ত্রিশ পুরা তথা সমস্ত কোরানটাই তোমাকে এই একটি মাত্র আদেশ দিয়েছে, আর সেই একটি মাত্র আদেশটিই হল, খান্নাস, শয়তান, ইবলিসের সহ অবস্থান হতে আলাদা হয়ে যাও। অথচ তুমি একাও হতে পারছ না আর ডাকের জবাবও পাও না। তখন অনেক বুদ্ধিমান প্রশ্ন, সংশয় আর জিজ্ঞাসার আলো-আধারের ফাদে পড়ে দিশেহারা হও। এই দিশেহারাদের সিদ্ধান্তগুলো হয় গোজামিলের বস্তু। ভুল অঙ্কের ভুল ফল। ইচ্ছাগুলো অনেক সময় কিছুটা আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও আসল বিষয়টি ধরতে না পারার দরুন এরকম হয়ে যায়। তাই খান্নাসকে তাড়িয়ে দাও। ঝোঁটিয়ে বিদায় করে দাও। তুমি একা হও। কেবলই একা হও। তা হলে? ডাকো রবকে, জবাব অবশ্যই পাবে। যতদিন পর্যন্ত খান্নাসকে তাড়াতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত ডেকে যেতে পারবে, কিন্তু জবাবটি পাবে না। কারণ খান্নাস তোমার সঙ্গে যতদিন বাস

করবে ততদিন তুমি শেরেক করছো না, বরং শেরেকে ডবে আছে। ডবে আছে মনের অজ্ঞান। ধরতেই পারছো না যে শেরেকে ডবে আছে। কী অপূর্ব বিজ্ঞানময় সূক্ষ্ম কৌশলের পুকুরে সাতার কাটছো, অথচ বুঝতেই পারছো না। তাই তো আল্লাহ পাকের আর এক নাম হাকিম।

এইরকমভাবে গবেষণার পর গবেষণা চালিয়ে যাবার স্বাধীনতার উপর হাত বাড়ালেই তৈরি হয় মোটা দেয়াল। জ্ঞান আর গবেষণার আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে পারে না। হোক না সেই গবেষণার ফলটি ভাল, তাই বলে কি ইমাম তাইমিয়ার মত গবেষককে মেরে ফেলতে হবে? ইমাম তাইমিয়া হযরত ওমর (রাঃ) এবং মাওলা আলীর অনেক ভাল ধরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। (মুসলিম মনীষা)। অথচ এই যুগে বিজ্ঞানী মরিস বকাইলি তার রচিত বিখ্যাত বইবেল, কোরান ও বিজ্ঞান নামক বইটিতে হযরত ইমাম বুখারী (রাঃ) এবং হযরত ইমাম মোসলেম (রাঃ)-এর সংগ্রহ করা বুখারী শরিফ এবং মুসলিম শরিফের চিকিৎসা বিষয়ের হাদিসগুলোকে একদম বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কোন টি শব্দটি পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করার সাহস পায় না। সাহেব যখন বলেছে মাদির ডাই, তাই খশির আর সান্না নাই। এরকম বেফাস কথা সাহেবদের জন্য জায়েজ আছে কিন্তু তোমার জন্য হারাম। তেতো বড়ি গিলে খেতে হয়েছে। কোরান এমনই বিজ্ঞানময় পবিত্র গ্রন্থ যে এর প্রতি আয়াতের গবেষণা করা হোক। 'আম্মাকে ডাকো, আমি ডাকের জবাব দেব', ভাষাটি কত সহজ কিন্তু এর সূক্ষ্মতা কত দূর গভীরে ঢুকে আছে একবার ভেবে দেখুন তো।

খান্নাসটির আসল পরিচয় কী? আসল পরিচয় হল সে হল জিন। তাহলে দেখতে পাই যে, জিন প্রতিটি মানুষের মাঝেই লুকিয়ে আছে। জিন বিহনে যে মানুষটি তাঁর নাম সাহেব। তাই তো কোরান মহানবীকে সম্পূর্ণরূপে জিনমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। যারা এই জিনকে নিজেদের থেকে আলাদা করে ফেলতে পেরেছেন তারাই মহানবীর বংশধর। রক্তের নয় বরং নূরের। এখানে পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতিকে যেমন বলা হয়েছে যে, আম্মাকে ডাকো, আমি ডাকের জবাব দেব, ঠিক তেমনি পৃথিবীর যে কোন মানুষ জিন হতে আলাদা হতে পেরেছেন, মুক্ত হতে পেরেছেন, তিনি মহানবীর বংশধর তথা নূরের পুত্র। এটাই কোরানের আইন। এই কোরানের আইন বদলায় না। সুন্নাতাল্লাহে লা তাবদীলা এই নীতিনির্ধারণের বেলায় এবং এই

কোরানের নীতিনির্ধারণটি হল একদম সার্বজনীন, পুরোটাই বিশ্বজনীন। কারণ ইহা প্রয়োগপদ্ধতি নয়। কারণ প্রয়োগপদ্ধতি একেক পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে ভিন্নরূপ হতেও পারে, কিন্তু জিনকে নিজের থেকে আলাদা করার আদেশটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কোরান যে নিজেই ঘোষণা করেছে যে, ইহা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য। আমার মনে হয় কোরানের এই একটি আয়াতের ব্যাখ্যাতেই পরিষ্কার হয়ে সবার কাছে ধরা পড়বে এবং সংকীর্ণতার অঙ্ককারটি যারা মনের অজান্তে তৈরি করতে চায় তাদের ভুলগুলো শুধরিয়ে নেবে। সেই সঙ্গে মহানবীর হাদিস তুলে দিয়ে এখানেই শেষ করতে চাই। মহানবী একবার সাহাবাদেরকে বলেছিলেন যে, প্রতিটি মানুষের সাথে একটি করে শয়তান দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে একজন সাহাবা মহানবীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাহলে কি আপনার সাথেও একটি শয়তান? মহানবী বলেছিলেন যে, হ্যাঁ, তাঁর সাথেও একটি শয়তান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই শয়তানকে মুসলমান বানিয়ে ফেলেছেন।

এই সেই পুরাতন খান্নাস, যে খান্নাসটি আমারই সঙ্গে মিলে মিশে আছে। এই মিশে থাকা খান্নাসটিকে তাড়াতে পারলে, অথবা খান্নাসটিকে মুসলমান বানাতে পারলেই আল্লাহ পাক ডাকের জবাব দেবেন। এই ডাকের জবাব দেবার জন্যই খান্নাসের অপকারিতা হতে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য সমগ্র কোরানই হল একটি জুলন্ত উপদেশ। এর অনেক অনেক আগে বাইবেলে প্রভু যিশু, জবুরে প্রভু দাউদ, তাঁওরাতে প্রভু মুসা, গীতাতে প্রভু কৃষ্ণ, ত্রিপিটকে প্রভু খোতম বুদ্ধের মত লক্ষ লক্ষ রাক্ষাসেওয়াজরূপি প্রভুরা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শৈলীতে মূল্যবান একটি উপদেশ দিয়েছেন। অনেক অনেক উপদেশ, যেন মনে হয় উপদেশের বিশ্বকোষ। আসলেই কি তাই? না-না, মাত্র একটি উপদেশের উপর বহু ভাষার অলঙ্কার পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক অলঙ্কারের চমক আর ঠমকে বিবেক খুঁই হারিয়ে ফেলে, আর এর ফলে বয়ে আনে অনেক অনেক মতবাদের বড় বড় সাইনবোর্ড। তাই সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান, ইবাদত-বন্দেগির একমাত্র মূল বিষয়টিই হল, খান্নাস নামের শয়তান হতে মুক্ত হও। মুক্ত হতে পারলেই আপনাকে চিনতে পারবে, জানতে

পারবে, বুঝতে পারবে। আর আপনাকে চিনতে পারলেই রবকে চেনা হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 'রবকে চেনা হয়' বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, আপনাকে চিনতে পারলেই রবকে চেনা হয়ে গেছে। কী অপূর্ব, কী বিজ্ঞানময় আপনাকে চেনার বিজ্ঞানধর্মী ফর্মুলা। এই ফর্মুলার মহান দাতার নাম নবীসম্মাদ, মহানবী, মহাপ্রভু, সিরাজুল মুনীর, রাহমাতুললিল আলামিন, ইমামে কেবলাতাইনে আবুল কাশেম মোহাম্মদ মোস্তফা আলীইহিস সালাতুসসালাম।

আমার খলিফাদের নামের তালিকা

সর্বনিম্ন একটানা চারমাস যারা মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করেছেন তাদের প্রত্যেকের নামের আগে শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা এবং নামের শেষে আল-সুরেশ্বরী লকব দেওয়া হয়েছে।

১. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা আজম শাহ আল সুরেশ্বরী, পিতা-ইউসুফ আলী, গোয়াল চান্দাট বাসস্ত্যাভ, ফরিদপুর। ২. সৈয়দ তারিক আল-সুরেশ্বরী, পিতা-সৈয়দ ওয়ারিস হোসেন, ১৭১, উত্তর বাড়ি, ঢাকা। ৩. ময়েজ উদ্দিন মো. আবদুর রাশিদ আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবদুল হাই, পশ্চিম ঘাটলা, বড়বাড়ি, বেগমগঞ্জ নোয়াখালী। ৪. ডা. মোহাম্মদ আলী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ফজর আলী মোলা, নিজুরী, বড়াইত, বাজার, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৫. আনোয়ার মন্সি আল-সুরেশ্বরী, ডোলাবহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ। ৬. শাহ আলম মোলা রিপন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবু হোসেন মোলা, সদর রোড, জয়পুরহাট। ৭. খোরশেদ আলম আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ইয়াকুব আলী খান, রাজামেহার, দেবিদুর, কুমিল্লা। ৮. কারী মো. সুলতান ওয়াদুদ আল-সুরেশ্বরী, পিতা-শেবের উদ্দিন চিশতী, মেজবালাম, পবা, রাজশাহী। ৯. আলী হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-হাফেজ আলী বেপারী, পূর্ব লালপুর, কালিপুর বাজার, মতলব, চাঁদপুর। ১০. আবদুল গণি মাতকর আল-সুরেশ্বরী, পিতা-গণি মাতকর, খামারপাড়া, বান্দবদৌলতপুর, মাদারাপুর। ১১. আবদুল কুদ্দুস কারী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আজমত আলী, মোয়াইল, বোনকুয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ১২. ইয়াকুব আলী শেখ, আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ইউনুস আলী শেখ, বগাজান, বড়াইত, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ১৩. জাহিদুল ইসলাম আল-সুরেশ্বরী, পিতা-নুরুল ইসলাম, মেজবালাম, পবা, রাজশাহী। ১৪. মওলানা কাজি আফহার উদ্দিন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-কাজি বদরউদ্দিন, চাকলিয়া, নগরকুড়া, সাভার, ঢাকা। ১৫. ইসহাক মিয়া আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবদুর রাজ্জাক মিয়া, বাউশিয়া, বাউশিয়া

রাজার, গজারিয়া মসিগঞ্জ। ১৬. মণ্ডলান্ন আবুল বাশার আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবদুল কুদ্দুস, কুলিয়ার ভাস্কী, নরীগঞ্জ, হাবিগঞ্জ। ১৭. মমতাজ মাস্টার আল-সুরেশ্বরী, পিতা-হাজি মিয়াজান আলী, দুগাচী, দরগাতলা হাট, জয়পুরহাট। ১৮. আবুল হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-শনিজাম উদ্দিন মোল্লা, বিদ্যাপাড়া, রামেশ্বরপুর, বগুড়া। ১৯. নজরুল ইসলাম আল-সুরেশ্বরী, ভোলবিহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ। ২০. আতাউর রহমান আল-সুরেশ্বরী, পিতা-সৈফুদ্দীন প্রামাণিক, রুলবাজার, মান্দা, নওগা। ২১. মোমেনজ খাতুন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ওয়াহিদ উদ্দিন মণ্ডল, দুগাচী, দরগাতলা, জয়পুরহাট।

যারা চলিশ দিনের মোরাকাবার ধ্যানসাধনা কমপক্ষে তিন বার করেছেন তাদের নামের সাথে সাধক লকব দেওয়া হয়েছে।

১. সাধক নজিবুর রহমান আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ইছা মাস্টার, কাহাল বাজার, কাহাল, বগুড়া। ২. সাধক আলাউদ্দিন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আসমান খান, বারাইডিকরা, দ্বিতারা, মানিকগঞ্জ। ৩. সাধক মণ্ডলান্ন আনোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মাফেল হাওলাদার, চরপুরসুজ, বাগাদ, মোকশেদপুর, গোপালগঞ্জ। ৪. সাধক বসির উদ্দিন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবদুল লতিফ মিয়া, বারঘরটোলা, জিনাজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৫. সাধক গোলাম মোস্তফা আল-সুরেশ্বরী, পিতা-নুরুন্নিয়া, হাজি পাড়া, উত্তর বাড়ী, ঢাকা। ৬. তাপসী উল্লেখ কলসুম আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মণ্ডলান্ন আবদুল মতিন, লক্ষ্মিনারায়ণপুর, সেতভাস্কী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। ৭. তাপসী উম্মিনা মাকিম আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মোতাহার, খানাপাড়া, চারঘাট, রাজশাহী। ৮. সাধক আনোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবুল কাশেম, দুগাপুর, ছালিয়াকান্দা, তিতাস, কামিলা। ৯. সাধক আজিজুর রহমান আল-সুরেশ্বরী, পিতা-নামা মিয়া খন্দকার, আরিফ খা, বাসুদেবপুর, রহমতপুর, গাইবান্ধা। ১০. সাধক জাহিরুল হক আল-সুরেশ্বরী, পিতা-খোদাবক্স মধা, ভিতরবাগ, জিউপাড়া, বাঘাতিপাড়া, নাটোর। ১১. সাধক ডা. শাহজাহান মধা আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আনোয়ার হোসেন, দিঘিরপাড়া, পাতরাইল রাজার, ভাস্কী ফরিদপুর। ১২. সাধক বাকেরুল মুজাহিদ সেলিম আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মুসলেম উদ্দিন, কাশিপুর, পাট পুকুরিয়া, তিতাস, কামিলা। ১৩. সাধক মেহেদী মাসুদ আল-সুরেশ্বরী, পিতা-বারী কবির, চ-১৩৯, গোপীপাড়া, উত্তর বাড়ী, গুলশান, ঢাকা-১২১২। ১৪. সাধক অধ্যাপক আ. হালিম মিয়া আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মোজাফফর হোসেন মিয়া, ডেওয়ানারা, সিরাজগঞ্জ।

যারা চলিশ দিনের একটি অথবা দুইটি মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করেছেন তাদের নামের তালিকা। সংখ্যার আইনে নাম দেওয়া হল, গভীরতার দৃষ্টিতে নয়।

১. বিগ চান, পিতা-আকর আলী, ডালয়ারচর, নোয়াকান্দা, প্রলাশ, নরসিংদী। ২. আমজাদ হোসেন, পিতা-আবদুল মম্মাদ খান সারেং, মোদ্রী মণ্ডল, লোহাজং, মসিগঞ্জ। ৩. আবদুল আজিজ, পিতা-গেজুদ্দিন, কাজিটোলা, হাটপাড়া, মানিকগঞ্জ। ৪. মোঃ এমদাদুল হক, পিতা-মকবুল হোসেন, নাথরাজ পাড়া,

চাপাই নবাবগঞ্জ। ৫. আবদুস সালাম, পিতা-বেলায়েত পণ্ডিত, দক্ষিণ
 কল্যাণকলস, কোটখালী, গুলটিপা, পটুয়াখালী। ৬. মো. টাল মিয়া,
 পিতা-আমজুদ খা, মুসিকান্দ, পুরা, মুসিগঞ্জ। ৭. ডা. এ. বি. এম.
 শাহাবুদ্দিন, পিতা-গোলাম মোস্তফা, টাউন কালিকাপুর, পটুয়াখালী। ৮. মার
 জামাল, পিতা-আহিউদ্দিন মার, আশকরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৯.
 বাউ আলী, পিতা-হামিদ আলী রাজ, আগুরুরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী।
 ১০. মাসুদ রানা বোজ, পিতা-মাহুদার উদ্দিন মণ্ডল, সবজ নগর, জয়পুরহাট।
 ১১. আজিজুল হক, পিতা-মফিজউদ্দিন শেখ, বালিয়াডাঙ্গা, সারদা, চারঘাট,
 রাজশাহী। ১২. মকিবুল হক, পিতা-রহিমউদ্দিন খুলফা, খানাপাড়া, সারদা,
 চারঘাট, রাজশাহী। ১৩. ডা. মো. সোহেল রানা, পিতা-আবদুল মালেক, খেল
 সিন্দুর, ওয়ারসী পাইকপাড়া, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। ১৪. বলবল আহমদ, পিতা-
 শাহজাহান, ধানয়া, শিবপুর, নরসিংদী। ১৫. রওশন আরা বেগম, পিতা-আকাস
 আলী, স্বাধীনতা সরণী বোর্ড, উত্তর বাড়ি, ঢাকা। ১৬. ডা. আবদুল হামিদ,
 পিতা-দুদ মিয়া, ভাওয়ার ভিটি, আকুলাহপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১৭. মো.
 আশরাফুল হক, পিতা-আবদুস ছেয়াদ, বাগপুর, বড়বিল, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ১৮.
 নাজির আহমদ শামস, পিতা-নাজমুল হক, জয়পুরহাট। ১৯. শামস মিয়া
 সোহাগ, পিতা-হেলাল উদ্দিন আহমদ, নৌকাঘাটা, শিবপুর, নরসিংদী। ২০.
 হারিছ মোহাম্মদ, পিতা-ওয়াহেদ আলী, বেকুয়াইল, বাঙ্গান কচুরী, কিশোরগঞ্জ।
 ২১. ডা. আকরাম হোসেন, পিতা-আবদুল হাই, কারার চর, দক্ষিণ, খান,
 শিবপুর, নরসিংদী। ২২. অনোয়ারা বেগম, পিতা-খালিলুর রহমান, মোগাছি,
 বানেশ্বর, চারঘাট, রাজশাহী। ২৩. আবদুন নূর হোসেন শাহীন, পিতা-মো.
 জুকার হোসেন, নাথরাজপাড়া, চাপাই নবাবগঞ্জ। ২৪. জান্নাতুল ফেরদৌস,
 পিতা-জয়েন উদ্দিন, পীরজপুর, পরানপুরহাট, চারঘাট, রাজশাহী। ২৫. ইসরাত
 জাহান পুরভান, পিতা-আবুল কাশেম, গুনজারাতা কোতয়ালী, দিনাজপুর। ২৬.
 মো. জামিরুল ইসলাম, পিতা-মো. ইসসার আলী, বিকড়া, হাটবিকড়া,
 চারঘাট, রাজশাহী। ২৭. মো. শাহেদ মোল্লা, পিতা-আবদুল বাসেত মোল্লা,
 মলিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ২৮. জয়নাল আবেদীন,
 পিতা-মুল মিয়া মস্তান, সোলাকান্দা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ২৯. শাহাদাত আলী
 ভূইয়া, পিতা-মিনুত আলী ভূইয়া, মলিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী।
 ৩০. আবদুল মতিন, পিতা-শহীদুল ইসলাম, হুদল, ধানয়াঘাট, ফরিদপুর,
 পাবনা। ৩১. মো. ওয়াজেদ আলী শাহ, পিতা-ওসিম উদ্দিন শাহ, তোলিপাড়া,
 নন্দনপুর, পটুয়া, রাজশাহী। ৩২. মো. আলতাফ আলী, পিতা-আরফান
 আকর, কান্দানুরা, ফলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। ৩৩. আমিনুল্লাহ হক,
 পিতা-ইব্রাহিম আলী, ফকিরপুর দরগা শরিফ, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। ৩৪. হাদিস
 আলী, পিতা-আবুল হোসেন মুসি, মুসেফের চর, শাহাসপুর, শিবপুর, নরসিংদী।
 ৩৫. মো. তাজুল ইসলাম, পিতা-মো. হোসেন আলী, নোয়াকান্দা পলাশ,
 নরসিংদী। ৩৬. ডা. আরমান মাহমুদ, পিতা-লালমিয়া, নোয়াকান্দা, পলাশ,
 নরসিংদী। ৩৭. মো. হাকিম-অর-রাশিদ, পিতা-হোসেন আলী, নোয়াকান্দা,
 পলাশ, নরসিংদী। ৩৮. রফিকুল ইসলাম, পিতা-হাজী মো. নকুল ইসলাম,
 মোগাছি, বানেশ্বর, চারঘাট, রাজশাহী। ৩৯. মো. হুমায়ুন কবির, পিতা-শফিজ
 উদ্দিন, বাড়লিয়া, চালআলিয়া, গুলটিপা, পটুয়াখালী। ৪০. নাজমা পারভান,
 পিতা-আবদুস সাত্তার মিয়া, লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর। ৪১. সোফিয়া রুমা,

পিতা-আতাউর রহমান, ছাতড়া, নিয়ামতপুর, নওগাঁ। ৪২. মাসদুর রহমান, পিতা-মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্ব নেপালপুর, আমাইড, পত্নীতলা, নওগাঁ। ৪৩. আবদুল খালেক, পিতা-মো. ইসহাক সাদার, চরপুকুরিয়া, উদয়কাঠি, পিরোজপুর।

যারা মোরাকাবার ধ্যানসাধনার ধারে কাছেও নাই অথচ খেলাফত পেয়েছে এবার তাদের নামের তালিকা দেওয়া হল।

১. সিরাজুল ইসলাম সরকার, পিতা-সাইজুদ্দিন সরকার, টেকরিয়াগ্রাডা, সিরাজদি খান, মামিগঞ্জ। ২. আতাউর রহমান রফিক, পিতা-হাজি আমির উদ্দিন ভূইয়া (মধু), মোকাঘাটা, শিবপুর, নরসিংদী। ৩. ডা. ইউসুফ ইসাইন, পিতা-চাঁদ মিয়া, পলাত, মতলব, সেনবাগ, নোয়াখালী। ৪. সৈয়দ ফরহাদ নাসিম (সজল), পিতা-মত মনসুর আলী, দেওয়ান, কানুপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট। ৫. ফয়েজ আহমদ, পিতা-মহিউদ্দিন আহমেদ, মঙ্গিকান্দা, আলু-আলানি বাজার, দোহার, ঢাকা। ৬. মোসাম্মাৎ মাজ, পিতা-হরমজ আলী হাজিগাড়া, উত্তর বাড়ি, ঢাকা। ৭. ইমাম হোসেন দেওয়ান, পিতা-শাহেদ আলী দেওয়ান, চরজজিরা, মুলফংগজ, নড়িয়া, শরিয়তপুর। ৮. সালেহা খাতুন, পিতা-চাঁদ মিয়া মিয়াজী, কালিপুর বাজার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর। ৯. আহসান হাবিব, পিতা-আবদুর রহিম, ডি. সি. সি. ১৮০ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাও, ঢাকা-১২১৫। ১০. আবদুল মান্নান, পিতা-হাজি আকরাম আলী, উত্তর জয়গাড়া, জয়গাড়া, দোহার, ঢাকা। ১১. মোহাম্মদ আলী মাস্টার, পিতা-আলিম উদ্দিন, পিরজপুর, পূর্বানপুর হাট, চুরঘাট, রাজশাহী। ১২. অধ্যাপক সিরাজ উদ্দিন ভূইয়া, পিতা-মাকিজ উদ্দিন ভূইয়া, চরসুজাপুর, কুরারচর, শিবপুর, নরসিংদী। ১৩. নেওয়াজ আলী, পিতা-খৈয়ামত আলী দক্ষিণ ডাওয়ার ভিটি, আব্দুলহুদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১৪. মোহসিন আলী খান, পিতা-জমাদার খান, বাগমারী, গগনপুর, পত্নীতলা, নওগাঁ। ১৫. ফাতেমা আক্তার লিজা, পিতা-জাকির হোসেন, শালগারিয়া, পাবনা। ১৬. রাফিউল করিম, পিতা-আবদুর রশিদ মোল্লা, ৪৮০/১ পশ্চিম শ্যাওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা। ১৭. মো. আব তাহের, পিতা-মো. আব্বাস আলী, ধন্যপুর, বড়ইতলা, লক্ষাপুর। ১৮. মো. সাদেকুদ্দিন সরকার, পিতা-ইয়ার মোহাম্মদ সরকার, ৪৫০ পশ্চিম ভুরুলিয়া, ডয়েট, গাজীপুর, ১৭০০। ১৯. মো. কামাল হোসেন, পিতা-বদিউল আলম, ধন্যপুর, বড়ইতলা, লক্ষাপুর। ২০. সিরাজুল ইসলাম, পিতা-আবদুল গনি মিয়া, হরিপুর, চাটমোহর, পাবনা। ২১. মো. সজাত আলী খান, পিতা-সবদের আলী খান, দক্ষিণ শিমুলিয়া, মেঘলা, দোহার, ঢাকা। ২২. মশতাক আহমদ, পিতা-শাহাদাত আলী ভূইয়া, মালিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ২৩. শফিকুল ইসলাম, পিতা-রফিকুল ইসলাম, মালিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ২৪. মো. আমোয়ার হোসেন ঢালী, পিতা-শফিউদ্দিন ঢালী, কালিপুর, কালিপুর বাজার, মতলব, চাঁদপুর। ২৫. শামসুদ্দিন ফকির, পিতা-রমজান ফকির, হুই লক্ষাপুর, ফরিদপুর। ২৬. মো. জামাল উদ্দিন, পিতা-আবুল হোসেন, বিটি জগারচর, বাজারামপুর, বি. বাড়িয়া। ২৭. তাবেকুজ্জামান, পিতা-লংকর রহমান, মালিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ২৮. আয়েশা আক্তার, পিতা-আবদুল জলিল, চুনকুটিয়া

মহরীপাড়া, শুভাচ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ২৯. বত্ৰা, পিতা-ওয়াদদ ডুইয়া, ফতেপুর, বাজারামপুর, মিরপুর, বি. বাঁড়িয়া। ৩০. রাজিবিল হক, পিতা-শাহাদাত আলী ডুইয়া, মালিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ৩১. এনামুল হক সজীব, পিতা-মোজাম্মেল হক মিলন, শাহপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ৩২. শাহিদা বেগম, পিতা-বাদের আলী দেওয়ান, কুমারি গাতি, নওগা। ৩৩. সানজিদা আক্তার শোভা, পিতা-শাহাদাত আলী ডুইয়া, মালিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ৩৪. রিয়া আকতার জবা, পিতা-হাবিবুর রহমান, আতখোলা, গোটিয়া, কাটিয়াদ, কিশোরগঞ্জ। ৩৫. আবদুল মালেক সিকদার, পিতা-মোস্তাজ উদ্দিন সিকদার, খেলসিকদার, ওয়াসী পাইকপাড়া, মিজাপুর, টাঙ্গাইল। ৩৬. মোসাম্মৎ বাহেলা বেগম, পিতা-রতন আলী সিকদার, খেলসিকদার, ওয়াসী পাইকপাড়া, মিজাপুর, টাঙ্গাইল। ৩৭. মো. জাম্মাল হোসেন, পিতা-রমিজ উদ্দিন, রঘনাথপুর, ছালিয়াকান্দি, তিতাস, কামিলা। ৩৮. খাদিজা বেগম, পিতা-আবদুল হাই, হাজিপুর, বেগমগঞ্জ, মোয়াখালী। ৩৯. ফজল হক, পিতা-মহজদীন মুধা, জানাবাঘ, বাগবা, শানিগর, মামুগঞ্জ। ৪০. দুলাল মিয়া, পিতা-করম আলী প্রধান, নোকাঘাটা, গিরপুর, নরসিংদী। ৪১. এস. এম. আক্তারজামান, পিতা-এস. এস. গিয়াস উদ্দিন, ছিটকা, বাড়ফল, পটয়াখালী। ৪২. মো. আহম্মদ আলী, পিতা-হাজী মো. একিন আলী, স্বাধীনতা সরণী রোড, উত্তর বাড়ডা, ঢাকা। ৪৩. শেখ কামাল আহমেদ খোকন, পিতা-মো. আবদুল খালেক, সাতপাই, নেত্রকোনা। ৪৪. মাহতাব উদ্দিন মো. আবদুল কদুস, পিতা-আবদুল হাই, বড় বাড়ি, ঘাটলা, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। ৪৫. মহসিন, পিতা-মসী আবদুল জলিল, বাড়িকান্দি, গজড়া, মতলব, চাটপুর। ৪৬. এস. এম. শামসুল আরেফীন সুনন, পিতা-মো. শামসুল আলম, সি-২৫, বুক-ই, জাকির হোসেন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ৪৭. মো. নুরুল ইসলাম, পিতা-শামসুল হক, বেংচড়া, বাহাদুরপুর, শিবচর, মাদারীপুর। ৪৮. নওয়াব আলী, পিতা-লতিফ খা, কাটাখালী বয়েরা, আক্তার মামিক, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ। ৪৯. মোসাম্মৎ মাহফুজা মজর, পিতা-মো. মোকাররম হোসেন খান, গালাপটি, বগুড়া সদর, বগুড়া। ৫০. মো. দেলোয়ার হোসেন, পিতা-আবদুল হামিদ মাতব্বর, কহারদাহ, কালিকা বাড়ির হাট, মোডেলগঞ্জ, বাগেরহাট, ফুলনা। ৫১. শাহিদুল চন্দ্র সন্ন্যাস, পিতা-ঈশ্বর অভিন্য সন্ন্যাস, কুমলাপুর, ফরিদপুর। ৫২. রত্ন শন হোসেন বাপ্পী, পিতা-আবদুর রাজ্জাক, লক্ষ্মাকিঞ্জ, বাড়ি নং-৫ রোড নং-৩৬, গুলশান-২ ঢাকা-১২১২। ৫৩. দেলোয়ার হোসেন, পিতা-নওফেল সরকার, আশকরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৫৪. তাজুল ইসলাম কাজল, পিতা-রজুলুর রহমান, বাকশামুল, বাড়ি নং-৩, কামিলা। ৫৫. মো. জুলহাস, পিতা-রিয়াজ উদ্দিন, শিলসুল, ডোজেশ্বর, নড়িয়া, শরিয়তপুর। ৫৬. ফজলুল করিম, পিতা-শাহাদাত আলী, আমালিয়া, ডেমডা, ঢাকা। ৫৭. মো. আলিউদ্দিন, পিতা-মো. শুকুর আলী, আশকরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৫৮. ডা. মো. তারেকুল ইসলাম তারেক, পিতা-নুরুল ইসলাম ভাওড়া, মিজাপুর, টাঙ্গাইল। ৫৯. মো. লংফর রহমান বাবু, পিতা-মো. আলী ডুইয়া, গোপালপুর শট রোড, ফরিদপুর। ৬০. আলোক কুমার সরকার, পিতা-ঈশ্বর মাধব চন্দ্র সরকার, গুলশানপুর, ফরিদপুর। ৬১. নাছির উদ্দিন, পিতা-ফিরোজ বেপারী, গোকুলচর, জিনাজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৬২. সোহরাব হোসেন,

পিতা-মো. রহিম উদ্দিন, কডাতলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা। ৬৩. মো. মজিবর রহমান, পিতা-মো. ফালু মিয়া, বকুডাকপাড়া, জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৬৪. মো. শাহ আলম, পিতা-মো. আদম আলী মারি, ভাগনা, জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৬৫. জিন্মতুল আলম, পিতা-খবির উদ্দিন, গোড় শাহরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৬৬. রাজিয়া সুলতানা, পিতা-কেরামত আলী মণ্ডল, জয়পুর পাড়া, বগুড়া। ৬৭. এখলাস খান, পিতা-রহমত খান, কালীপুর, মতলব, চাঁদপুর। ৬৮. দেলারা বেগম, পিতা-চান মিয়া সিকুদার, কুড়িপাইকা, হাতিরাদিয়া, মনোহরদি, নরসিংদী। ৬৯. মো. শাহিদুল ইসলাম খন্দকার, পিতা-আবদুল জব্বার খন্দকার, সুন্দরবন, রামডাং ঘাট, দিনাজপুর। ৭০. মো. শরিফুল ইসলাম বাবল, পিতা-মাকিজ উদ্দিন প্রামাণিক মজারপুর, চারঘাট, রাজশাহী। ৭১. মো. আজমল আলী, পিতা-মো. করিম খালিকা, খানাপাড়া, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৭২. মো. আবদুল কুদ্দুস, পিতা-মো. হারুনুর রশিদ, আশকরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৭৩. মো. সুমন পিতা-আবদুল জলিল, গোস্বরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৭৪. শী জহন টুট সরকার, পিতা-বেনটা টুট সরকার, আমলা কাঠাল, আফতাবগঞ্জ, মদাবগঞ্জ, দিনাজপুর। ৭৫. মো. বাবল ইসলাম, পিতা-আজহার আলী, আশকরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৭৬. মো. শাহিদুল ইসলাম, পিতা-জব্বার হোসেন, গোস্বরপুর, সারদা চারঘাট, রাজশাহী। ৭৭. সৈয়দ হাজ্জল ইসলাম উজ্জল, পিতা-সৈয়দ জোয়াবেল হোসেন, ডোপলাহাটি, কবাইল, মিজাপুর, টাঙ্গাইল। ৭৮. আশরাফ আলী, পিতা-হাসান আলী, বালিয়াডাঙ্গা, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৭৯. হালেমা বেগম, পিতা-বেলায়েৎ হোসেন, বনডাকপাড়া, জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৮০. রাবেয়া খাতুন, পিতা-মোহসীন উদ্দিন, কডাতলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, বাড্ডা, ঢাকা। ৮১. শামেলী রশিদ স্বাধীন, পিতা-আবদুর রশিদ, ৬৪/এ হাজী ওসমান গনি রোড, ঢাকা-১০০০। ৮২. আবদুস সোবহান, পিতা-আবদুল আজিজ, গয়েশপুর, প্রাবনা। ৮৩. আবু তাহের খান, পিতা-মুজারত আলী খান, ইটালী, ডেওয়ানারা, সিরাজগঞ্জ। ৮৪. আসমুদ্দীন কাজী, পিতা-গনি কাজী, নোয়াকান্দা, পলশ, নরসিংদী। ৮৫. সৈয়দ মহব্বত হোসেন শাহীন, পিতা-সৈয়দ জয়নাল আবেদীন, ডোপলাহাটি, কবাইল, মিজাপুর, টাঙ্গাইল। ৮৬. মো. ইবাহিম, পিতা-চান মিয়া, পলতি, মতহন, সেনবাগ, জোয়াখালী। ৮৭. মো. হারিসুল হক, পিতা-আবদুর রহিম, বিয়াজ নগর, শিবপুর, নরসিংদী। ৮৮. মো. ইনসান আলী, পিতা-মো. বিয়াজ উদ্দিন আলী, জিনজিরা বাগ, জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৮৯. নজরুল ইসলাম নজর, পিতা-হাজী আফসার উদ্দিন, ১২ কাজী আরদুর রত্ন রোড, বোকনপুর, ঢাকা। ৯০. আলেকজা উদ্দিন মেশান, পিতা-হাকিম উদ্দিন মেশান, আশাবপুর, শিবপুর, নরসিংদী। ৯১. আবুল কাশেম ভূঞা, পিতা-আনিস ভূঞা, বাঙ্গানুদি, বড়কান্দা, শিবপুর, নরসিংদী। ৯২. এমদাদুর রহমান দাদল সরকার, পিতা-তৈয়ব আলী সরকার, বালিয়াডাঙ্গা, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৯৩. হাবিবুর রহমান, পিতা-তাহের উদ্দিন সরকার, মজারপুর, চারঘাট, রাজশাহী। ৯৪. মাসুদ রানা, পিতা-নরুল হক, আশকরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ৯৫. খায়রুল আরেফিন, পিতা-এরফান আলী, বহলর, ব্রিশাল, ময়মনসিংহ। ৯৬. জিয়াউল করিম তালুকদার, পিতা-আবদুল করিম তালুকদার, দোসতিনা, ভারুকাটি,

নারায়ণপুর, উজিরপুর, বরিশাল। ৯৭. মো. শাহাবুদ্দিন মিয়া, পিতা-মো. আলী মিয়া, আগলা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। ৯৮. মো. ফরিদ শেখ, পিতা-আজাহার শেখ, নাথরাজপাড়া, চাপাই নবাবগঞ্জ। ৯৯. মকবুল মুফতী, পিতা-ফুলম মুফতী, ধারাতগা, বাবুদ দেলতপুর, রাজের, মাদারাপুর। ১০০. তোতা মিয়া, পিতা-কদম আলী হাজি, পূর্বকান্দী, কালোপাইড়া, আতাউ হাজার, নারায়ণগঞ্জ। ১০১. হাসনুর হক মালিক, পিতা-ইব্রাহিম মালিক, ওয়াসি, ওয়াসি পাইকপাড়া, মিজাপুর, চাপাইল। ১০২. আবদুল কাদের কণ্ডিয়াল, পিতা-পটু বেপারী, মিয়া পাড়া, পশ্চিম দেওভোগ, কালিবাড়ি, ফতুলহা, নারায়ণগঞ্জ। ১০৩. রহিমা, পিতা-বলু মিয়া, লক্ষ্মণ খোলা, গোবিন্দপুর, হোমনা, কামিলা। ১০৪. মো. মোস্তাফা খান, আরমান, পিতা-রমজান বেপারী, কালিগঞ্জ, গুডাচ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১০৫. খন্দকার মো. আলতাফ, পিতা-খন্দকার মনসুর আলী, ছ ৬৮/১ উত্তর বাড়ী, গুলশান, ঢাকা-১২১২। ১০৬. মো. মজনু মিয়া, পিতা-মোয়াজ আলী, বাজার, মোয়াদিয়া, শিবপুর, নরসিংদী। ১০৭. মানসুরা আক্তার, পিতা-খবির উদ্দিন, পূর্বের গাও, শিবপুর, নরসিংদী। ১০৮. মাহফুজুর রহমান, পিতা-মাজল হক, নগর বেকার পাড়া, শিবপুর, নরসিংদী। ১০৯. মো. শামসুজ্জামান, পিতা-সমশের আলী, মোয়ারপাড়া, বকশীগঞ্জ, জামালপুর। ১১০. মিজা নূর-এ আলম তারা, পিতা-মিজা চন্দ্র মিয়া, নিউ ইসলামপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ। ১১১. মোফাজ্জল হোসেন তোফাজ্জল, পিতা-হুদাদার খান, দক্ষিণ শিমুলিয়া, মেঘলা, দোহার, ঢাকা। ১১২. মো. সফর আলী, পিতা-সৈয়দ আলী, ধমাইরচর, মোয়াকান্দা, পলাশ, নরসিংদী। ১১৩. আবদুল কদুহ, পিতা-ফুলমিয়া, আবদুলপুর, আখাউড়া চেক পোস্ট, বি. বাড়িয়া। ১১৪. নাসিমা আক্তার, পিতা-আফাজ উদ্দিন মোল্লা, পাটগাও, আতাউ হাজার, নারায়ণগঞ্জ। ১১৫. সাজ্জাদ হোসাইন নবাব, পিতা-সালাই উদ্দিন, সলাবাদ, মনোহরদা, নরসিংদী। ১১৬. আবদুল জব্বার হাওলাদার, পিতা-বেলায়েত হোসেন হাওলাদার, দক্ষিণ কল্যাণ কলস, কোটখালী, গলাচিপা, প্রত্যাখালী। ১১৭. নূর আলম, পিতা-মাসুদার নজর আহমেদ, ৩৩/১৫ পলবা, মিরপুর, ঢাকা। ১১৮. মো. আবদুল মাজিদ, পিতা-নায়েব আলী, দক্ষিণ ধক, চন্দ্রনগর, বেলাব, নরসিংদী। ১১৯. মো. শামস মোল্লা, পিতা-শামসুল হক মোল্লা, আমলাব, বেলাব, নরসিংদী। ১২০. এস. এম. আহম্মদ খান, পিতা-মো. হাসান আলী মাতব্বর, ভাওয়ার ভিটি, আবদুল্লাহপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১২১. জিন্নাত চৌধুরী, পিতা-আ. রহিম চৌধুরী, ভাওয়ার ভিটি, আবদুল্লাহপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১২২. নাসিমা আক্তার, পিতা-রজুব আলী মোল্লা, মগুরচর, কুহিতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১২৩. মোসলেম উদ্দিন সরকার, পিতা-আমির আলী সরকার, ভূগবানপুর, বাসুদেবপুর, পলাশ বাড়ী, গাইবান্ধা। ১২৪. সোলায়মান হোসাইন, পিতা-মমসুর আলী, ধন্যপুর, বড়হতলা, লক্ষ্মাপুর। ১২৫. সালেমা সুলতানা (কন), পিতা-আতাউর রহমান ভূইয়া, নৌকাঘাটা, শিবপুর, নরসিংদী। ১২৬. সোহানা রুমা, পিতা-আতাউর রহমান ভূইয়া, নৌকাঘাটা, শিবপুর, নরসিংদী। ১২৭. আনোয়ারা বেগম, পিতা-আবদুর রহিম, বিরাজনগর, নৌকাঘাটা শিবপুর, নরসিংদী। ১২৮. শামসুল পাকুল, পিতা-কুস্তম আলী, ধানয়া, শিবপুর, নরসিংদী। ১২৯. ফজলুল হক, পিতা-আবদুল গনি, সন্ধাপ, চিকন্দী, পালং, শরীয়তপুর। ১৩০. নূরুল সাদর,

পিতা-অহিজ উদ্দিন সর্দার, মুন্সুরপুর, চারঘাট, রাজশাহী। ১৩১. শেখ
 বোকন, পিতা-শ্রেখ আমার উদ্দিন, গুহলক্ষাপুর, ফরিদপুর। ১৩২. কমল
 মালো, পিতা-কাঠিক চন্দ্র মালো, গুহলক্ষাপুর, ফরিদপুর। ১৩৩. শাহ আলম
 ভূয়া, পিতা-সুকান্দার আলী ভূয়া, কালাপুর, মতলব, চাঁদপুর। ১৩৪.
 মেয়ার উদ্দিন, পিতা-মোসাহেফ উদ্দিন, বড় দেওয়ান পাড়া, সরাইল, বি.
 বাড়িয়া। ১৩৫. আবদুল করিম, পিতা-আবদুল বারেক, সোলাকান্দা,
 কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১৩৬. শিরিন আক্তার, পিতা-হাজী হাবিবুল্লাহ, দিলরোড,
 মগবাজার, ঢাকা। ১৩৭. রজুর মিয়া, পিতা-এতিম হাফেজ, জিনজিরা বাগ,
 কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১৩৮. ফরিদা ইয়াসমিন, স্বামী-আবুল হোসেন, সুরেশ্বর,
 নড়িয়া, শরিয়তপুর। ১৩৯. মো. শফিকুল ইসলাম, পিতা-আইয়ুব আলী,
 স্বাধীনতা সরণা রোড, উত্তর বাড়ি, ঢাকা। ১৪০. তফিজ উদ্দিন, পিতা-চান
 মিয়া খান, বেহার কান্দি, পুরাবাজার, মুন্সিগঞ্জ। ১৪১. করুনা বেগম,
 পিতা-বেইজ উদ্দিন হাওলাদার, মুসিকান্দি পুরাবাজার, মুন্সিগঞ্জ। ১৪২. নীহার
 বঙ্গন মণ্ডল, পিতা-সুবোধ চন্দ্র মণ্ডল, গোহারা ছাতন, হাকিমপুর, দিনাজপুর।
 ১৪৩. শামসুল ইসলাম, পিতা-আবুল আলী মিয়া, খাসমহল, বালুর চর,
 সিরাজদি খান, মুন্সিগঞ্জ। ১৪৪. কাজল মিয়া, পিতা-সুন্দর আলী, ছোটাবন্দ,
 শিবপুর, নরসিংদী। ১৪৫. আফাজ উদ্দিন, পিতা-সমুসের আলী, ছোটাবন্দ,
 শিবপুর, নরসিংদী। ১৪৬. নিলুফার ইয়াসমিন, পিতা-আবদুল মালেক,
 খেলসিক্কা, ওয়ারসা পাইকপাড়া, মির্জাপুর, ঢাকা। ১৪৭. শফিকুল ইসলাম
 ফরিদ, পিতা-ইয়ার আলী বিশ্বাস, পূর্ব আলীপুর, ফরিদপুর। ১৪৮. মফিজ,
 পিতা-চানমিয়া, বেহারকান্দি, পুরাবাজার, মুন্সিগঞ্জ। ১৪৯. অজিত মিয়া,
 পিতা-চানমিয়া, বেহারকান্দি, পুরা বাজার, মুন্সিগঞ্জ। ১৫০. খালিল মিয়া,
 পিতা-মফিজ উদ্দিন, নোয়াকান্দি, পলাশ, নরসিংদী। ১৫১. এনামুল হক নরী,
 পিতা-আমান উদ্দিন পাণ্ডিত, নোয়াকান্দি, পলাশ, নরসিংদী। ১৫২. জাহাঙ্গীর
 আলম, পিতা-সোহরাব হোসেন, কড়াতলী, খিলক্ষেত, ঢাকা। ১৫৩. আহিদ
 মিয়া, পিতা-চান মস্তান, মুসিকান্দি, পুরাবাজার, মুন্সিগঞ্জ। ১৫৪. আনোয়ার
 হোসেন নাডক, পিতা-সোহরাব হোসেন, কড়াতলী, খিলক্ষেত, ঢাকা। ১৫৫.
 শারমিন আকতার ভলি, পিতা-কাজি আবদুর রশিদ, রাজকর, খানপুরা,
 বাবগঞ্জ, বরিশাল। ১৫৬. জহরুল ইসলাম, পিতা-মইনুদ্দিন মণ্ডল, মেহুট,
 জমরবাড়ি, সাঘাটা, গাইবান্ধা। ১৫৭. রিপন মিয়া, পিতা-কালমিয়া, কালাপুর
 বাজার, মতলব, চাঁদপুর। ১৫৮. আকলিমা আক্তার, পিতা-গুন মিয়া সরকার,
 জামালপুর, মতলব, চাঁদপুর। ১৫৯. শহিদুল্লাহ সিরাজী, পিতা-আবুল হোসেন
 সিরাজী, চন্দ্রপাড়া, নগরকান্দি, ফরিদপুর। ১৬০. মামিনুল ইসলাম,
 পিতা-ফজলে রহমান, বাগপুর, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ১৬১. শাহীন, পিতা-আবদুস
 স্বামাদ, আশকরপুর, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ১৬২. মারিয়ম বিবি,
 পিতা-শামসুল হক প্রধান, জামালপুর, বেলতলা, চাঁদপুর। ১৬৩. তাসলিমা
 খাতুন মুন্না, পিতা-মফিজ উদ্দিন আশকরপুর, চারঘাট, রাজশাহী। ১৬৪.
 ওয়াজেদ আলী খান, পিতা-বদরউদ্দিন খান, ভাটিলক্ষাপুর, ফরিদপুর। ১৬৫.
 মনোয়ারা বেগম, পিতা-আলাউদ্দিন, শল্লাবাইত, মনোহরদা, নরসিংদী। ১৬৬.
 নিলুফার ইয়াসমিন, পিতা-আবদুর রহিম, রিমানগর, শিবপুর, নরসিংদী।
 ১৬৭. সাহিদা সুলতানা, পিতা-সুলতান উদ্দিন, বান্দারদিয়া, শিবপুর,
 নরসিংদী। ১৬৮. হুমায়ুন কবির, পিতা-হোসেন আলী, নোয়াকান্দি, পলাশ,

নরসিংদী। ১৬৯. নুরে আলম বাদশা, পিতা-ফজলুল হক, চিকনাদি,
 শরিয়তপুর। ১৭০. আবুল হাশেম, পিতা-আবদুল কাদির প্রধান, বাড়িভাঙ্গা,
 মতলব চাঁদপুর। ১৭১. সৈয়দ মনির হোসেন, পিতা-সৈয়দ সহিদ উল্লাহ,
 গুলশানপুর, ফরিদপুর। ১৭২. কাজিমুদ্দিন, পিতা-দলিল শেখ, ধনাইয়া,
 শিবপুর, নরসিংদী। ১৭৩. রমিজ উদ্দিন, পিতা-জাফর আলী, চৌহালা,
 নরসিংদী। ১৭৪. বাসেদ মিয়া, পিতা-ওহাব মিয়া, শাইলদা, নরসিংদী। ১৭৫.
 নাসিম, আহম্মদ সমর, পিতা-জাহির উদ্দিন আহম্মদ, চনকদিয়া, শুভাচ্যা,
 কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১৭৬. রাজ্জাক শেখ, পিতা-গেহু শেখ, ধমুদা গোবিন্দপুর,
 অধিকাপুর, ফরিদপুর। ১৭৭. আবদুর রহমান, পিতা-মো. আলী শেখ, আনহার
 মাতব্বের গঙ্গা, মোমিন খার হাট, ফরিদপুর। ১৭৮. ইব্রাহিম আলী,
 পিতা-আবদুল জব্বার, উত্তর পানা পুকুর, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ১৭৯. জাহিদ
 হাম্মান (জাহিদুল), পিতা-আইয়ুব আলী, উত্তর বাড়ি, গুলশান, ঢাকা। ১৮০.
 সোলিনা হোসেন, পিতা-হাবিবলাহ, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা। ১৮১.
 মুর্তুনাহার বেগম, পিতা-সোলেমান শেখ, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা। ১৮২.
 নিলফা বেগম, পিতা-নুর ইসলাম গাজী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা। ১৮৩.
 আবুল হোসেন, পিতা-জয়নব আলী, ধনাইয়া, শিবপুর, নরসিংদী। ১৮৪.
 আছম্মান ফারুক, পিতা-আতাউর রহমান বকির নৌকাঘাটা, শিবপুর,
 নরসিংদী। ১৮৫. মীর লিয়াকত আলী, পিতা-মীর মোহতাম্মে আলী,
 বানিয়ারা, মির্জাপুর হাঙ্গাইল। ১৮৬. প্রবীর কুমার দাস, পিতা-তিন কুমার
 দাস, গুলশানপুর, ফরিদপুর। ১৮৭. সৌলম, পিতা-জান মোহাম্মদ, চারঘাট,
 রাজশাহী। ১৮৮. আমিনুর রহমান, পিতা-জাহির উদ্দিন সরকার, ধামর,
 গঙ্গাচড়া, রংপুর। ১৮৯. মোসলেম, পিতা-এলকেন মোলা, আরেকপুর, পাবনা।
 ১৯০. ফকির আলী, পিতা-নরুজ্জামান, মজুরপুর, চারঘাট, রাজশাহী। ১৯১.
 রাবেক, পিতা-কফপদ, বিকড়া, চারঘাট, রাজশাহী। ১৯২. আশরাফ,
 পিতা-লাল মোহাম্মদ, বিকড়া, চারঘাট, রাজশাহী। ১৯৩. জাহের সরকার,
 পিতা-ওসমান আলী, খুড়িয়া, নবানগর, বি. বাড়িয়া। ১৯৪. মোজাম্মেল,
 পিতা-আজিত উল্লাহ, উত্তর পানাপুকুর, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ১৯৫. সৌলম
 বেপারী, পিতা-আবুল হোসেন বেপারী, কমলাপুর, ফরিদপুর। ১৯৬. আমান
 উল্লাহ, পিতা-ওয়াজ উদ্দিন, দ. কারাবটর, শিবপুর, নরসিংদী। ১৯৭. জয়নাল
 আবেদীন, পিতা-মনজুম আলী, ধামর, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ১৯৮. শহীদুল
 ইসলাম, পিতা-আবদুল আজিজ মণ্ডল, উত্তর জয়পাড়া দৌহার, ঢাকা। ১৯৯.
 সিরাজ, পিতা-কেরামত আলী, মালিকার চর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ। ২০০.
 খায়রুন নেছা আক্তার ময়না, পিতা-আ. জব্বার খান, বরইতলা, ডালভাঙ্গা,
 বরগুনা। ২০১. সরকার মো. জলফিকার রত্ন, পিতা-মোহুহুদর রহমান,
 হাতিও, কালাই, জয়পুরহাট। ২০২. বাচ্চা মিয়া, পিতা-জাফর আলী, কলকন্দ,
 গঙ্গাচড়া, রংপুর। ২০৩. সদরুল ইসলাম, পিতা-জিয়ান্দার আলী কৈবাকু,
 বাড়ির হাট, রংপুর। ২০৪. নর মোহাম্মদ, পিতা-আলাউদ্দিন, বাগড়া, শ্রীনগর,
 মুন্সিগঞ্জ। ২০৫. সুপন রায় বারু, পিতা-সধীর চন্দ্র রায়, গুলশানপুর, ফরিদপুর।
 ২০৬. মোশারফ হোসেন, পিতা-সোহাব হোসেন, বালিয়াভাঙ্গা, সারদা,
 চারঘাট, রাজশাহী। ২০৭. রবিউল ইসলাম, পিতা-সমির উদ্দিন, চারঘাট,
 রাজশাহী। ২০৮. আক্তার আহম্মদ, পিতা-আলতাফ হোসেন, চারঘাট,
 রাজশাহী। ২০৯. আবদুল হামিদ, পিতা-জনাব আলী, সেনপুর নগর পাড়া,

মতিহার, রাজশাহী। ২১০. আবুল কালাম আজাদ, পিতা-সিরাজ উদ্দিন, চারঘাট, রাজশাহী। ২১১. মাহমুদ উদ্দিন, পিতা-কমরুদ্দিন, গিলাবের, শিবপুর, নরসিংদা। ২১২. বাবুল, পিতা-আবদুল আজিজ, রক্তনগর, দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। ২১৩. সাইদুর রহমান, পিতা-আতা মিয়া, ক/৬২, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২। ২১৪. বদরুজ্জামান বাদশা, পিতা-এজাবল হক, হজরাপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ। ২১৫. হারিবর রহমান, পিতা-মনসুর আলী, সদরপুর, ফরিদপুর। ২১৬. আজিজুল ইসলাম সরকার, পিতা-সাইজাউর সরকার, বাহেরঘাটা, পটলদিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। ২১৭. নিলুফার হুয়াসমিন, পিতা-হামিদুর রহমান, বাহেরঘাটা, পটলদিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। ২১৮. শাহু পবান সরকার, পিতা-সিরাজুল ইসলাম সরকার, বাহেরঘাটা, পটলদিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। ২১৯. বাহার, পিতা-তবারক উলাহ, ধন্যপুর, বরইতলা, লক্ষাপুর। ২২০. এস. এম. শাহরিয়া, পিতা-আলী হাবিদার ফরাজী, ছেঙ্গার চর, এম-এম কান্দি, মতলব, চাঁদপুর। ২২১. মমতাজ বেগম, পিতা-ইসমাইল হাওলাদার, টেপু, পটয়াখালী। ২২২. আরমান আলী, পিতা-ইনসান আলী, বিকুড়া, চারঘাট, রাজশাহী। ২২৩. শাহ আবদুল আলী, পিতা-আইজ উদ্দিন, কোজপুর, চারঘাট, রাজশাহী। ২২৪. মো. ফজলুল হক, পিতা-জাকির প্রামাণিক, বালিয়াডাঙ্গা, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ২২৫. আলতাফ হোসেন, পিতা-আজিম উদ্দিন, মানিকদি, গুডবান্ডা বাজার, শিবপুর, নরসিংদা। (তালকিন)। ২২৬. আবদুল বাবেক ডুইয়া, পিতা-বাবর আলী ডুইয়া, বাকতার চর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ২২৭. মো. লিটন, পিতা-ফাল প্রামাণিক, মহতপাড়া, দোহার, ঢাকা। ২২৮. আবদুল কাইয়ুম, পিতা-আবল ফজল, ভাওয়ার ভিটি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ২২৯. মনোয়ারা বেগম, পিতা-ফালমিয়া, নোয়াকান্দি, পলাশ, নরসিংদা। ২৩০. আবদুল্লাহ আল মামুন, পিতা-মজিবুর রহমান, নজিপুর প্রফেসর পাড়া, পত্নীতলা, নওগাঁ। ২৩১. সৈয়দ আলোউদ্দিন আল-আজাদ, পিতা-সৈয়দ মওলানা তাহের হোসাইন, তাহেরাবাদ, অফগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। ২৩২. সানাউল্লাহ মিয়া, পিতা-হাজী আমিরুল, খাসমহল বালুরচর, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। ২৩৩. গনি মিয়া, পিতা-আবাস আলী, মেলোকান্দি বালুর চর, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। ২৩৪. জাহিদুল ইসলাম, লিটন, পিতা-জাকির হোসেন রতন, শালগামিয়া, পাবনা। ২৩৫. মনির হোসেন, পিতা-শাহ জামাল মেধুরী, ধন্যপুর, বাড়েতলা, লক্ষাপুর। ২৩৬. খোরশেদ আলম, পিতা-সামসুদ্দিন সরকার, গজবপুর, বদলগাছী, নওগাঁ। ২৩৭. সৈয়দ মোশারফ হোসেন, পিতা-সৈয়দ আবদুর রহমান, আড়ালিয়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। ২৩৮. বিপ্লব, পিতা-আবদুল মালেক সিকদার, খেলসিকদর, ওয়ারী পাইকপাড়া, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল (তালকিন)। ২৩৯. গিয়াস উদ্দিন, পিতা-কেরামত আলী, মালিকেরচর, হোগলাকান্দি, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ। ২৪০. আবদুল কুদ্দুস মাসি, পিতা-সিদ্দিকুর রহমান মাসি, দেওরা, মরাদনগর, কামিলা। ২৪১. আসিফুল হোসেন শাহ, পিতা-মামুন তালুকদার, মাজুদ, ডেলমাগর, নরসিংদা। ২৪২. সালাহউদ্দিন, পিতা-সুলতান উদ্দিন, পাটলী, গফরগাও, ময়মনসিংহ। ২৪৩. মোজাম্মেল হক, পিতা মজার সিকদার, ফোড়নগর, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। ২৪৪. শামসুল হক, পিতা-কালি গাজী, টাউন কালিকাপুর, পটয়াখালী। ২৪৫. সৈয়দ শাহজাদা, পিতা-সৈয়দ কাশেম আলী, পূর্ব জৈনকাঠা, পটয়াখালী। ২৪৬. নাজির উদ্দিন জয়, পিতা-আবদুল মাজুদ, মেজডালাম, পবা, রাজশাহী। ২৪৭.

হাবিবুর রহমান হাবিব, পিতা-আলিমুদ্দিন, মেজডালাম, পবা, রাজশাহী।
 ২৪৮. শফিউল আজম, পিতা-ডা. খতিবুর রহমান, বাহাদুর সিংহ, রংপুর।
 ২৪৯. নাজমুল হক, পিতা-আবদুল লতিফ, মেজডালাম, পবা, রাজশাহী।
 ২৫০. আবুল হোসেন, পিতা-মনতাজ শেখ, মেজডালাম, পবা, রাজশাহী।
 ২৫১. আবদুল হান্নান, পিতা-আবদুস সুমাদ, মেজডালাম, পবা, রাজশাহী।
 ২৫২. আবদুল মজিদ, পিতা-রিয়াজ উদ্দিন, মেজডালাম, পবা, রাজশাহী।
 ২৫৩. আবদুল মান্নান, পিতা-আবদুল সামাদ, মেজডালাম, পবা, রাজশাহী।
 ২৫৪. শহিদুল ইসলাম শহাদ, পিতা-শরাফুজ্জ আলী, গন্ধর্বপুর, বদলগাছি, নওগাঁ।
 ২৫৫. জিলুর রহমান, পিতা-সাবির উদ্দিন, শালবন, বদলগাছি, নওগাঁ।
 ২৫৬. শাহ জালাল সরকার সুমন, পিতা-সিরাজুল ইসলাম সরকার, টেংগুরিয়া, পাটলাদিয়া, সিরাজদি খান, মসিগঞ্জ।
 ২৫৭. আবদুল বাসেত মোলা, পিতা-মজুর আলী মোলা, মালুকপুর, আশারামপুর, বায়পরা, নরসিংদী।
 ২৫৮. দেলোয়ার হোসেন, পিতা-কছিম আলী, শাজারী পোতা, শাশী, যশোহর।
 ২৫৯. মিজানুর রহমান স্বপন, পিতা-মো. হোসেন, লক্ষুর, শিরামপুর, বাজের, মাদারাপুর।
 ২৬০. হাবিবুর রহমান হাবিব, পিতা-রমজান আলী, ইটাইল, জামালপুর।
 ২৬১. আরা মিয়া, পিতা-নূর মোহাম্মদ বেপারী, চরকেওয়ার, মসিগঞ্জ।
 ২৬২. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, পিতা-মোরশেদ আলী বেপারী, বাড়ি ভাঙ্গা, মতলব, চাঁদপুর।
 ২৬৩. শামসুন নাহার, পিতা-ফজুর আলী, সৈয়দের গাও, মনোহরদী, নরসিংদী।
 ২৬৪. মণ্ডলানা মো. ইউনুস, পিতা-মুসা মো. নূর মিয়া, মাতবাড়িয়া, মুসাবাড়ি, চান্দিনা, কাম্বিলা।
 ২৬৫. লোকমান হোসেন, পিতা-সামসুল হক, কাঠালতলী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
 ২৬৬. ফজলে রাকী, পিতা-আবদুল মালেক, বড় কতবপুর, সাভিয়াকান্দি, বগুড়া।
 ২৬৭. মশিউর রহমান ডালিম, পিতা-আবদুল মান্নান মণ্ডল, বিশাপাড়া, হাকিমপুর, দিনাজপুর।
 ২৬৮. তরিকুল ইসলাম, পিতা-তালেব হোসেন, চনকুটিয়া মধ্যপাড়া, শুভাচ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
 ২৬৯. রবিন খান, পিতা-নূরুল ইসলাম খান, সুলিমারাদ, নাগর পুর, টাঙ্গাইল।
 ২৭০. মামুনুর রাশিদ, পিতা-আকাস আলী, পশ্চিম আঞ্চালপুর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
 ২৭১. শাহ মো. আবদুল আউয়াল, পিতা-নূর হোসেন আলী, ফকির, দুলিপুরা, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
 ২৭২. মো. দিদার, পিতা-রমিজ উদ্দিন রাহা, বাড়িভাঙ্গা, মতলব, চাঁদপুর।
 ২৭৩. এস. এম. রায়হান কবির, মাসিম, পিতা-সামসুল হক, কান্দিনা, ময়মনসিংহ।
 ২৭৪. আলিমুদ্দিন, পিতা-আবুল কাশেম, বগাজান, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
 ২৭৫. শামসি, পিতা-আবুল হাশেম, বেগুনবাড়ি, শুভাচ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
 ২৭৬. হাবিব, পিতা-হাতেম, বগাজান, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
 ২৭৭. তোফাজুল হোসেন, পিতা-নজর আলী, মেজডালাম, পবা, রাজশাহী।
 ২৭৮. জিয়াউল হক লিটন, পিতা-আবদুল আউয়াল মণ্ডল, কান্দানিয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।
 ২৭৯. নাসির উদ্দিন, পিতা-সোহরাব আলী, কান্দানিয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।
 ২৮০. আবদুর বড়ফ, পিতা-আবদুল আজিজ মাতবর, শোলাপুর, শিবচর, মাদারাপুর।
 ২৮১. আমজাদ, পিতা-ইয়াজ উদ্দিন, খোরদে আবদুপুর, চারঘাট, রাজশাহী।
 ২৮২. জসিম উদ্দিন, পিতা-মোবারক আলী, ৭১/৭ সিদ্দিক বাজার রোড, ঢাকা-১০০০।
 ২৮৩. দুলাল, পিতা-জামাল, মাঝগ্রাম, বড়াই গ্রাম, নাটোর।
 ২৮৪. হনুফা বেগম, পিতা-শামসুদ্দিন শেখ, মেদুয়ারা, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

২৮৫. অজুফা বেগম, পিতা-শামসুদ্দিন শেখ, মোদয়্যারী, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ২৮৬. কুতল আমিন, পিতা-আহম্মদ আলী শাহ, বগাজান, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ২৮৭. মফিজ উদ্দিন বাদল, পিতা-হাম্মদ আলী শেখ, পুরদিয়া, ঢেক, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। ২৮৮. ডা. গাজী রবিউল ইসলাম (বাব), পিতা-ডা. গাজী হারুনুর রশিদ কামার পাড়া, তুরাগ (উত্তরা), ঢাকা। ২৮৯. জালাল উদ্দিন, পিতা-আবুল কাশেম, বগাজান, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ২৯০. ফজলুল হক, পিতা-হাজী আবদুল গফর, কাকানিয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। ২৯১. হুমায়ুন কবির, পিতা-ফজলুল হক, বগাজান, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ২৯২. আবু বক্কর সিদ্দিক, পিতা-আবদুর রশিদ, কাকানিয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। ২৯৩. আবদুল আউয়াল, পিতা-জব্বান সরকার, কাকানিয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। ২৯৪. বিলাল হোসেন, পিতা-আবদুল আজিজ দেওয়ান, দক্ষিণ শিমুলিয়া, দোহার, ঢাকা। ২৯৫. সাইফুল ইসলাম, পিতা-আমজাদ আলী, কাকানিয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। ২৯৬. কালু মিয়া, পিতা-জাফর আলী, বলার পাড়, গঙ্গাচরা, রংপুর। ২৯৭. আবদুল বারী, পিতা-মোস্তফা আলী, বগাজান, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ২৯৮. গোলাম হাকিম, পিতা-খাবির উদ্দিন খান, কলতলা, শিবচর, মাদারীপুর। ২৯৯. হযরত আলী, পিতা-মোহাম্মদ আলী, কাকানিয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। ৩০০. শাহ সেকেন্দার, পিতা-নাদির মোহাম্মদ, নতুন কান্দী বাজার, মাদারীপুর। ৩০১. মণ্ডলানা মো. আবদুস সামাদ, পিতা-শমসের আলী, বাঘোপাড়া, আশোগেলা, সদর, বগুড়া। ৩০২. মনোয়ার হোসেন, পিতা-মোকসেম আলী, পঞ্চাশিব, সরিষা বাড়ি, জামালপুর। ৩০৩. মেহেদী মাসুদ ফেরদৌস, পিতা-আবদুস সামাদ, পঞ্চাশিব, সরিষা বাড়ি, জামালপুর। ৩০৪. রফিক, পিতা-মফিজ উদ্দিন শেখ, কাকানিয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। ৩০৫. লাইলী, পিতা-হোসেন খা, চান্দা, বিকরগাছা, যশোর। ৩০৬. মফিজ উদ্দিন, পিতা-হাসমত ফকির, নিজরা, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৩০৭. ইসাফিল মিয়া, পিতা-মম্বাজ মিয়া, লুঙ্গাপুর, ফরিদপুর (তালকিন)। ৩০৮. শেখ আলী আশরাফ, পিতা-শেখ ইউনুসুর রহমান, নাকনা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। ৩০৯. মন্নির উদ্দিন, পিতা-ইয়াকুব আলী, বগাজান, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৩১০. শাকিল উদ্দিন, পিতা-আলিউদ্দিন, চাকলিয়া, সাভার, ঢাকা। ৩১১. সোলায়মান, পিতা-কামাল হোসেন, বেগুনবাড়ি, সাভার, ঢাকা। ৩১২. মণ্ডলানা মিজবুর রহমান, পিতা-আবদুল্লাহ, কুভাতলী, মিজাপুর, টাঙ্গাইল। ৩১৩. বতন মিয়া, পিতা-সেকেন্দার আলী, মাক্দার ঢেক, মনোহরদী, নরসিংদী। ৩১৪. আলম, পিতা-জুলমত আলী শেখ, কলেজ পাড়া, ৩নং ওয়ার্ড, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৩১৫. শেখ হামিদ মণ্ডল, পিতা-মজিদ মণ্ডল, বাবুগুর, খটিপাড়া, পাটয়া, রাজশাহী। ৩১৬. মোজাম্মেল হক, পিতা-মফিজউদ্দিন, বাগপুর, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ৩১৭. মমতাজ উদ্দিন সরদার, পিতা-আহের আলী, চককেশর, বালুজার, মাক্দা, নওগাঁ। ৩১৮. মো. ইব্রাহিম, পিতা-শাহেদ আলী, দেওয়ানকাছি, সখিপুর, শরীয়তপুর। ৩১৯. দলীল মিয়া, পিতা-ফজর আলী মণ্ডল, দলাগিরী, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৩২০. খান মো. হুমায়ুন কবির, পিতা-আবদুল করিম খান, পূর্ব কাকইর খান কান্দী, শিবচর, মাদারীপুর। ৩২১. আবদুল মান্নান, পিতা-জামির উদ্দিন, ভবানীপুর, পবা, রাজশাহী। ৩২২. নুরুজ্জামান (জামান), পিতা-মুজাফফর আহমদ, মারায়ণপুর, দেবিদ্বার,

কমিল্লা। ৩২৩. জীবন সিদ্ধিক, পিতা-বাবর আলী, জিন্নতপুর, দেবিদ্বার, কমিল্লা। ৩২৪. মহিউদ্দিন বাহেল, পিতা-আহম্মদ, সোবহান, পশ্চিম মহাদেবপুর, সাতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। ৩২৫. খায়রুল রাসার, পিতা-আবদুল মাম্মান, নিজরা, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৩২৬. মসন উদ্দিন, পিতা-নিজাম উদ্দিন, বাগপুর, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ৩২৭. সাহেব আলী, পিতা-নবী হোসেন দেওয়ান, মলিকের চর, গজারিয়া, মুসিগঞ্জ। ৩২৮. শহিদুল ইসলাম, পিতা-সাহেব মোহাম্মদ, বগাজান, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৩২৯. আলল উদ্দিন, পিতা-রশিদ মিয়া, মকিবল, গ্রিশাল, ময়মনসিংহ। ৩৩০. আবদুল হক, পিতা-কুস্তম শেখ, ধিতপুর, ফোহার, ঢাকা। ৩৩১. আনিসুর রহমান, পিতা-জহির উদ্দিন, বাকপুর, বড়াবল, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ৩৩২. জালাল উদ্দিন, পিতা-হযরত আলী, বগাজান, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৩৩৩. শেখ রহিম, পিতা-আবদুল জব্বার, বানেশ্বর, পাটয়া, রাজশাহী। ৩৩৪. সুলতান আলী, পিতা, সামসুল হক, ভবানীপুর, পবা, রাজশাহী। ৩৩৫. মো. বজল, পিতা-মো. নরুল ইসলাম, বড়গ্রাম, কামরাঙ্গির চর ঢাকা। ৩৩৬. মো. আলমগীর, পিতা-মো. ইউনুস হুইয়া, কাজিয়ার চর, জাজিরা, শরীয়তপুর। ৩৩৭. মো. বেজাউল হক মোলা, পিতা-তাসিম উদ্দিন মোলা, চক কেশব, মাক্কা, নওগাঁ। ৩৩৮. আবদুল হামিদ, পিতা-হেকমত আলী, মেদওয়ারী, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৩৩৯. খোরশেদ আলম, পিতা-বাকু মিয়া, জয়পুরা, পলাশ, নরসিংদী। ৩৪০. মো. পাংল রিপন, পিতা-আফসার উদ্দিন খা, ড. রমজানপুর, শিবচর, মাদারীপুর। ৩৪১. মো. আমজাদ হোসেন, পিতা-মকবল হোসেন, গোপালপুর, আটঘাডিয়া, পাবনা। ৩৪২. মো. শাহীন হাওলাদার, পিতা-আবদুল গনি হাওলাদার, হায়েবাদপুর, নলছিটি, বালকাঠি। ৩৪৩. মেয়েজ উদ্দিন, পিতা-আসির উদ্দিন আরুফ, দোগাছি, জয়পুরহাট। ৩৪৪. মো. লেয়াকত আলী, পিতা-মো. নিজাম উদ্দিন, কামালপুর, আলমডাঙ্গা, চয়াডাঙ্গা। ৩৪৫. তলসী রাণী ব্যানাজি, পিতা-পরেশচন্দ্র ব্যানাজি, কক্সনগর, ফরিদপুর। ৩৪৬. মো. আসাদজামান, পিতা-মো. চনি মিয়া, চিকাদি, মনোহরদী, নরসিংদী। ৩৪৭. রুনা বেগম, পিতা-মো. হাভেম আলী, চরপুকুরিয়া, পিরোজপুর। ৩৪৮. ডলি, পিতা-আবদুল জলিল ঢালা, মাথাডাঙ্গা, মতলব উত্তর, চাঁদপুর। ৩৪৯. সখিনা, পিতা-সিরাজ মিয়া, দায়ের ভাও, নরসিংদী। ৩৫০. গিয়াস উদ্দিন, পিতা-ওমর আলী, ১৩৩ বি, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৯। ৩৫১. আশিক হুমরান, পিতা-শামসুল হক, কান্দুজিয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। ৩৫২. মো. রমজান আলী, পিতা-মো. পরশ উল্লাহ, চনকটিয়া চৌধুরী পাড়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৩৫৩. আফরোজা মালিক, পিতা-খান সাহেব, আবদুল্লাহ, ৩৮৪ অরুণের রোড, বসুন্ধরা, ঢাকা। ৩৫৪. এনায়েত হোসেন, পিতা-কফিল উদ্দিন, হাটাবো, বিরাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।